পরিপ্রশ্ন

(তৃতীয় ভাগ)

(স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের সাথে কথোপকথন)

সম্পাদনা

স্বামী ঋতানন্দ

পরিপ্রশ্ন

(তৃতীয় ভাগ)

(স্বামী ভূতেশানন্দ মহারাজের সাথে কথোপকথন)

সম্পাদনা

স্বামী ঋতানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী বিশ্বনাথানন্দ
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৩
e-mail : info@udbodhan.org

বেলুড় রামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ
কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশকাল
শুভ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথি
১৭ অগস্ট ২০১৪
৩২ শ্রাবণ ১৪২১
2M2C

প্রচ্ছদ অলঙ্করণ
শুভ্রকান্তি দে

ISBN : 978-81-8040-576-1 (Vol-3)
ISBN : 978-81-8040-566-2 (Set)

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০, দমদম রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩০

শ্রীমৎ স্বামী শুদ্ধানন্দজী মহারাজের শ্রীচরণে উৎসর্গিত

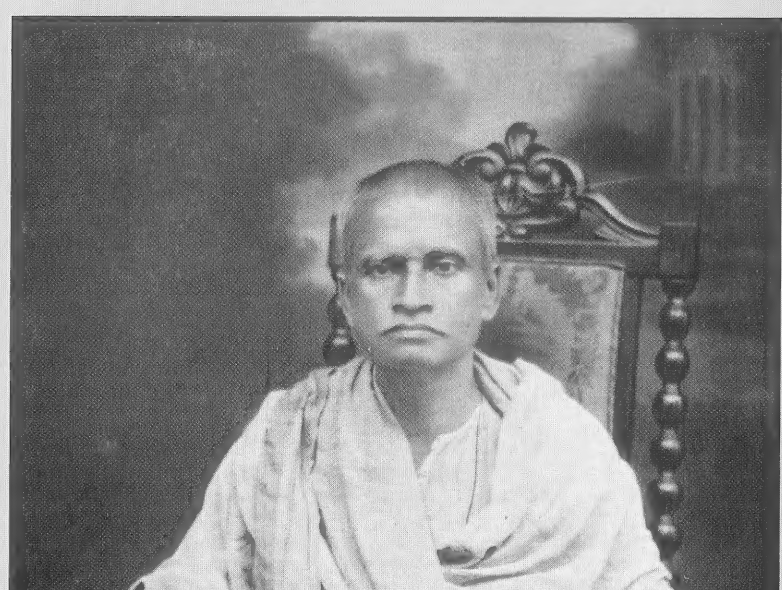

প্রকাশকের নিবেদন

‘পরিপ্রশ্ন’ প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশের পর থেকেই তৃতীয় ভাগের জন্য অনেকে ছিলেন অপেক্ষমাণ। ধর্মপিপাসু ও অনুসন্ধিৎসু মানুষের সেই আগ্রহ মেটাতে শুভ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথিতে এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ প্রকাশিত হল।

প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগটির মতো তৃতীয় ভাগটিও অকৃত্রিম শ্রদ্ধা ও পরম যত্নে সম্পাদনা করেছেন ‘উদ্বোধন’ পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক স্বামী ঋতানন্দ, বর্তমানে বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের সম্পাদক।

আশা করি, প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের মতো এটিও একইভাবে সকলের কাছে আদরণীয় ও আকর্ষণীয় হবে।

যাঁদের সার্বিক সহায়তা পুস্তকটিকে সর্বাঙ্গসুন্দররূপে প্রকাশিত হতে সাহায্য করেছে, তাঁদের ওপর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর অকৃপণ আশীর্বাদ বর্ষিত হোক—এই প্রার্থনা।

১৭ অগস্ট ২০১৪
শুভ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথি
উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা-৭০০ ০০৩

স্বামী বিশ্বনাথানন্দ
অধ্যক্ষ

সম্পাদকের কথা

শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর পরম কৃপা ও আশীর্বাদে 'পরিপ্রশ্ন' তৃতীয় ভাগ শুভ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে প্রকাশিত হল।

'পরিপ্রশ্ন' প্রথম এবং দ্বিতীয় ভাগ সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী, ভক্ত, জিজ্ঞাসু পাঠক ও অনুরাগিমহলে বিশেষ সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। পরবর্তী ভাগের জন্য তাঁদের প্রবল আগ্রহ এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগ প্রকাশে আমাদের অদম্য উৎসাহ দান করেছে। আগের দুটি ভাগের মতোই, তৃতীয় ভাগটিও পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজের কথোপকথন ও আলাপচারিতার আরো কিছু অমূল্য অংশ যথাযথভাবে প্রকাশের প্রয়াস।

উল্লেখ্য, 'উদ্বোধন' প্রকাশিত গ্রন্থ নয়, এমন বেশ কয়েকটি পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থ থেকে ঋণাঞ্জলি গ্রহণ করা হয়েছে মহারাজের অমূল্য কথোপকথন-কে একত্রে সুসংবন্ধ করার উদ্দেশ্যে। এঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই।

পূজ্যপাদ মহাপুরুষ মহারাজ ও পূজনীয় বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ সম্পর্কে ভূতেশানন্দজী মহারাজের স্মৃতিচারণও বর্তমান গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে। উক্ত বিষয়দুটি গ্রন্থের মাধুর্য ও রামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

নবীন সন্ন্যাসীদের প্রতি মহারাজের হৃদয়স্পর্শী কিছু উপদেশও গ্রথিত হল গূঢ় মূল মন্ত্রগুলিকে অনুচ্চারিত রেখে। এই উপদেশ সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী ও অগণন মুমুক্ষু মানুষের মনে শক্তি ও শান্তি সঞ্চার করুক—এই প্রার্থনা।

পরিশেষে, গ্রন্থটি প্রকাশে যাঁরা নানাভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের ওপর শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামীজী ও মহারাজজীর আশিস ও কৃপা অঝোর ধারায় ঝরে পড়ুক—এই আন্তরিক প্রার্থনা।

শুভ শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী তিথি
১৭ অগস্ট ২০১৪

স্বামী ঋতানন্দ

॥ ১০৯ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি তো মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গ অনেক করেছেন। তাঁর কথা একটু একটু করে আপনার কাছ থেকে শুনব—

মহারাজ : তখন উদ্বোধনে পূজনীয় শরৎ মহারাজের (স্বামী সারদানন্দ) কাছে যাতায়াত করি। যাতায়াত মানে মহারাজের কাছে গিয়ে চুপ করে বসে থাকতুম। বড়রা অনেকে প্রশ্ন করতেন, মহারাজ উত্তর দিতেন। বসে শুনতুম। এইভাবে পরিচয়। বাগবাজারে জ্ঞান মহারাজের আশ্রমে যাতায়াত আছে, সে-কথাও মহারাজ জানতেন। সেসময়ে সবে স্কুলপাশ করেছি। মনে সাধু হওয়ার খুব ইচ্ছে। একদিন শরৎ মহারাজের কাছে সোজাসুজি ব্রহ্মচর্য প্রার্থনা করলুম। তিনি বললেন—'আমি তো ব্রহ্মচর্য দিই না। মহাপুরুষ মহারাজ দেন। মঠে গিয়ে তুই মহাপুরুষ মহারাজকে বল।'

মহাপুরুষ মহারাজকে আমার ভয় করে।

'সে কী রে! মহাপুরুষ মহারাজ শিবতুল্য মানুষ। তাঁকে আবার কারো ভয় করে?' একথা বলে জ্ঞান মহারাজকে ডেকে মহারাজ বললেন—'ওকে নিয়ে যাও মহাপুরুষ মহারাজের কাছে। আমি পাঠিয়েছি বলবে।'

জ্ঞান মহারাজ নিয়ে এলেন মঠে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে। তিনি সব শুনে বললেন—'ব্রহ্মচর্য আমি দেব, কিন্তু তোমাকে পড়তে হবে। বি. এ. পাস করতে হবে। তারপর সাধু হবে।'

সুতরাং কাপড়ে কোঁচা দিয়ে মাথায় শিখা রেখে ভর্তি হলাম কলকাতার সংস্কৃত কলেজে দর্শনে অনার্স নিয়ে। ব্রহ্মচারীর বেশ, কলকাতা শহরের সহপাঠীরা কী দৃষ্টিতে দেখবে—সে-ব্যাপারে একটু সঙ্কোচ গোড়ায় ছিল ঠিকই, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে লক্ষ করলাম ক্লাসের ছেলেমেয়েরা খ্যাপানো তো দূরের কথা, আমায় খুব সমীহ করত ও সম্ভ্রমের চোখে দেখত। কলেজে কোন অসুবিধাই হয়নি। অন্যদিকে, কাব্যের অধ্যাপক রাজেন বিদ্যানিধি এবং দর্শনের স্বনামধন্য অধ্যাপক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত আমায় খুব ভালবাসতেন। যাহোক, দেখতে দেখতে বি.এ. ফাইনাল পরীক্ষা এসে গেল। শেষ পরীক্ষার দিন পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়েই সোজা বেলুড় মঠ। মহাপুরুষ মহারাজকে মঠে চলে আসার কথা নিবেদন করতেই মহারাজ খুব খুশি।

প্রশ্ন : মহারাজ, গম্ভীর মহারাজের সঙ্গেই তো আপনার ব্রহ্মচর্য হয়, তাই না?

মহারাজ : হ্যাঁ, ১৯২৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য জন্মতিথিতে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আমাদের ব্রহ্মচর্য-দীক্ষা লাভ হয়। আমাদের দলে ছিলেন গম্ভীর মহারাজ (স্বামী গম্ভীরানন্দ), মোতি মহারাজ (পরবর্তী কালে স্বামী শিবস্বরূপানন্দ, মহারাজের সেবক) ও ফণি মহারাজ (পরবর্তী কালে স্বামী আত্মারামানন্দ)। সেদিনটি আরেকটি কারণে আমার কাছে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে। সেদিন সন্ধ্যাবেলা মহাপুরুষ মহারাজ আমায় তাঁর ঘরে ডেকে পাঠান। তিনি খুব গম্ভীর, যেন খুব চিন্তিত। আমায় বললেন : 'আরে শোন, তুই তো বামুনের ছেলে—পুজো-আচ্চা জানিস। মঠের ঠাকুরের পূজারি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সে ব্রহ্মচর্যের হোম করতে পারবে না। তুই তো এসব পারিস। তুই-ই তোদের ব্রহ্মচর্যের হোমটা

করাব।’ আমি এতে যারপরনাই খুশি হয়ে মহারাজকে আশ্বস্ত করলাম। সত্যিই সেদিন নিজেদের ব্রহ্মচর্য অনুষ্ঠানের হোম করতে পারার দুর্লভ সুযোগ পেয়ে কৃতার্থই হয়েছিলাম।

১৯২৮ সাল। সেবছর শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্য জন্মতিথির পূত ঊষালগ্নে মহাপুরুষ মহারাজ আমাদের সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করে নবজীবন দান করলেন। আমাদের সন্ন্যাস হয়েছিল পুরনো মন্দিরের নিচের ঘরে—এখন যেখানে মঠ অফিস।

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি কি মহারাজের সেবকদের মধ্যে ছিলেন?

মহারাজ : না, আমি মহারাজের ফর্ম্যাল সেবকদের মধ্যে ছিলাম না। তবে তাঁর কৃপায় সেবার যথেষ্ট সুযোগ পেতাম। সন্ন্যাসের পরের বছর তপস্যার জন্য মনে তীব্র ব্যাকুলতা। একদিন সন্ধ্যার পর মহারাজকে ম্যাসাজ করছি। মনের কথাটা জানালাম যে, তপস্যায় যাওয়ার জন্য মন খুব আকুলি-বিকুলি করছে। শুনেই তিনি খুব খুশি হলেন। শুয়েছিলেন, উঠে বসলেন। বসেই আমার দিকে খুব গভীর স্নেহপূর্ণ দৃষ্টি রেখে দু-হাত দিয়ে নিজের দুই ঊরুর ওপর তাল ঠুকে বললেন : ‘যাও বাবা যাও, খুব তপস্যা কর। আর যাওয়ার আগে যে-কদিন মঠে আছ খুব কষে জপ-ধ্যান কর, তাহলে তপস্যায় গিয়ে ঠিক ঠিক সময়ের সদ্ব্যবহার করতে পারবে। আর ছুটি শেষ হলে সোজা চলে এসে ঠাকুরের কাজে লাগবে। বেশিদিন বাইরে থাকতে নেই। তাতে মন উড়ু উড়ু হয়ে যায়। সে-মনে না হয় তপস্যা, না হয় ঠাকুরের কাজ।’ অবাক হয়ে ভেবেছি, আমি তপস্যায় যাব, তাতে মহাপুরুষ মহারাজের কী আগ্রহ! সর্বদা কতভাবেই না উৎসাহ দিতেন সাধন-ভজনের জন্য।

প্রশ্ন : শুনেছি, মহাপুরুষ মহারাজ গান করতেন। আপনারা শুনেছেন?

মহারাজ : মহাপুরুষ মহারাজ গান খুব পছন্দ করতেন। চাইতেন ছেলেরা গানবাজনা করে। নিজেরও গলা খুব মিষ্টি ছিল। তাঁকে গান গাইতে শুনেছি। একদিন শরৎ মহারাজকে বললেন : 'শরৎ নে, বাঁয়াটায় ঠেকা দে।'—বলে গান গাইলেন। শরৎ মহারাজ বাজালেন, মহাপুরুষ মহারাজ গাইলেন। মহারাজ আগেও গাইতেন। ঠাকুরের দেহ যাওয়ার পর সম্ভবত মঠ তখন বরানগরে উঠে এসেছে। শুনেছি, সেখানে এক বর্ষার দিনে তিনি ঠাকুরের অদর্শনে বিরহতাপিত হৃদয়ে খুব করুণ সুরে 'হরি গেল মধুপুরী, হাম কুলবালা/ বিপদ পড়ল সই! মালতীর মালা।' গানটি গেয়েছিলেন।

প্রশ্ন : আর কোন ঘটনা মনে পড়ছে মহারাজ?

মহারাজ : একদিন সকালে মহারাজের ঘরে ঢুকতেই বলছেন : 'বুঝেছ, খুব বিপদে পড়েছি।'—কী হল মহারাজ?—'দেখ না, মোতি অসুস্থ। এখন ভাবছি আমার ঘরটা কে মুছবে?'—আমি পুঁছে দিচ্ছি। এর জন্য আপনি অত ভাবছেন কেন? মহারাজ নিশ্চিন্ত হলেন। এমনই ছিল তাঁর শিশুসুলভ স্বভাব। নিজের জন্য কাউকে সামান্য কাজ করতে বলতেও কত দ্বিধা!

কোন প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসার উত্তরে মহারাজ যথাযথ উত্তর অথবা 'জানি না'—এরকম উত্তর পছন্দ করতেন। এলোমেলো বা গোঁজামিল একেবারে সইতে পারতেন না। একদিন সকালে মন্দিরাদি প্রণাম সেরে মঠে হাঁটছেন। স্বামীজীর মন্দিরের সামনে থেকে লঞ্চঘাট দেখা যায়। ওখানে কয়েকটি আলো জ্বলছিল। মহারাজ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন : 'ওখানে কটা আলো জ্বলছে?' সঙ্গে যারা উপস্থিত ছিল, এক-এক জন এক-এক রকম উত্তর দিল। এরই মধ্যে আমি ওখানে ছুটে গিয়ে আলোগুলি গুনে এসে সঠিক

সংখ্যাটি বললাম। তাতে মহাপুরুষ মহারাজ খুব খুশি হলেন এবং বারবার সকলের সামনে এই সামান্য ব্যাপারেই আমার প্রশংসা করতে লাগলেন।

প্রশ্ন : মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ সাধন-ভজনের সাথে সাথে পড়াশুনাতেও আপনাদের উৎসাহ দিতেন?

মহারাজ : মহাপুরুষ মহারাজ খুব বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। মঠে তারাসার পণ্ডিত সাধু-ব্রহ্মচারীদের শাস্ত্রাদি পড়াতেন। তখন চলছে বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ও তার শাঙ্করভাষ্য পাঠ ও আলোচনা। মহারাজ একটা বই জোগাড় করে রোজ আমাদের সঙ্গে সে-ক্লাসে যেতে শুরু করলেন। আমরা তো খুব সঙ্কুচিত ও সন্ত্রস্ত। একদিন শুদ্ধানন্দজী মহাপুরুষ মহারাজকে জানালেন : 'মহারাজ, আপনি ক্লাসে যাওয়ায় নবীন সাধু-ব্রহ্মচারীরা খুব সঙ্কোচবোধ করেন।' মহারাজ বললেন : 'ঠিক আছে, তাহলে ক্লাসে আমি আর যাব না। কিন্তু রোজ পাঠের পর একজন এসে আমাকে সেদিন কী পড়া হল সংক্ষেপে শুনিয়ে যাবে।' সে-ভারটি পড়েছিল অনঙ্গ মহারাজের ওপর। তাঁর অনুপস্থিতিতে সে-কাজটা মাঝেমধ্যে আমাকে করতে হতো। দেখতাম, মহারাজ খুব মনোযোগের সঙ্গে বিষয়গুলি শুনে ঘাড় নেড়ে তর্ক ও সিদ্ধান্তকে অনুমোদন জানাতেন।

প্রশ্ন : মহারাজ, সেসময়ে মঠের কাজকর্ম তো আপনারা নিজেরাই সব করতেন—

মহারাজ : মঠের সব কাজের প্রতি মহারাজের ছিল তীক্ষ্ণ নজর। ঠাকুরসেবার খুঁটিনাটি যত্নের সঙ্গে শেখাতেন। একদিন ঠাকুরের প্রসাদী পান মুখে দিয়েই সেটি মুখ থেকে বার করে ফেললেন। ঠাকুরঘরের ভাঁড়ারিকে ডাকালেন। সে কাছে এলে মহারাজ তাকে বললেন : 'আজ তুমি ঠাকুরের মুখ পুড়িয়ে দিয়েছ। পানে এত চুন দিয়েছ! সাবধান, ঠাকুর

এখানে জীবন্ত, আমাদের সেবা নেন।' একথা বলে কতটুকু চুন-সুপারি একটা পানে দিতে হবে সব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন। তারপর আবার বললেন : 'দেখ, মঠের আমি প্রেসিডেন্ট। এসব ঠাকুরের সেবা তো আমারই করার কথা। কিন্তু এখন বুড়ো হয়েছি। নিজে করতে পারি না। তাই তোমরা কর। দোষ-ত্রুটি হলে সে তো আমারই অপরাধ।' মহারাজ এমন ভঙ্গি ও বিনয়ের সুরে কথাগুলি বলেছিলেন, উপস্থিত আমাদের সকলের মনে ঠাকুরসেবার গুরুত্ব যে কত গভীর, সেটি দৃঢ়ভাবে মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

সেবার যতীশ্বরানন্দজী 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকার এডিটর হয়ে মায়াবতী যাচ্ছেন। মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে বিদায় নেওয়ার সময় বললেন : 'মহারাজ, আমি কী লিখব? আমি কী জানি?' মহারাজ তাঁকে আশ্বস্ত করে বললেন : 'খুব করে ঠাকুরের ধ্যান করবে। আমাদের ঠাকুর অনন্ত ভাবময়। দেখবে মাথায় এত ভাব আসবে যে, তাতে একেবারে ভেসে যাবে।' আরেকটা কথা বলেছিলেন : 'ধ্যানের সময় ভাববে যে, মঠ-মিশনের কাজ ইত্যাদি কিছুই নেই। শুধু ঠাকুর আছেন আর আমি আছি।'

প্রশ্ন : উনি তো খুব রসিকও ছিলেন, তাই না?

মহারাজ : মহাপুরুষ মহারাজ রসিকতাও খুব করতেন। একবার মঠে অনেকগুলি কম্বল এসেছে। মঠের ম্যানেজার প্রিয়দা (স্বামী আত্মপ্রকাশানন্দ) সেগুলি মহারাজের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখাচ্ছেন। মহারাজ দেখে খুশি হয়ে বলছেন : 'বেশ, বেশ, সাধুদের এক এক জনকে এক একখানা করে কম্বল দাও।' প্রিয়দা বললেন : 'না মহারাজ, এগুলি এসেছে গরিবদুঃখীকে দেওয়ার জন্য।' মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে বললেন : 'ও, সাধুরা বুঝি বড়লোক?'

একদিন আমরা কয়েকজন এক এক করে মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে ঢুকছি। যে-ই একজন ঢুকছে, মহারাজ জিজ্ঞাসা করছেন : ‘কে?’ অমনি সে বলছে : ‘আমি অমুক, মহারাজ।’ মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে তার সুরে সুর মিলিয়ে বলছেন : ‘ও, তুমি অমুক মহারাজ।’ দ্বিতীয় ও তৃতীয় জনের ক্ষেত্রে মহারাজ এরকমই বললেন। আমি ঢুকতেই মহারাজ যথারীতি জিজ্ঞাসা করলেন : ‘কে?’ আমি কিন্তু উত্তর দিলাম : মহারাজ, আমি অমুক। এবারে মহারাজ আমার সঙ্গে সেভাবে বলতে না পেরে সকলকে বললেন : ‘দেখ, ওর কী বুদ্ধি, ও আগে “মহারাজ” কথাটা বলে বলল, আমি অমুক!’ মহাপুরুষ মহারাজ ছিলেন এমনই মজার মানুষ।

আরেকটি কৌতুককর ঘটনার কথা মনে পড়ছে। মঠে এসেছেন অখণ্ডানন্দজী (গঙ্গাধর) মহারাজ। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর সঙ্গে খুব ফষ্টিনষ্টি করতেন। অখণ্ডানন্দজী ছিলেন খুব সরল। সারগাছিতে খুব কাজকর্ম করতেন। সেখানে লোকজনের অভাব। তাই সাধুকর্মী চেয়েছেন মঠে। মঠ থেকে কাউকে পাঠাচ্ছে না। সেজন্য খুব অভিমান করে ছেলেমানুষের মতো মহাপুরুষ মহারাজকে সেকথা জানিয়ে বললেন : ‘বনে বাদাড়ে পড়ে আছি। কাজের লোকজন নেই। মঠে লোক চাইলেও লোক দেবে না!’

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছি। হঠাৎ মহাপুরুষ মহারাজ আমাকে দেখিয়ে অখণ্ডানন্দজীকে বললেন : ‘দেখ, এ ছেলেটি খুব ভাল। একে তোমার ওখানে নেবে তো নিতে পার।’

ভাল আর মন্দ, একটা পেলেই হয়।

কিন্তু, ও তো কলকাতার ছেলে। রাতে লুচি খাওয়ার অভ্যাস। ওকে নিলে রাতে কিন্তু লুচি খাওয়াতে হবে।

অখণ্ডানন্দজী গজগজ করে মৃদু স্বগতোক্তি করলেন : ‘হ্যাঁ, নিজেরাই ডাল-ভাত খেয়ে কোনরকম রয়েছি, তা আবার রাতে লুচি খাওয়াতে হবে!’

একটু চটেছেন দেখে মহাপুরুষ মহারাজ রসিকতা করে আবার বলছেন : ‘তাছাড়া, ওর খুব শাস্ত্রচর্চা করায় আগ্রহ। পড়তে শুনতে ভালবাসে। তোমার ওখানে নিলে একজন পণ্ডিত রেখে ওকে শাস্ত্র পড়াতে হবে।’ এবার অখণ্ডানন্দজী একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠার মতো গর্জে উঠে বললেন : ‘দরকার নেই আমার সাধুকর্মীর। ওখানে কখন কোথায় থাকি, কী করি তার ঠিক নেই, বলে কিনা পণ্ডিত রেখে শাস্ত্র পড়াতে হবে!’ একথা বলে মহাপুরুষ মহারাজকে প্রণাম করে ঘর থেকে হনহন করে বেরিয়ে গেলেন। মহাপুরুষ মহারাজ দিব্যি হেসে বললেন : ‘দেখলি, গঙ্গাকে কেমন চটালাম!’

একদিন মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, মহারাজ, ঠাকুর আপনাদের কিভাবে উপদেশ দিতেন সে-ব্যাপারে একটু বলুন। মহারাজ শুয়েছিলেন, উঠে বসলেন। উৎসাহের সঙ্গে বললেন : ‘ঠাকুর কিরকমভাবে বলতেন, আমাদের জন্য তাঁর কী গভীর আগ্রহ, সেই আকুল মুখভঙ্গি—তা তো বাবা তোমাদের দেখাতে বা বোঝাতে পারব না। কী বলতেন—কথাগুলি হয়তো বলতে পারব, কিন্তু সেসময়ে ঠাকুরের দেহ-মনে যে-ভাবান্তর হতো, সেটিই ঠাকুর আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে দিতে পারতেন—তা তো দেখাতে বা বলতে পারব না।’ মহাপুরুষ মহারাজও এমন তীব্র আর্তি নিয়ে কথাগুলি বলেছিলেন যে, তাতেই আমাদের মন ভরে গিয়েছিল। অন্য একদিন মহাপুরুষ মহারাজ তাঁর ঘরের পশ্চিমের জানলার সামনে চেয়ারে বসে রয়েছেন। সমুদ্রবৎ গম্ভীর—একেবারে অন্তর্মুখ। কাছে

রয়েছি। অনেকক্ষণ পর আমায় দেখতে পেয়ে কথা বলতে শুরু করলেন। এতক্ষণ চোখ চেয়েইছিলেন, কিন্তু কিছুই যেন দেখছিলেন না। বললেন : 'ঠাকুর আমাকেও ঈশ্বরকোটি করে দিয়েছেন। ভিতরে এত শক্তি অনুভব করি যে, যদি এই আমগাছটাকে বলি মুক্ত হয়ে যাক, এক্ষুনি গাছটা মুক্ত হয়ে যাবে।' শুনে আমি স্তম্ভিত।

প্রশ্ন : মহারাজ, সে-সময় রাজা মহারাজের পাশের ঘরেই তো মহাপুরুষ মহারাজ থাকতেন। পাশের ছোট ঘরে কে থাকতেন?

মহারাজ : সিঁড়ি দিয়ে উঠে ডানদিকের প্রথম ঘর বিজ্ঞানানন্দজীর, পরের ঘরটা তো স্বামীজীর। বিজ্ঞান মহারাজের ঘরের সামনের বারান্দার সোজাসুজি ঘরটি মহাপুরুষ মহারাজের। তার পুবের ঘরটা রাজা মহারাজের। মহাপুরুষ মহারাজ রাজা মহারাজকে খুব নজরে নজরে রাখতেন।

রাজা মহারাজের (স্বামী ব্রহ্মানন্দ) ছিল মাছ ধরার খুব সখ। মঠের প্রেসিডেন্ট হয়ে মহারাজের মাছ ধরতে বসা মহাপুরুষ মহারাজ একেবারে পছন্দ করতেন না। তাই এব্যাপারে মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে একটু ভয় করতেন এবং এড়িয়ে চলতেন। মাঝেমাঝে মহারাজ করতেন কী, নিজের চেলাদের দিয়ে আগেভাগেই ছিপ, চার ইত্যাদি পুকুরপাড়ে পাঠিয়ে দিতেন এবং কিছু পরে খালি হাতদুটো ঘুরিয়ে দেখাতে দেখাতে মহাপুরুষ মহারাজের সামনে দিয়ে নিশ্চিন্তে চলে যেতেন! এমনই ছিল মহারাজের বালকসুলভ আচরণ। মহাপুরুষ মহারাজ সব টের পেতেন, কিন্তু কিছু বলতেন না। মহারাজের প্রতি মহাপুরুষ মহারাজের সম্ভ্রম ছিল সত্যি দেখার মতো।

প্রশ্ন : মহাপুরুষ মহারাজের ঝোলের গল্পটা বলুন না, মহারাজ। ওরা শোনেনি—

মহারাজ : মহাপুরুষ মহারাজের অসাধারণ সংযম ছিল। তেল-মশলাবর্জিত একটা বিস্বাদ ঝোল ছিল তাঁর অন্যতম প্রধান খাবার। তাঁর গুরুভাইরা সেটির নাম দিয়েছিলেন ‘মহাপুরুষের ঝোল’। বেলুড় মঠে তাঁকে সেটি তৃপ্তির সঙ্গে নিত্য খেতে দেখেছি। শুনেছি, কাশীতে থাকতেও তিনি এ-ঝোল খেতেন। তাই কাশীতে এর নাম ‘কাশীর ঝোল’। এ-ঝোলটি সম্পর্কে বেশ এক পরিহাসপূর্ণ শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা কাশীতে প্রচলিত আছে। আমরা চন্দ্র মহারাজের (স্বামী নির্ভরানন্দ) কাছে সেটি শুনেছি। হাস্যরসে ভরপুর সে-প্রসঙ্গ কত আশ্রমে রাতে প্রসাদ পাওয়ার পর সাধু-ব্রহ্মচারীদের আড্ডায় করেছি! সেটি এরকম :

কঠোপনিষদের একটি শ্লোকে (১।৩।১৫) নির্বিশেষ নিরুপাধিক ব্রহ্মরূপ আত্মার বর্ণনায় বলা হয়েছে—

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে।।

এই শ্লোকে বর্ণিত ব্রহ্মরূপ আত্মার লক্ষণগুলির সঙ্গে সেই ঝোলের অভাবনীয় সাদৃশ্য চমকপ্রদ। ‘অশব্দম্’ মানে শব্দবিহীন—ঝোলে আনাজ কিছু তো নেই যে নাড়াচাড়া দিলে শব্দ হবে! দুটি বস্তুর আঘাতজনিত কারণে শব্দের সৃষ্টি। হাতা দিয়ে নাড়লে কোন দৃশ্য বস্তুর অভাববশত আঘাত না লাগায় এটি শব্দহীন। ‘অস্পর্শম্’—স্পর্শবিহীন। এটি এত তরল যে, স্পর্শহীন—ধরাছোঁয়া যায় না। ‘অরূপম্’—তেল-মশলাহীন বলে প্রায় বর্ণহীন—অরূপ। আবার, যতই খাও না কেন তার শেষ নেই—‘অব্যয়ম্’—ব্যয় হয়ে শেষ হয়ে যায় না, ক্ষয়রহিত।

'অরসম্'—স্বাদহীন— বিস্বাদ। 'অগন্ধবৎ'— ফোড়নটোড়ন কিছু ব্যবহার না করায় অগন্ধি—গন্ধহীন। কবে থেকে এটা শুরু হয়েছে তা জানা যায় না। তাই—'অনাদি', আদিহীন। অন্যপক্ষে, এটি যে কোনদিন বন্ধ হয়ে যাবে তা-ও নয়, কারণ এটি 'অনন্তম্'—চলতে থাকবে। 'মহতঃ'—মহৎ ব্যক্তিগণ থেকে এটির উৎপত্তি। 'পরম্' মানে বিলক্ষণ। অনুপম, কোন দ্বিতীয় বস্তুর সঙ্গো উপমান উপমেয় সম্বন্ধশূন্য, তাই নিরুপম্। 'ধ্রুবম্'—কূটস্থ নিত্য। খেতে বসে অন্য পদ থাকুক আর না থাকুক এটি নিত্য উপস্থিত। এর কখনো অভাব দৃষ্ট হয় না, তাই 'নিত্যম্'। 'নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে'—যেমন তাঁকে (ব্রহ্মরূপ আত্মা) অবগত হলে সাধক মৃত্যুমুখ থেকে বিমুক্ত হন, তদ্রূপ এই ঝোল কিঞ্চিন্মাত্র গ্রহণে মর্তজীব মৃত্যুমুখ থেকে মুক্ত হয়ে অমৃতত্বলাভ করে!

প্রশ্ন : আরও শুনব—

মহারাজ : তাহলে শোন। মহাপুরুষ মহারাজের সচিব দ্বিজেন মহারাজ (স্বামী গঙ্গোশানন্দ) ছিলেন ক্রিকেট-পাগল। মহারাজ সেটি জানতেন। ভারতীয় দল খুব খারাপ খেললে পরদিনের খবরের কাগজের সে-অংশটা মহাপুরুষ মহারাজ বার করে অন্য সেবকের মাধ্যমে দ্বিজেন মহারাজের কাছে পাঠিয়ে বলতেন : 'আজ দ্বিজেনের জন্য বড় খবর আছে।' এরকম ঠাট্টা-রসিকতাও মহারাজ তাঁর সঙ্গো করতেন। যাহোক, ক্রিকেটের কোন বড়সড় ম্যাচ থাকলে কাজের ফাঁকে ফাঁকে রেডিওতে কমেন্ট্রি শোনা বা দুপুরে প্রসাদ পাওয়ার পর খবরের কাগজে ক্রিকেটের খবর সবিস্তৃত পাঠ ছিল সে-সময়ে দ্বিজেন মহারাজের নিত্য রুটিন।

তখন কলকাতায় টেস্ট ক্রিকেট চলছে। দ্বিজেন মহারাজের মনে তীব্র ইচ্ছে, একদিন মাঠে যান। কাউকে কিছু বলেননি। দুদিন খেলা হয়ে

গেছে। তৃতীয় দিনে খেলা খুব আকর্ষণীয় অবস্থায় গড়িয়েছে। সন্ধ্যায় মহাপুরুষ মহারাজ দ্বিজেন মহারাজকে ডাকলেন। বললেন : 'কাল তুমি খেলা দেখে এস।' দ্বিজেন মহারাজ যেন আকাশ থেকে পড়লেন! এখন টিকিটই বা কোথায় পাবেন আর টাকাই বা কে দেবে? মহাপুরুষ মহারাজ বললেন : 'টেবিলের ওপরে ওখানে একটা টিকিট আছে। আর আমার জামার পকেটে কিছু টাকা আছে। দেখ তোমার কত লাগবে—ওখান থেকে নিয়ে যাও।' আশ্চর্য, মহাপুরুষ মহারাজ কাউকে না জানিয়ে এক পরিচিত ডাক্তার-ভক্তের মাধ্যমে একদিনের একটা টিকিট দ্বিজেন মহারাজের জন্য আনিয়ে রেখেছিলেন!

পরদিন সন্ধ্যায় দ্বিজেন মহারাজ খেলা দেখে ফিরে মহাপুরুষ মহারাজের কাছে আসতেই মহারাজ খুশিতে বলে উঠলেন : 'দ্বিজেন, বেশ দেখলে তো! এবার খুশি তো!' কথাগুলি এমন ভঙ্গিতে বললেন যেন দ্বিজেন মহারাজের সখ মেটায় মহারাজের কী অসীম তৃপ্তি! পরবর্তী কালে দ্বিজেন মহারাজ আমাদের বলেছিলেন : 'এরপর থেকে কিভাবে কেন জানি না, আমার মন থেকে ক্রিকেট-প্রীতি একেবারে কমে গেল। জীবনে আর কোনদিন মাতামাতি তো দূরের কথা, ক্রিকেটের প্রতি তেমন আকর্ষণই আর অনুভব করতাম না।'

॥ ১১০ ॥

প্রশ্ন : মহাপুরুষ মহারাজের কাছে স্বামীজীর প্রসঙ্গ কিছু শোনেননি মহারাজ?

মহারাজ : স্বামীজীকে ঠাকুরের অন্য সন্তানেরা সম্পূর্ণ ভিন্ন চোখে দেখতেন, সেকথা শুনেছি। মহাপুরুষ মহারাজ স্বামীজীকে কী দৃষ্টিতে দেখতেন—

সেরকম একটি ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সে-ঘটনাতে আমি উপস্থিত ছিলাম।

একদিন রাতে প্রসাদ পাওয়ার পর আমরা মহাপুরুষ মহারাজের কাছে রয়েছি। মঠবাড়ির পূর্বদিকের বারান্দায় মহারাজ গঙ্গার দিকে মুখ করে ইজিচেয়ারে বসে। সামনে আমরা কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী মেঝেতে বসে। অনেকরকম প্রসঙ্গের পর স্বামীজীর কথা উঠল। একের পর এক ঘটনা। কী সব আলোচনা হয়েছিল এখন কিছুই মনে নেই। সেসব কথা লিখে রাখা, এমনকি সযত্নে মনে রাখার তাগিদও তখন আমরা তেমন অনুভব করিনি। তাঁদের সান্নিধ্যে আমাদের মন-প্রাণ আনন্দে এতই ভরপুর হয়ে যেত যে, আলাদা করে কিছু সংগ্রহ করে রাখা কখনো মনেই উঠত না। যাহোক, শুধু মনে আছে, বহুক্ষণ—তা দু-তিন ঘণ্টা তো হবেই, শুধুই স্বামীজীর প্রসঙ্গ করলেন মহাপুরুষ মহারাজ। যখন থামলেন, রাত অনেক হয়ে গেছে। মহারাজ খুব গম্ভীর, স্তব্ধ। আলো-আঁধারেও দেখা যাচ্ছে, মহারাজের মুখ আরক্তিম, চোখের পাতা ভারি। চুপ করে বসে আছেন। আমরা নির্বাক নিঃস্পন্দ। বেশ কিছুক্ষণ পর দুটো বাজার ঘণ্টা পড়ল। থমথমে পরিবেশ। দ্বিজেন মহারাজ কাছে এসে মহারাজকে দু-বাহুতে স্পর্শ করে বললেন : 'মহারাজ, রাত অনেক হয়েছে, চলুন এখন শোবেন একটু।' দ্বিজেন মহারাজ একথা শেষ না করতেই মহাপুরুষ মহারাজ যেন গর্জে উঠে খুব জোরের সঙ্গে বললেন : 'কী? ঘুম! ঘুম কোথায় চলে গেছে। স্বামীজীর এত কথা হল, আবার ঘুম থাকে নাকি? স্বামীজীর কথা বলে কত রাত আমরা না ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। স্বামীজীর কথা হলে ঘুম-টুম সব পালিয়ে যায়। স্বামীজীর কথা হল। কী inspiration! আমার তো এতটুকু ক্লান্তি নেই, দিব্যি ঝরঝরে

লাগছে। স্বামীজী আমাদের ঘুম ভাঙাতে এসেছিলেন। জেগেছি, আর কি ঘুমাই রে?' মহারাজের প্রতিটি কথা যেন এক শক্তিপ্রবাহের মতো আমাদের দেহ-মনে শিরশির করে সঞ্চারিত হচ্ছিল। সে-অনুভব বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। বেশ অনেকক্ষণ ওভাবে কেটে গেল। এবারে দ্বিজেন মহারাজ মহাপুরুষ মহারাজকে ধীরে ধীরে তুলে তাঁর ঘরে নিয়ে গেলেন।

আরেকটি ঘটনা। তখন স্বামীজী স্বয়ং রয়েছেন মঠে। ঘটনাটি শুনেছি স্বামীজীর শিষ্য-সেবক কানাই মহারাজের (স্বামী নির্ভয়ানন্দ) কাছে।

একদিন সন্ধ্যার পর স্বামীজী রাজা মহারাজকে তাঁর ঘরে ডাকলেন। মহারাজ আসতেই স্বামীজী বললেন : 'রাজা, আজ তুই একটু আমাকে বেশ কষে দলাই-মলাই করে দে তো দেখি। এরা ঠিক পেরে ওঠে না। ওদের যেন সব কচি খোকার হাত।' আর কানাই মহারাজকে বললেন : 'আজ আমায় ম্যাসাজ রাজাই করবে। তুই এখন আয়। কিছুক্ষণ পর আবার আসিস।' কানাই মহারাজ দেখলেন, মুহূর্তে রাজা মহারাজ পালোয়ানের মতো কাপড়টাকে কাছা দিয়ে স্বামীজীর শরীরের ওপর হাঁটু গেড়ে বসে দলাই-মলাই শুরু করে দিয়েছেন। কানাই মহারাজ ঘরের বাইরে বসে অপেক্ষা করছেন। প্রায় চল্লিশ মিনিট কেটে গেছে। স্বামীজী এখনো ডাকছেন না। কৌতূহলী হয়েই কানাই মহারাজ ভেজানো দরজাটা একটু ফাঁক করে ঘরের ভিতরে যেন কোন কাজের জন্য গেছেন—এমন ভাব করে এটা-ওটা খুঁজছেন। দেখলেন, মহারাজ তাঁর পালোয়ানি দশাসই শরীর নিয়ে স্বামীজীকে ম্যাসাজ করতে করতে একেবারে শ্রান্ত, ক্লান্ত; সত্যিই হাঁপাচ্ছেন এবং দরদর করে তাঁর সারা শরীরে ঘামের ধারা বইছে! স্বামীজী কিছু টের পাওয়ার আগেই কানাই মহারাজ বেরিয়ে

এলেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে মহারাজ স্বামীজীর ঘর থেকে বেরিয়ে এলে স্বামীজী কানাই মহারাজকে ডাকলেন এবং হাতপাখার বাতাস করতে বললেন।

এদিকে রাতে প্রসাদ পাওয়ার সময় স্বামীজীর ও রাজা মহারাজের কয়েকজন চেলা কানাই মহারাজের কাছ থেকে স্বামীজীর মহারাজকে দিয়ে এতক্ষণ ম্যাসাজ করানোর ঘটনাটি শোনেন। তাঁদের মনে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব এবং অবশেষে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ কেউ মত প্রকাশ করেন : 'মহারাজ মঠের প্রেসিডেন্ট, আমাদের গুরু। তাঁকে দিয়ে স্বামীজী এই সামান্য কাজ করালেন! আমাদের বললেই তো হতো' ইত্যাদি। আবার স্বামীজীর কোন চেলা বললেন : 'আমরা থাকতে মহারাজকে এত কষ্ট দেওয়া কেন? আমাদের ডাকলেই তো হতো। আমরা একটু গুরুসেবা করে ধন্য হতাম।' অবশেষে কিভাবে এবং কার কাছে তাঁদের মনের সংশয়টি খুলে ধরা যায়—ভাবতে ভাবতে সাধুরা ঠিক করলেন, ব্যাপারটি প্রসাদ পাওয়ার পর মহাপুরুষ মহারাজকে জিজ্ঞাসা করলেই হয়। সেরকম সিদ্ধান্ত করে কয়েকজন সাধু মহাপুরুষ মহারাজের কাছে গেলেন এবং সন্ধ্যার ঘটনাটি সবিস্তারে বর্ণনা করে স্বামীজীর এরকম ব্যবহারের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

সব শুনে মহাপুরুষ মহারাজ আনন্দে যেন অধীর হয়ে উঠলেন এবং উৎফুল্ল হয়ে বারেবারে বলতে লাগলেন : 'আহা! আহা! রাজার কী ভাগ্য! সত্যিই রাজাকে দিয়ে স্বামীজী একঘণ্টা দলাই-মলাই করিয়েছেন! আহা! আহা! রাজার কী সৌভাগ্য! ওর জীবন ধন্য হয়ে গেল। আহা! আমায় যদি স্বামীজী ডাকতেন! আঃ, আমায় যদি একটিবার স্বামীজী এ-সুযোগ দিতেন! আমার জীবন সার্থক হতো, কৃতকৃতার্থ হতাম! স্বামীজী স্বয়ং শিব! শিবাবতার! তাঁর দেহের সামান্য সেবা দুর্লভ!' এরকম বলতে বলতে

মহাপুরুষ মহারাজ যেন আনন্দে উন্মত্ত হয়ে উঠছেন এবং রাজা মহারাজের ভাগ্যের প্রসন্নতা ভেবে যারপরনাই আহ্লাদিত হচ্ছেন দেখে অর্বাচীন সাধুরা একেবারে হতভম্ব ও বিস্মিত। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুর স্বামীজীর স্বরূপ সম্পর্কে কী কী বলতেন, সেসব কথা মহাপুরুষ মহারাজ কিছু বললেন। নবীন সাধুরা সেসব শুনে অত্যন্ত খুশি হয়ে মহাপুরুষ মহারাজকে শ্রদ্ধাবনত চিত্তে একে একে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

—শেষের দিকে মহাপুরুষ মহারাজ কথাবার্তা খুব একটা বলতে পারতেন না—

মহারাজ : মহাপুরুষ মহারাজের মহাপ্রয়াণ দিবসের একটি দৃশ্য এখনো মনে ভেসে ওঠে। মহারাজের পত্রপুষ্পমাল্যাদি-ভূষিত পূতদেহ মঠের সব মন্দির পরিক্রমা করে মঠপ্রাঙ্গণে স্বামীজীর আমগাছটির নিচে খাটে শায়িত। অগণিত সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্ত একে একে মহারাজের পাদপদ্মে অন্তিম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে চারপাশে দণ্ডায়মান। এমন সময় কলকাতার বেদান্ত মঠ থেকে গাড়ি করে এলেন অভেদানন্দজী মহারাজ। গাড়ি থেকে নেমে জুতোজোড়া একটু দূরে খুলে রেখে হাতদুটো জোড় করে এগিয়ে এলেন মহাপুরুষ মহারাজের চরণদ্বয়ের ঠিক কাছে। ভক্তিগদগদ কণ্ঠে হাতজোড় করেই শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটি শ্লোক স্পষ্ট উচ্চারণে আবৃত্তি করে মহাপুরুষ মহারাজের পাদপদ্মে নতমস্তক হয়ে প্রণাম করলেন।

ধ্যেয়ং সদা পরিভবঘ্নমভীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিঞ্চিনুতং শরণ্যম্।
ভৃত্যার্ত্তিহং প্রণতপাল ভবাব্ধিপোতং
বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবতম্, ১১।৫।৩৩)

শ্লোকটির অর্থ—হে প্রণতপালক মহাপুরুষ! সর্বদা ধ্যানযোগ্য, ইন্দ্রিয়াদিজনিত পরাভবনাশক, অভীষ্টপ্রদ, পরম পবিত্র গঙ্গাদি তীর্থের আশ্রয়, শিবব্রহ্মাদি বেদগণের বন্দনীয়, শরণ্য, ভৃত্যজনের আর্তিহর ও সংসারসাগরের পোতস্বরূপ আপনার পাদপদ্ম আমি বন্দনা করি। সেদৃশ্য চোখ বুজলে এখনো যেন দেখতে পাই।

॥ ১১১ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আজ স্বামীজীর জন্মদিন। সকালে রেডিওতে স্বামীজীর সম্বন্ধে আলোচনা হচ্ছিল।

মহারাজ : তাই?

—সকালবেলা করেছে।

মহারাজ : শুনেছ?

—একজনের মুখে শুনলাম, সে শুনেছে।

মহারাজ : লোকে কানে শোনে, তুমি মুখে শুনলে? (সকলের হাসি)

—না, অপরের মুখে শুনেছি—মানে অপরের মুখ থেকে কানে শুনেছি।

মহারাজ : যাই হোক। তোমার কথাটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। (সকলের হাসি) আর আমি যে তোমাদের সঙ্গে চোখ দিয়ে হাসতে পারছি না, তার কী করবে? (চোখের সমস্যার জন্য মহারাজের চোখে কালো চশমা পরানো ছিল।)

—মহারাজ, চোখেও হাসি হয়?

মহারাজ : চোখে হাসি হয় না? ওরে বাবা!

নেত্রবক্ত্রবিকারস্য লক্ষ্যতে তদ্গতং মনঃ।
আকারৈরিঙ্গিতৈর্গত্যা চিত্তয়া ভাষণেন চঃ॥

'নেত্রবক্ত্রবিকারস্য লক্ষ্যতে তদ্গতং মনঃ'—এসব শাস্ত্রকথা নয়, নীতি-কথা।

—তবে এর থেকেও জানা যায় যে, মানুষ কতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে।

মহারাজ : তা কেউ কেউ মনের ভাবকে চাপতেও পারে।

—বাইরে প্রকাশ করতে জানে না।

মহারাজ : ভেতরটা জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে, বাইরে একেবারে শান্ত—এমন হয়। আগ্নেয়গিরি যেমন বাইরে প্রকাশের আগে শান্ত হয়ে থাকে কিন্তু ভেতরটা জ্বলছে সর্বদা।

—মানুষের ক্ষেত্রে এটা তো ভাল নয়।

মহারাজ : ভাল তো নয়ই, বরং সেটা কপটতা। বাংলায় বলে বর্ণচোরা আম। বর্ণচোরা আম—দেখতে যদিও কাঁচা, ভেতরে পেকে গেছে।

—বর্ণচোরা। বর্ণটা সবুজই আছে। ভেতরটা পেকেছে। (সকলের হাসি)

মহারাজ : হুঁ। আমি যে তোমাদের হাসিটা দেখতে পাচ্ছি না—খুব যে মুশকিল হল।

—চোখে আজকে ওষুধ দিয়েছে? ও ঠিক হয়ে যাবে মহারাজ।

মহারাজ : ঠিক হয়ে যাবে? কবে?

—আজকে চশমা পরে আছেন। কালকে হয়তো ঠিক হয়ে যাবে।

মহারাজ : তার মানে তুমি বলছ, কালকে অবধি থাকবে? ও বাবা! (সকলের হাসি)

—না, তা কেন? তার আগেই ঠিক হয়ে যেতে পারে।

মহারাজ : তুমি এসে আমার রোগ দেখবে?

না মহারাজ। আমরা এসে দেখব আপনার রোগ সেরে গেছে। চোখে ব্যথা হচ্ছে মহারাজ?

মহারাজ : হুঁ। রোগটা কি চোখে দেখা যায়?

—এই দর্শনটা তো মহারাজ অনেক অর্থে ব্যবহার করা হয়।

মহারাজ : তুমি বললে, এসে দেখবে রোগ সেরে গেছে। কিন্তু চোখে রোগ দেখা যায়?

—না। এই 'দেখা' জিনিসটা অনেক অর্থে ব্যবহার হয় তো মহারাজ—

মহারাজ : অনেক অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন—দেখে নেব। (সকলের হাসি)

—কথার মধ্যে অত দোষ ধরলে কি আর কথা বলা যায়?

মহারাজ : আমার আগে একটা রোগ ছিল যে, লোকের কথার ভেতর বড্ড খুঁত ধরতাম। তারপরে এখন সেটা কমে গিয়ে তার আভাসটা আছে। আভাস মানে জান তো?

—হ্যাঁ, মহারাজ।

মহারাজ : কী বল তো? (সকলের হাসি)

—ঐ ধরলেন আবার।

মহারাজ : এটা বৃহদারণ্যকের কথা। 'কশ্চিৎ ব্রুয়াৎ বেদ বেদ।/ যথা বেত্থ তথা ব্রুহি।'

—আগেরটা শুনিনি মহারাজ, কী বললেন?

মহারাজ : 'কশ্চিৎ ব্রুয়াৎ বেদ বেদ।/ যথা বেত্থ তথা ব্রুহি।'

—অর্থটা কী হল, মহারাজ?

মহারাজ : অর্থ আছে—একজনকে ভূতে ধরেছে। তারপরে তাকে আর একজন প্রশ্ন করছে—বেদ বা এতৎ। যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি। অমতং

মতম্। অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্। উত্তরে বলল—বেদ বেদ ইতি—যো বা কশ্চিৎ ব্রুয়াৎ। যথা বেত্থ তথা ব্রুহি। জানি জানি তো সকলেই বলে। বল কী জান? বৃহদারণ্যকে আছে। তুমি তো বৃহদারণ্যক পড়। 'মদ্রেষু চরকাঃ পর্যব্রজাম তে পতঞ্জলস্য কাপ্যস্য গৃহানৈম তস্যাসীদ্ দুহিতা...।' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৩।৩।১)।

—আপনার সব মুখস্থ আছে দেখছি।

মহারাজ : মুখস্থ থাকলেই অন্তরস্থ হবে, তা নয়।

—মহারাজ, আজ এই পর্যন্ত থাক।

মহারাজ : তা তো থাকবেই, কারণ চোখ খুলতে পারছি না।

—না। আপনি খুলতে যে চেষ্টা করছেন, এতে আরো চোখের ব্যথা বেড়ে যাবে।

মহারাজ : চোখ দিয়ে তো কথা বলছি না।

—তা ঠিক।

মহারাজ : বাবা! নাকে-চোখে কথা বলে না। কিন্তু কি জান—আমরা এই সব হাসি-ঠাট্টা করি, বেদ বিদ্যালয়ের ছেলেরা যদি শোনে, তাদের তো অকালপক্কতা এসে যাবে।

—না, মহারাজ। ওরা এসব শোনে না, বা সব বোঝেও না। আর আমাদের ভেতর যেসব কথা হয়, সে ভাল কথাই মহারাজ। খারাপ কথা তো নয়। এসব কথাবার্তার মধ্যে আমরা একটু আনন্দ করি।

মহারাজ : না, রাজা মহারাজ বলতেন—আমরা ভাল কথাও বলি। আমাদের এখানে ভাল কথাও হয়!

—ভাল কথাই তো বলছি মহারাজ। ভাল কথা ছাড়া এখানে খারাপ কথা হয়ই না।

মহারাজ : শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।
আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ।।
(কঠোপনিষদ্, ১।২।৭)

কি বল?

—আমি তো বলব না। আমি তো বক্তা নই।

॥ ১১২ ॥

প্রশ্ন : ঠাকুর বলছেন—মা, তোমার পাদপদ্মে শুদ্ধাভক্তি দাও। আর তোমার ভুবনমোহিনী মায়াতে মুগ্ধ করো না। এই ভুবনমোহিনী মায়াটি কী?

মহারাজ : ভুবনমোহিনী মায়া—যে-মায়াশক্তি জগতের মানুষকে মুগ্ধ করে ভুলিয়ে রেখেছে।

—তোমার ভুবনমোহিনী মায়া?

মহারাজ : ভগবানেরই মায়া।

—মায়া কি মায়ের?

মহারাজ : হ্যাঁ, মায়ের—মানে জগন্মাতার।

—কেন তিনি মুগ্ধ করতে চান? মা ভুবনমোহিনী মায়ায় মুগ্ধ করেন কেন?

মহারাজ : তা মায়াতে মুগ্ধ করবে তো!

—তিনি তো মা? তিনি তো আমাদের মা, তিনি আমাদের—

মহারাজ : মা হলে কী হবে? মা তাঁর স্নেহ দিয়ে মুগ্ধ করে রাখেন না?

—সে তো অন্য অর্থ।

মহারাজ : মা স্নেহ দিয়ে মুগ্ধ করে রাখেন।

—স্নেহ দিয়ে মায়ায় মুগ্ধ করেন কেন?

মহারাজ : চণ্ডীতে আছে, তিনি মুক্তও করেন, আবার তিনি বন্ধও করেন। আর বন্ধ না করলে তাঁর লীলা হবে কী করে? এজন্যে তিনি বন্ধ করেন। বন্ধ করা মানে তাঁর মায়ায় মুগ্ধ করেন। তাঁর এই জগৎ-রূপে লীলাটা তো এভাবেই চলছে।

—তিনি কিরকম মা?

মহারাজ : অ্যাঁ? তিনি কিরকম মা? তা, সৎমায়ের চেয়ে ভাল। (সকলের হাসি)

—যেখানে সাধারণ জাগতিক মায়েরা সন্তানকে ভালবাসেন, রক্ষা করেন—সেখানে জগন্মাতা হয়ে তিনি কেন আমাদের মায়ায় মুগ্ধ করেন?

মহারাজ : আমাদের মা এরকমই! তাঁকে পছন্দ না হলে দেখ অন্যরকম কোন মাকে পাওয়া যায় কিনা! আর কথা হল, জগৎ না থাকলে জগন্মাতা কী করে হবেন? (মহারাজের হাসি)

—মুগ্ধ করলেই জগৎ?

মহারাজ : মুগ্ধ করলে তিনি জগৎ-রূপ হন। জগৎ-রূপে তিনি লীলা করছেন। মুগ্ধ না করলে কী করে লীলা হবে? জগৎ-রূপে তিনি খেলা করছেন। ঠাকুর বলছেন না যে, চোর চোর খেলাতে বুড়ি চায় না যে সবাই তাকে ছুঁয়ে মুক্ত হয়ে যাক। আবার যখন দেখেন যে, দুই-একজন আর পারছে না, তখন বুড়ি তাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়।

—এই পারছে না বলতে কী বোঝাচ্ছে মহারাজ?

মহারাজ : পারছে না মানে, এ-সংসারে অতিষ্ঠ হয়ে গেছে। আর সে খেলতে চায় না।

–মহারাজ, আমাদের যে সাধন-ভজন, তা এই মায়া অতিক্রম করার জন্য তো, সেটা কি তাহলে মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে?

মহারাজ : মায়া—গীতায় দুই রকম বলছে না? দৈবী মায়া, আর গুণময়ী মায়া? দৈবী মায়া হল—আত্মমায়া। আত্মমায়ায় তিনি লীলা করছেন আর গুণময়ী মায়ায় তিনি মুগ্ধ করছেন।

—তাহলে আমরা যদি তাঁর এই গুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করার চেষ্টা করি, সেটা কি তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা হবে?

মহারাজ : না। তাঁকে—তাঁর নির্গুণ সত্তাকে আমরা গ্রহণ করবার বা বুঝবার চেষ্টা করব।

—মহারাজ, ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন একটা গানের উল্লেখ করে যে, 'আয় মা সাধন সমরে। মা হারে কি পুত্র হারে।'

মহারাজ : হ্যাঁ। ও তো অভিমানের কথা। মায়ের সঙ্গে ঝগড়া। মায়ে-পোয়ে ঝগড়া। অভিমানের কথা। তা বলছেন, 'মা হারে কি পুত্র হারে—দেখব, আয় মা সাধন সমরে।'

—এটা একটা বিশেষ ভাব।

মহারাজ : হ্যাঁ, বিশেষ ভাব।

—মায়ের মায়াতে মুগ্ধ হলে সে-দায়িত্ব তাহলে মায়ের, আমাদের নয়।

মহারাজ : তোমাদের নয়। তাহলে মুগ্ধ হয়ে থাক। (সকলের হাসি) মুগ্ধ যদি হতে না চাও তো মাকে প্রার্থনা কর যে—মা, তোমার ভুবনমোহিনী মায়ায় আমায় মুগ্ধ করো না। আর যদি মায়া ভাল লাগে, থাক মায়ার ভেতর নাক ডুবিয়ে।

—আমি প্রার্থনা না করলেও কি সত্যি সত্যি মা রক্ষা করেন?

মহারাজ : চণ্ডীতে বলছে :

সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী।
সংসারবন্ধহেতুশ্চ সৈব সর্বেশ্বরেশ্বরী।। (১।৫৭-৫৮)

তিনি সংসারে বন্ধনের কারণ, আবার মুক্তিরও কারণ। যে যেটা চায়।

—তাহলে তাঁর কাছে প্রার্থনা না করলে তিনি আমাদের রক্ষা করেন না? সেই অবস্থায় যখন আমরা—

মহারাজ : তাহলে খেল।

॥ ১১৩ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আমরা আশা করছিলাম মহারাজের (স্বামী চেতনানন্দ) কাছ থেকে কিছু আমেরিকার খবর শুনব।

মহারাজ : তাহলেই হয়েছে!

—কেন?

মহারাজ : আমেরিকার খবর তো ঝুড়ি ঝুড়ি আছে। তোমরা কত শুনবে?

—না না। অল্প অল্প করে হবে। পাঁচ মিনিট, দশ মিনিট। অল্প অল্প করে যদি উনি বলেন তাহলে আপনিও শুনবেন, আমরাও শুনব।

মহারাজ : ঐ দেখ, কী বলছে দেখ। এখন তোমার কথা।

স্বামী চেতনানন্দ : ওদের বয়স কম তো। ওরা জানে না। আমি এখানে এসেছি কি আমেরিকার কথা বলার জন্য? (মহারাজের হাসি)

—আমাদের এখানে যাঁরা আসেন, তাঁরা মহারাজের কাছে ওসব কথাও বলেন, এই আর কী।

স্বামী চেতনানন্দ : আমি এখানে আসি মহারাজের কাছে শোনার জন্য।

মহারাজ : না, যদিও তুমি বলবার জন্যে আসনি, কিন্তু এরা তোমার কাছে শুনতে চায়।

স্বামী চেতনানন্দ : সেটা আপনার সমক্ষে হবে না। (মহারাজের হাসি)

মহারাজ : ঠাকুর বলছেন, 'এখানে মাস্টার মুখ খুলবে না। আর অন্য জায়গায় গিয়ে দাঁত বার করবে।' (সকলের হাসি)

–মহারাজের কাছে ওখানকার ভক্তরা কেমন প্রশ্ন করেন, কী জিজ্ঞাসা করেন আমরা তো শুনতে পারি, এইরকম আর কী।

মহারাজ : অন্য সময়ে ধরে আদায় কর।

স্বামী চেতনানন্দ : আবার অনেকের আছে মহারাজ, প্রশ্ন করাটাই ধর্ম। উত্তর কী হল না হল—সেটা প্রয়োজন নেই।

মহারাজ : না, প্রশ্ন করলে বক্তা তার বক্তব্য বলতে পারে, যাদের শুনবার ইচ্ছা শুনবে। যারা বুঝতে পারে বুঝবে। 'শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ। আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥

॥ ১১৪ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনাদের সময় ব্রহ্মচর্য-সন্ন্যাসের দিন কি নির্জলা উপোস করতে হতো?

মহারাজ : আমাদের ব্রহ্মচর্যের সময় আমাদের একজন, তার ব্রহ্মচর্য হবে—পরে নাম হয়েছিল অচিন্ত্যানন্দ—তা বলছে, মহারাজ, উপোস করতে হবে? তা তিনি বললেন—না, একটু ঠাকুরের প্রসাদী ফলটল খাবে।

—কে বলেছেন? মহাপুরুষ মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ, মহাপুরুষ মহারাজ। বুড়োদের young-দের প্রতি একটু sympathy থাকে। Young-দের বুড়োদের প্রতি অতটা হয় না! (সকলের হাসি)

—Sympathy না থাকলে বুড়োরা বেঁচে থাকে কী করে?

মহারাজ : অন্নদামঙ্গলে আছে—'না মরে পাষাণ বাপ দিলা হেন বরে।' বাপ মরে না। অন্নপূর্ণা বাবা হিমালয় সম্বন্ধে বলছেন। 'অন্নপূর্ণা উত্তরিলা গাঙ্গিনীর তীরে।/ পার কর বলিয়া ডাকিলা পাটুনীরে।' গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে পাটনীকে বললেন—পার কর আমাকে। 'সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।/ ত্বরায় আনিল নৌকা বামা-স্বর শুনি।' মেয়ে—ঐ রাত্রে! বাবা! বলে কে ডাকছে? তাড়াতাড়ি করে নৌকা নিয়ে এল। তারপরে সেই ঈশ্বরী বলছে—'একা দেখি কুল-বধূ।' কোন বাড়ির বউ? তুমি কে? তখন 'ঈশ্বরীরে পরিচয় কহেন ঈশ্বরী।/ বুঝহ ঈশ্বরী আমি পরিচয় করি।' আমি ঈশ্বরী। এটার গোপন অর্থ হল—বাইরেতে আমি বলছি শোন—ভেতরে নয়।

—'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।' এই লাইনগুলো আছে তার পরে।

মহারাজ : শোন, আরো আছে—

কু-কথায় পঞ্চমুখ কণ্ঠ-ভরা বিষ।
কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ।

শিবের বর্ণনা হচ্ছে। কু-কথা মানে বেদের কথা। 'কু' মানে বেদ। বেদের কথায় পঞ্চমুখ। 'কণ্ঠ ভরা বিষ'। নীলকণ্ঠ। 'কেবল আমার সঙ্গে দ্বন্দ্ব অহর্নিশ'। মানে মিলন। দ্বন্দ্ব মানে ঝগড়া, আবার দ্বন্দ্ব মানে মিলন।

প্রশ্ন : মহারাজ, এদের খুব ঠান্ডা লাগে। কিছু বড়ি-টড়ি খাইয়ে দিন।

মহারাজ : না, একটু গাঁজা অভ্যাস করালে ভাল হয়। এক কলকে গাঁজাতে দুটো কম্বলের কাজ করে। আমি দেখেছি, অমরনাথে কতকগুলি নাগা সাধু—গায়ে যথেষ্ট গরমের জামা-কাপড় নেই। আমি বলি, টেঁকে কী করে? তা বলে, গাঁজা। একজন রাশিয়ান ছিল। সে বরফের মধ্যে শুয়ে থাকত। আমি বলি, কী ব্যাপার—তোমার ঠান্ডা লাগে না? সে বলে—Do you feel cold in your face? I am all face.

প্রশ্ন : মহারাজ, একটা কথা—

মহারাজ : বল।

—স্বামীজী একজায়গায় বলছেন, কাউকে সাহায্য করবার সময় সে যে-পর্যায়ে আছে, সেখান থেকে তাকে সাহায্য করতে হবে।

মহারাজ : হুঁ, তা তো বটেই।

—এইটার কী অর্থ?

মহারাজ : এর কী অর্থ? একজন জ্বরে ভুগছে। সেসময় তাকে Philosophy উপদেশ করছি। তা, তখন কি তাকে Philosophy উপদেশ করলে কাজ হবে? সে যে-পর্যায়ে, তাকে সেই পর্যায়ে নেমে উপদেশ করতে হবে।

—হ্যাঁ। কেউ হয়তো কোন গর্হিত কর্ম করেছে বা দোষ করেছে—তার মানে কি সেই পর্যায়ে নামা—মানে কি তার—

মহারাজ : কেউ গর্হিত কার্য করেছে কি না করেছে, তোমাকে বিচার করতে হবে কেন?

—না, সেই যে সাহায্য করার ব্যাপারে যখন বলছে যে—

মহারাজ : সাহায্য করা দরকার।

—হ্যাঁ। কিভাবে করব?

মহারাজ : তা ঠিকই। যাতে সে উঠতে পারে এমন সাহায্য তাকে করতে হবে।

—না। যে সাহায্য করছে সে তার পর্যায়ে যাবে কী করে? সেটাই প্রশ্ন মহারাজ।

মহারাজ : তার প্রতি সহানুভূতি থাকতে হবে। তার মতো feeling আনতে হবে। তবে তো হবে। অপরকে টেনে তোলাই তোমাদের ধর্ম।

—খালি নিজেকে পারছি না।

মহারাজ : নিজেকে পারছ না? নিজেকে টেনে তোলা মুশকিল আছে। নিজেকে টেনে তুলবে কী করে?

—ভগবানও ঐ ভাব বলে গেছেন। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং'—নিজেকে নিজে টেনে তোল। 'উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ'। (শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা, ৬।৫)

মহারাজ : 'উদ্ধরেৎ আত্মনা আত্মানং'—তা বটে।

—সময় হয়ে গেছে। আসি মহারাজ।

মহারাজ : সময় হয়ে গেল! এস।

॥ ১১৫ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন—'কি জান? যার যা কর্মের ভোগ আছে, তার তা করতে হয়। সংস্কার, প্রারব্ধ এসব মানতে হয়।' যদি তাই হয় তাহলে সাধন ভজনের উপযোগিতা কোথায়?

মহারাজ : কর্মফল ভোগ আছে না? তাকে চেষ্টা করতে হবে উন্নতি করবার জন্য। সেই পর্যায় থেকে সে উঠবার চেষ্টা করছে। তা, ঠাকুর কি আর চেষ্টা করতে বারণ করেছেন?

—তাই। তাহলে এই সংস্কার ও প্রারব্ধ মানতে হয়—মানে?

মহারাজ : মানে একজন জ্বরে ভুগছে, তা সে যদি খালি হা-হুতাশ করে, তার হবে না। তাকে বুঝতে হবে যে, আমার কর্মফলে আমি ভুগছি। তাহলে তার কষ্টটা লাঘব হবে অনেক।

—জ্বরের ক্ষেত্রে এটা ছেড়ে দিলাম। এমনি যে সংস্কার বা প্রারব্ধের ফলে আমরা তো ভুগছি, তাহলে গুরুকৃপা বা ঈশ্বরের কৃপা কী?

মহারাজ : প্রারব্ধ আর সংস্কার—দুটোয় তফাৎ আছে। প্রারব্ধ—গত জন্মের সংস্কারের ফলে প্রারব্ধ হয়। ইহজন্মে সংস্কার সৃষ্টি হয়। সংস্কারের জন্য পরজন্ম লাগে না। ইহজন্মতেই হয়। আর প্রারব্ধ কথাটার মানে আগের জন্মের কর্মফল, সেটি এখন ভোগ হচ্ছে।

—এটাকে ঠাকুর বলছেন, মানতে হয়। এটা তো সকলের ক্ষেত্রেই আসবে, এটা কি—

মহারাজ : স্বীকার করতে হয়।

—তাহলে গুরুকৃপা বা ঈশ্বরের কৃপা দাঁড়াল কোথায়?

মহারাজ : প্রারব্ধ স্বীকার না করলে ব্যাখ্যা হয় না। মানুষের জীবনের শুরুতে যে প্রারব্ধ থাকে সে-প্রারব্ধ তো এখন সৃষ্ট নয়। কাজেই তার পূর্বজন্ম মানতে হয়।

—না, গুরুকৃপা বা ঈশ্বরের কৃপায় তো সেটা কমতে পারে বা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেটার স্থান কোথায়?

মহারাজ : তা তো বলেননি। বলেছেন, কারো হয়তো খুব বিরাট প্রারব্ধ ছিল। 'লাভে ব্যাঙ অপচয়ে ঠ্যাঙ।' তা ঠ্যাঙ-এর ওপর দিয়ে চলে গেল। এইরকম। অল্পের উপর দিয়ে চলে গেল। লাভে ব্যাঙ অপচয়ে ঠ্যাঙ। (হাসি)

—কী এটা মহারাজ, গল্পটা?

মহারাজ : একই নক্ষত্রে জন্মাল দুজনে। একজনের নাম দিল বিক্রমাদিত্য। আরেকজনের বি কে হাড়ি। (সকলের হাসি) 'ব' দিয়ে করতে হবে। তা, বিক্রমাদিত্য—রাজার ছেলে। আর হাড়ি বংশে জন্মেছে বি কে হাড়ি। তারপর একজায়গায় লেখা আছে যে, চতুষ্পদ লাভ হবে। তা চতুষ্পদ—বিক্রমাদিত্যকে একজন রাজা উপহার দিল একটা হাতি। আর সে হাড়িকে কী দেবে, হাতি সে পুষবেই বা কী করে! তা ছেলেরা খেলা করতে করতে 'ধর ধর' বলে তার হাতে একটা ব্যাঙ দিল। (হাসি)

—চতুষ্পদ পাওয়া গেল।

মহারাজ : মানে, কর্মফল ঠিক মিলে গেল। ওর হল হাতি, আর এর হল ব্যাঙ। লাভে ব্যাঙ। আর অপচয়ে ঠ্যাঙ। অপচয় মানে একটা কিছু অঙ্গহানি হবে। তা বিক্রমাদিত্য, ছুরি দিয়ে কাটতে কাটতে একটু লেগেছে। দু-এক ফোঁটা রক্ত পড়ে গেল। এই হল তার। আর বি কে হাড়ি—খেলা করতে করতে গাছ থেকে পড়ে গিয়ে ঠ্যাঙটা ভেঙে গেল। (সকলের হাসি)

—কোনদিন বলেননি মহারাজ। এটা দারুণ গল্প! মহারাজ, এখানে গুরুকৃপা বা ঈশ্বরের কৃপার ভূমিকাটা কী?

মহারাজ : ঐ অপচয়ে ঠ্যাঙটাকে কমিয়ে দেবে।

—এই যে কমিয়ে দেওয়াটা—গুরুকৃপা বা ঈশ্বরের কৃপাটা কি প্রারব্ধের মধ্যে ধরা যায়? মানে—এটাও ছিল?

মহারাজ : না, প্রারব্ধের মধ্যে পড়ে না।

—কেন না?

মহারাজ : কারণ, স্বামীজী ঠাকুরকে বলছেন 'কপালমোচন'। কপালের লেখা, সেটা প্রারব্ধ। তাকে মুছে দিতে পারেন—'কপালমোচন'।

—কিন্তু অতীতকর্মের ফলেই যদি আমাদের গুরুলাভ হয়, সেটা কি প্রারব্ধ বলা যাবে না, মহারাজ?

মহারাজ : না না। গুরুকৃপা মানে কী? গুরুলাভ করা মানে কি গুরুকে ট্যাঁকে করা?

—না, তাঁর কৃপা।

মহারাজ : গুরুর কৃপা এমনি তো হয় না। কৃপার যোগ্যতা আনতে হয়।

—সেই তো। তাহলে সেটাই আগে প্রারব্ধ ছিল মনে করা যাবে না?

মহারাজ : না না। সবই তো প্রারব্ধ ছিল তাহলে। তুমি হোঁচট খেয়ে পড়লে—সেটাও প্রারব্ধ; আর তুমি গাছ থেকে পড়ে ঠ্যাঙ ভাঙলে—এটাও প্রারব্ধ। তা একরকম তো হল না। প্রারব্ধের ভেতরে গৌরব-লাঘব হয়। আচ্ছা, আমাদের গোবিন্দ আছে? না, চলে গেছে? (গোবিন্দ মহারাজ সামনে এলে) এই! গোবিন্দমুখারবিন্দ না দেখলে তৃপ্তি হয় না। তা পোড়ামুখই হোক, তাহলেও! (সকলের হাসি)

—আমারও বোধ হয় প্রারব্ধ ছিল। অল্পের জন্য চোখটা বেঁচে গেছে। চোখ বেঁচে যাওয়াটা কি প্রারব্ধ?

মহারাজ : কেউ যদি বলে প্রারব্ধ ছিল, প্রশ্ন হবে—তা জানলে কী করে?

—না হলে এরকম ঘটার কথা নয়। অন্য যুক্তি তো খুঁজে পাওয়া যায় না।

মহারাজ : আসল কথা হচ্ছে, যে-কর্মফলগুলোর আমরা বর্তমান ব্যাখ্যা পাই না, তাদের বলি প্রারব্ধ। তাদের বলি দৈব বা প্রারব্ধ। 'পূর্বজন্মাৎ কৃতংকর্ম তদ্দৈবম্ ইতি মন্যতে।' আগের জন্মে কৃত যে-কর্ম, তার ফলে

এই জন্মে যা ভোগ করি তাকে বলি দৈব বা প্রারব্ধ। গোবিন্দ, তোমাকে এত গোঁফ নিয়ে দেখাচ্ছে বেশ! (হাসি) তুমি এক কাজ কর না—নিজে পারবে না, আরেকজনকে বল কাঁচি দিয়ে একটু একটু করে কেটে দেবে।

—ডাক্তারকে দেখিয়ে তারপরে কেটে ফেলব। তা না হলে আবার infection-এর ভয় আছে।

মহারাজ : সে সাবধানে করতে হবে।

—মহারাজ, খুব ঠান্ডা পড়েছে। অনেকেই দেখছি স্নান করছে না।

মহারাজ : শোন, বলি তাহলে—একজন কেদারে গেছে। স্নান করবে, তা ঠান্ডায় জলে নামতে পারছে না। তা করল কী, কোমরে কাপড় বেঁধে পাণ্ডাকে বলল—আমি লাফ দেব, তারপর তুমি টেনে তুলবে। (সকলের হাসি) তা, লাফ দিল। তাকে টেনে তুলল আধমরা অবস্থায়। লাভ হল এই—এ-জন্মের জন্য তার কানটা গেল!

—পাড়ে বসে আস্তে আস্তে জল দিয়ে দিয়ে একটু সইয়ে নিলে পারত—

মহারাজ : যাও না, যাও। টের পাবে।

—আমি করেছি।

মহারাজ : কোথায়?

—আমি গোমুখে করেছি।

মহারাজ : গোমুখে স্নান করেছ?

—হ্যাঁ। তখন বয়স অনেক কম ছিল তো।

মহারাজ : তাই নাকি? তোমার বয়স কোনদিন কম ছিল? (সকলের হাসি)

—যমুনোত্রীতেও স্নান করেছি।

মহারাজ : গরম কুণ্ডে?

—Hot spring-এ।

মহারাজ : সে তো দারুণ গরম। চাল দিলে ভাত হয়ে যায়।

—মণিকরণেও আছে মহারাজ, সেখানে হঠাৎ গিয়ে কেউ নামে না। যেখানটাতে স্নান করে, পর পর তিনটে hot spring—ওখানে গিয়ে যদি কেউ হঠাৎ নামে, তখন অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। দারুণ গরম।

মহারাজ : তাই তো। গুজরাটে একটা hot spring আছে। সেখানে একটা বড় চৌবাচ্চা করা আছে স্নান করার জন্য। একবার গেছি। তা আমি তাতে নামতে পারলাম না। গরম খুব। তা দেখলাম, আমার সঙ্গে আর একজন ছিল, সে দিব্যি নেমে গেল।

—গুজরাটে কোন্ জায়গায় মহারাজ?

মহারাজ : Deep forest-এর ভেতরে। তুলসীশ্যাম বলে একটা জায়গা আছে। আর এছাড়া রাজগীরে hot spring আছে। তা সেখানে hot spring-এ স্নান করা যায়। একটা কুণ্ড আছে; সেখানে সকলে স্নান করে।

॥ ১১৬ ॥

প্রশ্ন : হরি মহারাজকে আপনি কোথায় দেখেছেন, মহারাজ?

মহারাজ : বলরাম মন্দিরে আর মঠে।

—কাশীতে বা কনখলে—

মহারাজ : কাশীতে মনে হয় দেখেছি, ভাল মনে পড়ে না। কারণ আমি যখন প্রথমবার বৈরাগ্য করে যাচ্ছিলাম, তখন উনি কাশীতে। তা, বৈরাগ্য করে সেবার কাশী পর্যন্ত যাওয়া হয়নি।

—সেবারে কাশীতে যাননি আপনি?

মহারাজ : কাশীতে যাবার জন্য বেরিয়েছিলাম। পথে দুর্ভোগ ভোগ করে ফিরে এসেছি।

—তাহলে বলরাম মন্দিরেই মনে হয় প্রথম দেখেছেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, বলরাম মন্দিরে প্রথম দেখেছি।

—কিরকম দেখেছেন মহারাজ, মনে পড়ে?

মহারাজ : খুব ফরসা।

—সোজা হয়ে বসতেন?

মহারাজ : একেবারে bold upright। আর উনি বলতেন, 'আমি জীবনে কখনো ঠেস দিয়ে বসিনি।' দেহ যাবার সময়ও বলছেন, 'আমাকে বসিয়ে দাও।' বুঝতে পারছেন যে, প্রাণ উৎক্রমণ করছে। 'বসিয়ে দাও'—বলছেন।

—বলরাম মন্দিরে যখন দেখেছেন, কোন প্রসঙ্গ করতেন?

মহারাজ : প্রসঙ্গ খুব করতেন। কিন্তু জিজ্ঞেস করলে বলতে পারব না। একটা খালি মনে আছে যে, আমাদের একজনের ভর হতো। তা হরি মহারাজকে বলাতে বলছেন, ওটা একটা রোগ বিশেষ। তোমরা সাবধান—ওটাতে আবার কাউকে না ধরে!

—তপস্যার কথা বলতেন না?

মহারাজ : খুব বলতেন। আরেকটা কথা বলতেন, 'ব্রাহ্মণ-শরীর কেবল তপস্যার জন্য।' এটা জোর করে বলতেন। অন্য কথা একদম বলতেন না। শাস্ত্রকথা ছাড়া, সৎকথা ছাড়া—বাজে কথা বলতেন না।

—বাজে কথা বলতে রঙ্গরস করা—এইরকম?

মহারাজ : না না। অত্যন্ত গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন।

—ওঁর খালি গায়ে যে-ছবি দেখি ঐরকমই দেখেছিলেন? খালি গা সটান বসে আছেন।

মহারাজ : খালি গা কিনা আমার মনে পড়ে না। তবে ঐরকম বসা দেখেছি মনে পড়ে।

—মহারাজ, গুরুভাইদের সঙ্গেও হাসিঠাট্টা করতেন না?

মহারাজ : না। বেশি হাসিঠাট্টা ছিল না। No nonsense। আরেকটা ঘটনা তো জান—একদিন রাজা মহারাজ বলছেন, 'হরি মহারাজকে গিয়ে প্রণাম করতে ইচ্ছা করে।' তারপরে শরৎ মহারাজ ঐ কথা শুনে গিয়ে প্রণাম করেছেন। তা জিজ্ঞেস করেছেন—'কে?' কেউ বলেছে—'শরৎ মহারাজ।' তিনি বললেন—'ভাই, আমাকে অন্ধ দেখে আমার উপরে এরকম করলে? তোমরা এসে আমাকে প্রণাম করলে? এইরকম আমাকে অপ্রস্তুত করলে?'

—এইরকম বললেন!

মহারাজ : হ্যাঁ।

—তখন শরৎ মহারাজ কী বললেন?

মহারাজ : আর তাঁর কথা নেই! হরি মহারাজ বলেছিলেন, 'আমি কি আর তোমায় জানি না, সেই নীলকণ্ঠের কথা কি তোমার মনে নেই?'

—শেষের দিকে কি চোখে একেবারে দেখতে পেতেন না?

মহারাজ : হ্যাঁ, সেইসময় আর দেখতে পেতেন না।

—খুব ডায়াবেটিস ছিল।

মহারাজ : তবে তাঁকে প্রথম আমি যখন দেখেছি তখন দেখতে পেতেন।

—সারাজীবন তো খুব তপস্যা করেছেন। শরীরটা শেষে ভেঙে গিয়েছিল।

মহারাজ : তা তো হবেই। ডায়াবেটিস শেষ করে দিয়েছে।

—আমেরিকা থেকে ফিরে এসে তপস্যায় গেলেন; তার একটাই কারণ, 'স্বামীজী তো নেই, আর কী কাজ করব'—এইজন্যে?

মহারাজ : তার আগে কত তপস্যা করেছেন। স্বামীজীর শরীর গেল। তা উনি স্বামীজীকে দেখতে আসছিলেন। যখন পথে, তখন স্বামীজীর শরীর গেল। সেকথা শুনে আর মঠে এলেন না। ওখান থেকেই কনখল হয়ে তপস্যায় চলে গেলেন।

—যেরকম কঠোরতা করেছেন তিনি, ওরকম সাধারণে পারবে না।

মহারাজ : না।

—মহারাজ, গোড়ার দিকে স্বামীজীর কাজের ব্যাপারে ওঁর খুব আগ্রহ ছিল না। কিন্তু পরে খুব উৎসাহ দিতেন।

মহারাজ : না, না। ওঁর ইচ্ছা ছিল যে, তপস্যাতেই শরীরটা ত্যাগ করবেন। যত দিন বাঁচবেন, তপস্যা করবেন। স্বামীজী তাঁকে কাজে নামালেন। তা, কাজে নামলেন—আমেরিকায় শান্তি আশ্রমে ছিলেন, তপস্যায় ছিলেন। সেখানে অন্য বাজে কথা নেই।

—স্বামীজীর কাজে অপরকে খুব উৎসাহিত করতেন।

মহারাজ : উৎসাহিত করেছেন। আরেকটা ঘটনা হয়েছিল যে, হরি মহারাজের কাছে তাঁর বৈরাগ্যের কথা সব শুনে শুনে সাধুরা যারা ছিল, তারা এক এক জন এক এক দিকে তপস্যা করতে চলে গেল। তারপরে কেউ ওঁকে বলেছে, 'মহারাজ, আপনি তো এত ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলেন, ফলে সকলে তপস্যায় চলে গেল।' তা বলছেন, 'ব্যাটারা এই কথা বুঝল নাকি?' অর্থাৎ তিনি কাজ ছেড়ে তপস্যায় যাবার কথা বলেননি। ওটাকে ভুল বুঝেছে তারা।

—শেষের দিকে নাকি বলতেন, 'স্বামীজীর কাজ করিনি বলেই শরীরের এত কষ্ট।'

মহারাজ : তা বলতেন। তবে কাজ যে করেননি তা তো নয়। তাঁর যে কথাবার্তা, উপদেশ, চিঠিপত্র ও তপস্যা—সেটাই তো বড় কাজ।

—ঠিকই।

মহারাজ : ঠিকই শুধু না। যারা সঙ্গ করতে যেত তাদের সঙ্গে যে-কথা বলতেন সে তো তীব্র বৈরাগ্যের কথা।

—মহারাজ, আপনি একটা কি শুনেছিলেন এইরকম, একজন ব্রহ্মচারীকে তাঁর সেবক হিসাবে দিতে চেয়েছিলেন কল্যাণ মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ, হ্যাঁ। খুব। কনখল থেকে যাচ্ছেন, তপস্যা করতে যাবেন। তা আমাদের কল্যাণ স্বামী বললেন, 'একজনকে আপনার সেবার জন্যে সঙ্গে নিন।' তিনি বললেন, 'না। আমার সেবক দরকার নেই।' তারপর কল্যাণ মহারাজ বললেন, 'আপনি ঠান্ডায় যাচ্ছেন, আপনার ঠান্ডার উপযুক্ত কাপড়-চোপড় নেই। তা অন্তত একটা কোট নিন—এই কোটটা পরে যান।' তারপর অনেক আগ্রহ করাতে শেষকালে কোটটা নিয়েছিলেন। আর কল্যাণ মহারাজ কোটের ভেতরে দশটা টাকা রেখে দিয়েছিলেন। ঘরে গিয়ে কোটে হাত দিয়ে পকেটে টাকা দেখে টাকা আর কোট দুই-ই ফেরৎ দিয়ে দিলেন।

—এসব আমাদের কাছে এখন গল্প হয়ে গেছে।

মহারাজ : তীব্র বৈরাগ্য। গোড়া থেকে তীব্র বৈরাগ্য।

—মহারাজ, বাজে কথার কোন সুযোগ ছিল না তাঁর কাছে।

মহারাজ : না। আর exercise-ও দারুণ করতেন। দুই-শ ডন দিতেন। তা একজন বললে, 'মরে যাবে যে!' শরীর কসরতের প্রতিও এত

ঝোঁক ছিল। তীব্র একেবারে। হরি মহারাজের বেদান্তবিচারও খুব ছিল।

—এ দেশে বেদান্তচর্চা খুব করেছেন। আবার আমেরিকায় গিয়ে 'মা' 'মা'-ও করেছেন খুব।

মহারাজ : না, আমেরিকায় গিয়ে খালি ম্যা ম্যা করেছেন তা নয়। (হাসি) আমেরিকায় বেদান্তচর্চাও যথেষ্ট করেছেন।

—রূপান্তর ঘটেছিল। আর শেষের কথাটা মহারাজ বলেছিলেন, 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ সত্য'—এটা একটু বলুন মহারাজ।

মহারাজ : এটাকে তিনি যেভাবে বলেছিলেন, সে-ভাবটা তো আমরা আনতে পারব না। তবে তার অর্থ ব্যাখ্যা এরকম করব যে, জগৎ সত্য মানে জগৎ জগৎ-রূপে সত্য নয়, ব্রহ্ম-রূপে সত্য। যাকে জগৎ বলছি সে ব্রহ্মই। 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এতে এই তাৎপর্য মেলে।

॥ ১১৭ ॥

মহারাজ : অ— তোমার বয়স কত?

—৪০-এর ওপরে এখন।

মহারাজ : বল কী! অবাক করলে যে!

—৪৪ হয়ে গেছে। তা, এখনো যদি বলি যুবক, তাহলে তো মুশকিল।

মহারাজ : শোন, শোন। যুবকের পর্যায়ে এখনো আছ।

—আছি মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ। ৫০ পার হলে তখনই বলে প্রৌঢ়।

—প্রৌঢ় অবস্থাটা—সেটা কি ঐ বৃদ্ধের আগের অবস্থা?

মহারাজ : বার্ধক্যের আগের অবস্থা। একটা ছোট্ট মেয়েকে আমি বলতাম—তোমার বাবা বুড়ো। তা বলে—না, প্রৌঢ়। (হাসি) ও বাবা! বলে—না, আমার বাবা বুড়ো নয়, প্রৌঢ়।

-৫০ হলে পরে প্রৌঢ় অবস্থা হয়।

মহারাজ : হ্যাঁ, ৫০ হলে। 'পঞ্চাশ ঊর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ'—কিনা।

-তাহলে সে-অবস্থা এখনো হয়নি মহারাজ।

মহারাজ : তবে কারো কারো অকালপক্কতাও আছে। (সকলের হাসি)

-একেবারে সামনে দৃষ্টান্ত দিয়ে বলে দিলেন?

মহারাজ : তা কী করব? আচার্য হয়ে গেছ।

-অকালপক্কতাটা আচার্যের লক্ষণ।

মহারাজ : হুঁ। না পক্কতাই লক্ষণ। এখন তুমি অল্পবয়স সে-তুলনায়। অল্পবয়সে আচার্য। কাজেই তোমাকে অকালপক্ক বলা যায়।

-তা অবশ্য ঠিক। শব্দের অর্থ যেকেউ যেকোন ভাবে নিতে পারেন। মহারাজ, আপনি একটা কী গল্প বলেন, একজনকে জিজ্ঞেস করা হল—আপনার বয়স কত? সে বলেছিল : 'আমার বয়স ২৫-৩০।' যদিও তার বয়স তখন ৬০-৭০ বছর।

মহারাজ : ও। সে একজন চৌকিদার। থানার দারোগা এসেছে inspection করতে। তা যে inspection করছে, সে চৌকিদারকে বলছে, 'তোমার বয়স কত?' 'তা, বিশ-পঞ্চাশ হবে।' সে একেবারে লেখাপড়া জানে না। তা দারোগার সঙ্গে পরিচয়ে ও একেবারে ঘাবড়ে গেছে। তা বলছে, 'হুজুর বিশ-পঞ্চাশ হবে।'

-না, আপনি আরেকবার অন্য একজনের কথা বলেছিলেন, তিনি এক মেডিক্যাল কলেজের Principal ছিলেন।

মহারাজ : না। Principal না। মেডিক্যাল কলেজের এক Surgeon-এর গল্প। তার নামটা এখন ভুলে গেছি। তাকে জিজ্ঞাসা করেছে, ‘তোমার বয়স কত?’ বলল, ‘Twenty।’ অন্যজন বলল, ‘Are you making fun?’ ‘O no, no. Life begins at 40. So I am 20 now.’ আসল বয়স ৬০ বছর, তা বলছে, ‘আমার বয়স ২০।’

—তবে মহারাজ, রাজা মহারাজ যে-কথাটা বলেছেন, যা করবার ৩০-এর মধ্যেই করে নাও। এটার মানে কী?

মহারাজ : মানে, ৩০ বছরের ভেতর যৌবনের যে-আবেগ থাকে, ৩০-এর পরে আর সেটা থাকে না। ৩০ মানে মোটামুটি বলা হচ্ছে। একেবারে কড়ায় গণ্ডায় ৩০ নয়। একটা চলতি কথা আছে। লোকে বলে—বল, বুদ্ধি, ভরসা; চল্লিশ গেলেই ফরসা।

—যাক, আপনি একটু বাড়িয়ে দিলেন। একটু ভরসা পাওয়া গেল।

মহারাজ : আমি বাড়িয়ে দিইনি। কিংবদন্তি বাড়িয়েছে।

—মানে ব্যাপারটা হল মহারাজ, ৩০, ৪০—এইরকম একটা বয়স পর্যন্ত যৌবনের আবেগ থাকে।

মহারাজ : মহারাজ তাই বলছেন যে, ৩০ গেলেই শেষ। তার মানে সে-আবেগটা আর থাকে না।

—আবেগ মানে কি এই শরীর-মনের শক্তি?

মহারাজ : শুধু শরীর নয়, মনের শক্তিই আসল। অল্পবয়সেই কারো কারো অথর্বতা এসে যায়। তখন মনের আবেগটা যে কমে যায় তা নিশ্চিত। এইজন্যে মহারাজ বলতেন, যাকিছু করবার আগে আগে করে নাও।

—মানে এই ৩০-৪০-এর মধ্যে যে-আবেগটা থাকে, সেটাকে যদি কাজে লাগানো যায়, তবে আমাদের বয়স বাড়লেও মনের সেই আবেগটা

থাকবে। এইটা বলছেন? বয়সে আবেগের বেগ না থাকলেও আগের সাধনের ফলে মনটা শান্ত হয়ে যায়।

মহারাজ : অনেকের ক্ষেত্রে তার ফলে নয়, বয়সের ফলে।

—বয়সের ফলে?

মহারাজ : হুঁ। শান্ত—মানে উৎসাহশূন্য।

—আধ্যাত্মিক সাধনার ফলে মনটা ক্রমে ক্রমে যে শান্ত ও একাগ্র হয়, তা নয়।

মহারাজ : সে শান্ত মানে বিষয়ের দিকে আকর্ষণটা কমে যাওয়া।

—সেটা কি আধ্যাত্মিক সাধনার ফলেই হয়?

মহারাজ : আধ্যাত্মিক সাধনার ফলেও হয়, আবার বয়সের ধর্মেও হয়।

—বিষয়ের দিকে আকর্ষণটা?

মহারাজ : প্রবল আকর্ষণটা কমে যায়। প্রবল আকর্ষণ থাকে না।

॥ ১১৮ ॥

মহারাজ : মাথা চুলকালে কী হবে! ভাল কথা বার কর। বল, ভাল কথা বল।

—আপনাকে একটা খবর দিতে বলছে।

মহারাজ : কী খবর?

—West Indies-এ স্বামীজীর একটা মূর্তি ওখানকার অধিবাসীরা বসিয়েছে। সেটার উচ্চতা ১৫০ ফুট। এত বড় মূর্তি কোথাও আছে? স্বামীজীর মূর্তি—এত উঁচু?

মহারাজ : না, আর কোথাও নেই মনে হয়।

—Concrete-এর তৈরি। বাবা! কম কথা!

মহারাজ : একটা মূর্তি নয়, একটি মূর্তি। তা এই তো খবরটা শুনলাম। এখন আর কী প্রশ্ন আছে বল।

—প্রশ্ন আছে, মহারাজ।

মহারাজ : বল।

প্রশ্ন : স্বামীজী একজায়গায় বলছেন, "আমার গুরুদেব বলতেন—'হিন্দু, খ্রিস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম মানুষে মানুষে পরস্পর ভ্রাতৃভাবের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আগে আমাদিগকে ঐগুলি ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করতে হবে।'" এখন প্রশ্ন—ভেঙে ফেলবার চেষ্টা মানে কী?

মহারাজ : মানে এই যে, Sectarianism থাকবে না। Sectarianism-এ যত গোলমাল।

—হিন্দু, খ্রিস্টান প্রভৃতি নাম ভেঙে ফেলার অর্থ, সেটা কি একটা ধর্ম হয়ে যাবে সব মিলে?

মহারাজ : Sectarian Religion থাকবে না। Sectarian Religion যত গোলমাল সৃষ্টি করে।

—না। হিন্দু, খ্রিস্টান প্রভৃতি নাম—এইগুলি ভেঙে ফেলা তো—

মহারাজ : তাতে হিন্দু, খ্রিস্টান—এটা ভেঙে ফেলা হল না। শুধু নামগুলো ভেঙে ফেলা হল।

—প্রতিটি ধর্মের তো এক একটা বৈশিষ্ট্য আলাদা আছেই।

মহারাজ : তা থাকবে। তাতে কিছু ক্ষতি, তা নয়। কিন্তু আমি খ্রিস্টান ও হিন্দু—এই যে পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি—এ থেকেই যত গোলমাল।

—পার্থক্য থাকলেই তো পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি আসছে।

মহারাজ : সাম্প্রদায়িকতা তো ভাল নয়। মৌলবাদ তো মানুষের তৈরি। স্বভাবটা মানুষের তৈরি না হতে পারে, কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা মানুষের তৈরি তো এবং তা পরস্পরের ভেতর একটা শত্রুতার ভাব আনে।

মহারাজ, এদের প্রত্যেকের ধর্মেরই কিছু কিছু নিজস্ব rituals রয়েছে। প্রত্যেক ধর্মেরই—খ্রিস্ট, ইসলাম বা হিন্দুদের।

মহারাজ : কী বলছ, আবার বল—

মহারাজ, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রিস্টানদের—ব্যাবহারিক জগতে কিছু কিছু বিশেষ বিশেষ rituals রয়েছে, যেগুলো পরস্পরবিরোধী।

মহারাজ : না, না। নিজের ধর্ম সকলের থাকবে। আমি একটা individual। আমি এটাকে মানি, ও ওটাকে মানে। তার দ্বারা পরস্পরের মধ্যে একটা sect করে আলাদা আলাদা হয়ে যাওয়ার কী দরকার?

—না, আমি বলছি মহারাজ, তত্ত্বের দিক দিয়ে ঠিক আছে। পরস্পরের ধর্ম একই জিনিসে সত্তাবান, কিন্তু practical দিক দিয়ে—

মহারাজ : Practical মানে যা তৈরি করেছি, তাই তো? তাছাড়া, practical মানে কী?

—Practical মানে ধর্মকে ব্যক্তিগত জীবনে আচরণ করা।

মহারাজ : না, না। জীবনে আচরণ করুক না—তাতে কী হয়েছে?

—সেই আচরণের ক্ষেত্রে মহারাজ, কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে—বিচিত্র সব rituals রয়েছে।

মহারাজ : এই যে আচরণের ভেদ, এই আচরণের ভেদকে পরস্পরে মেনে নিলেই তো হল। তাতে শত্রুতা হয় না।

—কিন্তু এদের মধ্যে তো পরস্পরবিরোধী ভাব রয়েছে।

মহারাজ : আবার বিরোধী ভাব! বিরোধী ভাব কেন হবে? বিভিন্নতা রয়েছে। বিভিন্নতা হলেই বিরোধী ভাব হবে—এমন কোন কথা নেই।

—মুসলিম এবং হিন্দুদের ধর্ম-আচরণের ক্ষেত্রে—প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিরোধী ভাব রয়েছে।

মহারাজ : বিরোধী ভাব না। ভিন্নতা আছে। আবার হিন্দু মুসলমান ভ্রাতৃভাব—তারও তো কিছু দৃষ্টান্ত আছে। সেখানেও তো দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

—যেমন আমরা লক্ষ করি, ঠাকুর যখন ইসলামধর্ম সাধন করছেন, তখন তিনি হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি-টুর্তি সব ঘর থেকে সরিয়ে দিলেন।

মহারাজ : তা দিলেন। তাতে কী হয়েছে?

—ঠাকুরের কয়েক দিনের সাধনাতে যদি এইরকম হয়—তার মানে ওদের ধর্মটা হিন্দু দেবদেবীকে সহ্য করতে পারে না, এটা তো তারই প্রমাণ।

মহারাজ : না, না। সরিয়ে দিলেন মানেই যে বিরোধিতা—তা তো নয়। ঠাকুরকে কি আমরা হিন্দু হয়েও ইসলামধর্ম সাধন করলেন বলে মারতে আরম্ভ করলাম?

—মারতে আরম্ভ করিনি। কিন্তু—

মহারাজ : হিন্দু আচরণ থেকে ইসলাম আচরণের পার্থক্য হল। আচরণের পার্থক্যে তো মানুষের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা হওয়ার কথা নয়। শত্রুতা হয় আচরণেতে সহিষ্ণু না হলে।

—তা ঠাকুর দেবদেবীর মূর্তি রেখে ইসলাম সাধন করলে বুঝতাম সহিষ্ণুতা আছে।

মহারাজ : ঠাকুর তো অসহিষ্ণু হননি।

—সে আমরা কী করে বুঝব, মহারাজ?

মহারাজ : তাঁর কথা থেকে বুঝব।

—কথা থেকে। কিন্তু যখন তিনি 'যত মত তত পথ' বলছেন, তখন সব সাধন করে বলছেন। কিন্তু যখন ইসলাম সাধন করছেন, তখন এটা কি বলছেন? ইসলাম সাধনের সময়, অন্য ধর্মও যে সত্য তা কি বলছেন?

মহারাজ : না, না। একটা পথ। এই হল তাঁর কথা। ঐ একটা পথ, এই একটা পথ। পথগুলি ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু পরস্পরের বিদ্বেষ তার দ্বারা হওয়ার কথা না।

—ঐটুকুর ক্ষেত্রে আমার যেন মনে হচ্ছে, বিদ্বেষ ভাব রয়েছে। দেবদেবীর মূর্তি সরানোর কী দরকার? তিনিই যখন সহ্য করতে পারছিলেন না, আর সাধারণ মুসলমানরা পারবে?

মহারাজ : সহ্য করতে পারতেন কিনা, সে-প্রশ্ন নয়। সাধনার যে-ধারাটা—সেটা করেছেন।

—তা, সেইটাই তো আমরা বলছি যে, ধারার মধ্যে পরস্পরবিরোধী ভাব রয়েছে।

মহারাজ : আবার বিরোধী ভাব! বিরোধটা বলছ কেন? ভিন্নতা বল না।

—হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্তি রেখেই যদি কেউ ইসলাম সাধন করেন, তখন বুঝব যে, বিরোধী ভাব থাকা সত্ত্বেও সে সেটাকে গ্রহণ করে।

মহারাজ : ভিন্নতা আছে। কিন্তু বিরোধ থাকতেই হবে, এমন কোন কথা নেই।

—মহারাজ, বিরোধ রয়েছে। ওদের মধ্যে রয়েছে যে, বিরোধী যারা—বিধর্মীদের সহ্য করতে না পারাটা যেন ধর্মের একটা অঙ্গ।

মহারাজ : হিন্দু বা মুসলমানরা একে অপরকে সহ্য করতে পারে না—ঐটাই কি তাদের ধর্ম হল?

—না, মহারাজ। এটা তারা ধর্মের অঙ্গ হিসেবে পালন করে, ritual-এর মতো।

মহারাজ : আবার আমরা এও দেখেছি, পরস্পরের প্রতি প্রেমপূর্ণ। হিন্দু-মুসলমান নিজেদের ধর্মে থেকেই।

—সেটার ভিত্তি কী হতে পারে মহারাজ?

মহারাজ : ভিত্তি—মানুষের পরস্পরের প্রতি সম্মান।

—সে তো সমাজ-সংস্কারক, রাজনীতিবিদরাও বলে। আমাদের ধর্মের দিক থেকে সেটা আর বিশেষ কী?

মহারাজ : আবার ধর্ম কিছু আলাদা নাকি? মানুষ আর ধর্ম আলাদা হল? ধর্মে ভিন্নতা আছে। কিন্তু বিরোধ তাকে অনুসরণ করে না। ভিন্নতাকে অস্বীকার করছি না। ভিন্নতা থেকেও তো পরস্পরের মিত্রতা হতে পারে।

—মহারাজ, নিজেদের ভাব প্রকাশের অনুকূল পরিবেশ গঠন করার চেষ্টা তো প্রত্যেক ধর্মের মানুষের মধ্যেই রয়েছে।

মহারাজ : তা রয়েছে। তাই sect থাকুক। Sectarianism না থাকে। Sect থাকলে দোষ হবে না। Sectarianism থাকা ঠিক না। এটাই বোঝ। Sect আর Sectarianism দুটো এক নয়। ঠাকুর যখন মুসলমান ধর্ম সাধন করেছেন, তখন কি হিন্দুদের গালাগাল দিয়েছেন?

—গালাগাল দেননি; কিন্তু ওরা যা করে, সাধারণ মুসলমানরা, তা-ই যেন তিনি করেছেন।

মহারাজ : তাদের যে-ধারা সেটা অনুসরণ করছেন। কিন্তু তার দ্বারা তাদের ধিক্কার দিচ্ছেন না বা হিন্দুদের নিন্দা করছেন না।

—সময় হয়ে গেছে মহারাজ।

মহারাজ : যাক। সরে পড় তাড়াতাড়ি।

॥ ১১৯ ॥

মহারাজ : কাগজখানা বেরচ্ছে! (সকলের হাসি) বেরচ্ছে কাগজখানা! বল বল।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, ‘মুক্ত হতে গেলে প্রথমে পাপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তারপর পুণ্য অর্জন করতে হয়। শেষে পাপ-পুণ্য দুই-ই ত্যাগ করতে হবে। প্রথমে রজঃ দ্বারা তমোকে জয় করতে হবে। পরে উভয়কেই সত্ত্বগুণে লয় করতে হবে। সর্বশেষে এই তিনগুণকেই অতিক্রম করতে হবে।’ এটা ঠিক আছে। কিন্তু মুক্ত হতে গেলে প্রথমে পাপের মধ্য দিয়ে যেতে হয়—এটা কিরকম কথা?

মহারাজ : পাপ অর্জন করে নয়, পাপ এমনই স্বাভাবিক বলে।

—পাপ স্বাভাবিক?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—কিরকম মহারাজ, পাপ কিভাবে স্বাভাবিক?

মহারাজ : তমোগুণ তো জড়। তার ভেতর দিয়ে যেতে হবে রজোগুণে। রজোগুণের পরে সত্ত্বগুণ।

—তমোগুণ কি পাপ?

মহারাজ : তমোগুণই পাপ বলছে। পাপ, পুণ্য আর তার অতীত। এখানে এই অর্থে বুঝতে হবে।

—আমাদের মধ্যে যে তমোগুণ রয়েছে, সেটাকে অতিক্রম করতে হবে। সেটাই উনি বলেছেন পাপের মধ্য দিয়ে যেতে হবে?

মহারাজ : হুঁ।

—এক পৃষ্ঠা লিখে দিয়েছেন একজন।

মহারাজ : তার উল্টো পিঠটা পড়। (সকলের হাসি)

—এটার থেকে একটু পড়ছি আগে। মহারাজ, লাটু মহারাজকে একদিন একজন প্রশ্ন করছেন যে, মহারাজ—আপনি তো বলেন শক্তির শেষ নেই, সাধনার অন্ত নেই, অনুভূতির শেষ নেই, আত্মার ইতি নেই। তবে

শাস্ত্রে যে মুক্তির কথা আছে, সেটা কী? তার যে-উত্তর মহারাজ দিয়েছেন, সেটা অনেকটা। তা থেকে একটু পড়ে শোনাচ্ছি। লাটু মহারাজ বলছেন, 'আপনারা মুক্তির মানে বোঝেন—ছাড়া পাওয়া। বাকি, সাধন-পথে মুক্তি মানে ছাড়া পাওয়া নয়, মিশে যাওয়া।' এইটুকু একটু বুঝিয়ে বলুন। তারপরে অন্যটুকু।

মহারাজ : ছাড়া পাওয়া মানে অজ্ঞানের হাত থেকে মুক্তি। মুক্তি তা নয়। মুক্তি মানে মিশে যাওয়া বলছেন। তত্ত্বেতে লীন হয়ে যাওয়া।

—বন্ধন থেকে ছাড়া পাওয়া—এটা তো আমরা মুক্তির মানে বুঝি।

মহারাজ : সেইজন্যেই তো বলছেন, 'আমরা বুঝি'। তোমরা এই বোঝ, কিন্তু এটা তা নয়।

—'নদীর জল যেমন সাগরের জলে মিশে যায়, তেমনই সাধকের ভেতর যে-আত্মা আছেন তা পরমাত্মার সাগরে মিশে যায়।'

মহারাজ : হ্যাঁ। তারপর?

—'বাকি, হারিয়ে গেলে কি সাধনার শেষ হয়ে যায়? ভগবানের লীলার এমনই ব্যাপার যে, হারিয়ে গিয়েও নিস্তার নেই। তখন আবার খুঁজে পাবার সাধনা করতে হয়।' এইটা—এই খুঁজে পাওয়ার সাধনা আবার কী? মুক্ত হওয়ার পরে, মহারাজ, এইটা বোঝা দরকার।

মহারাজ : খুঁজে পাওয়া মানে জীবত্ব। জীবত্ব।

—না, মুক্ত হয়ে গেলে আবার জীবত্ব কেন মহারাজ?

মহারাজ : জীবত্ব—ভগবান লীলা করেন না? জীব হয়ে লীলা করেন। এই।

—আচ্ছা। আবার বলছেন, 'এই যেমন নদীর জল সাগরে মিশলে তার কর্মচক্র শেষ হয় না, আবার তাকে মেঘ হয়ে আকাশে উড়ে যাবার কাজে

লাগতে হয়—তেমনই সাধনার মজা এমনই যে, একবার সাধককে খুঁজে পাওয়ার সাধনা করতে হয়, আর একবার তাকে হারিয়ে যাবার সাধনা করতে হয়। তাই সাধনার শেষ কোথাও নেই জানবে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার।'

মহারাজ : মানে ভগবানের নির্বিশেষ আর বিশেষ রূপ। এই জগৎটা, সৃষ্টিটা তার বিশেষ রূপ। একবার নির্বিশেষ হলেন, আবার বিশেষ হতে হয়।

—এটা ভগবানের ক্ষেত্রে।

মহারাজ : ভগবানের ক্ষেত্রে বৈকি!

—কিন্তু সাধকের নয়?

মহারাজ : যে ভগবানের ক্ষেত্রে দেখছে, সে সাধক।

—সাধকের ক্ষেত্রে একবার মিশে গেলে আবার আসা বা খুঁজে পাওয়া ব্যাপারটা থাকে?

মহারাজ : সাধক যে ভগবানেতে মিশে গেল, তারপরে আবার ভগবান্ যখন লীলা করছেন, তখন সাধক কি নেই?

—হ্যাঁ আছেন।

—যে-সাধক মুক্ত হয়ে গেছেন, তিনি আছেন কী করে?

মহারাজ : সাধক বলতে অংশ। অংশ যে পূর্ণতে লয় হয়ে গেল। আবার পূর্ণ থেকে অংশ হয়ে তার লীলা আরম্ভ হল।

—তাহলে মুক্তিটা কী? তাহলে মুক্তি কোথায়?

মহারাজ : মুক্তি মানে যে সাধনা করছে তার মুক্তি। তার মিশে যাওয়াটাই মুক্তি।

—তাহলে আবার খুঁজে পাওয়ার সাধনায় লাগতে হয় যেটা বলছেন—সেটা সাধকের ক্ষেত্রে নয়?

মহারাজ : তার মানে ভগবান আবার লীলা করবেন।

—ঠাকুর যে-কথা বললেন, একবার জ্ঞান হল, সমাধি হল, তারপর আবার নেমে আসতে পারে কেউ কেউ—তাদের কথা বলছেন মহারাজ?

মহারাজ : না। তাদের কথা শুধু নয়, সাধকের কথা বলছেন। সাধক গিয়ে লীন হল ভগবানে। এখন ভগবান আবার যে লীলা করছেন তখন কি সেই সাধক থেকে আলাদা হচ্ছে না? তাই নয়? কিন্তু ভগবানই সাধকরূপে আসছেন আবার।

—কিন্তু ঠাকুর তো বলেছেন, জীবকোটি নেমে আসতে পারে না।

মহারাজ : আরে, ঈশ্বরকোটি নেমে আসতে পারেন মানে—যাঁদের ভগবানের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ, তাঁরা হলেন ঈশ্বরকোটি। ভগবানের সঙ্গে যাঁরা অঙ্গীভূত—তাঁরা ঈশ্বরকোটি। তাঁরা ভগবানের সঙ্গে নেমে আসেন।

—এটা ঈশ্বরকোটির কথা বলছেন।

মহারাজ : হ্যাঁ, ঈশ্বরকোটির কথা বলছেন। জীবকোটি যে সাধনা করল, করে ভগবানেতে মিশে গেল—তার আর সত্তা রইল না। যেমন বলেছেন,

> ‘যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রেঽ-
> স্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
> তথা বিদ্বান্নামরূপাদ্বিমুক্তঃ
> পরাৎ পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্॥
> (মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।২।৮)

—এইটা জীবকোটির মুক্তি?

মহারাজ : এই জীবকোটির মুক্তি।

—এরপরে বলছে যে, কিছু বলতে। মুক্তিতে পৌঁছে গেছে। আবার কী বলার আছে তারপরে?

মহারাজ : ভগবানেতে মিশে গেল তো? এখন ভগবান আবার লীলা করছেন, তখন তাতে মিশে গেছে যে—সে থাকবে না?

—তাঁর সঙ্গেই ছিল। হ্যাঁ, সেই দিক থেকে—

মহারাজ : হ্যাঙ্গাম আছে, হ্যাঁ।

—এটা তো অদ্ভুত যে, তাঁর সঙ্গে সব মিশে একাকার হয়ে গেলে আবার তিনি নেমে আসেন।

মহারাজ : তিনি নেমে আসেন। ঈশ্বর যখন লীলা করেন, তখন কী করবে?

—ঠাকুর যেমন বলছেন কলমীর দল—একটা টানলেই আরগুলো চলে আসে। সেইটা ঈশ্বরকোটিদের, মহারাজ? সেইটাই এঁদের সম্পর্কে বলছেন—কলমীর দল?

মহারাজ : কোটি-ফোটি বোঝা বড় কঠিন ব্যাপার।

—না, কলমীর দল বলেছেন।

মহারাজ : কোটি মানে একটা group। কোটি মানে দল। ঈশ্বরের দল। আর জীবের দল। জীবকোটি আর ঈশ্বরকোটি।

কলমীর দলের কথা বলেছেন ঠাকুর।

মহারাজ : তা বলেছেন।

এঁরা ঈশ্বরকোটি?

মহারাজ : মানে, ঈশ্বর যখন লীলা করতে আসেন তখন যে জীব ছিল সে তো ঈশ্বর হয়ে গিয়েছিল। মিশে গিয়েছিল। এখন যখন তিনি আসেন আবার, তখন সেটা কি তার আসাই হল না?

সেইটাই আমরা বলছিলাম।

মহারাজ : এই কথা। সে তো ঈশ্বরের সঙ্গো মিশে গিয়েছিল। কাজেই যখন আবার ঈশ্বর নেমে এসে লীলা করছেন, তখন তারও সেই সঙ্গো আসা হচ্ছে না কি? আসল কথা, ব্যক্তি হিসাবে হচ্ছে না। কিন্তু ঈশ্বরীয় সত্তা হিসাবে হচ্ছে।

॥ ১২০ ॥

মহারাজ : অত দূরে দাঁড়িয়ে কেন? জান শাস্ত্র কী বলে? শিঙ আছে যার তার থেকে দশ হাত, ঘোড়া থেকে একশো হাত, হাতি থেকে সহস্র হাত দূরে থাকবে, আর যেখানে দুর্জন আছে সে-স্থান ত্যাগ করবে।

—মহারাজ, আপনি আমাকে দুর্জন করে দিলেন? ওরা তো খ্যাপাবে আমাকে।

মহারাজ : না, দুর্জন নয়। 'হস্তি হস্ত সহস্রেণ।'

—শ্লোকটা কী? আবার একটু বলুন মহারাজ।

মহারাজ : শৃঙ্গীনাৎ দশ হস্তেন শতহস্তেন বাজিন
হস্তি হস্ত সহস্রেণ স্থান ত্যাগেন দুর্জনাৎ।

যাই হোক, কাগজখানা?

—মহারাজ, উনি একটু বলবেন।

মহারাজ : বল—

প্রশ্ন : মহারাজ, পাপ আর পুণ্যের কথা হচ্ছিল কালকে। পাপ-পুণ্যের প্রকৃত অর্থ কী?

মহারাজ : পাপ আর পুণ্য? পাপ মানে যাতে দুঃখদায়ক ফল হয়। পুণ্য—যাতে সুখদায়ক ফল হয়। এই পাপ আর পুণ্যের সাধারণ লক্ষণ।

—মহারাজ, পাপ ও পুণ্য দুটোই আমাদের বন্ধ করে বলা হয়।

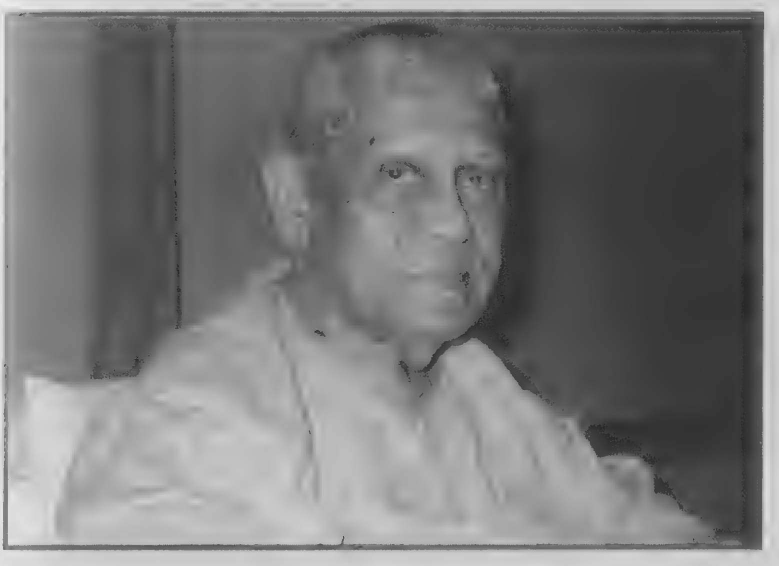

মহারাজ : হ্যাঁ, দুটোই।

পাপ তো বন্ধ করে বোঝা যায়। কিন্তু পুণ্য কিভাবে বন্ধ করে?

মহারাজ : পুণ্য তো ভোগাকাঙ্ক্ষা থেকে করা হয়। ভোগাকাঙ্ক্ষা থাকে বলে পুণ্য করি। কই, আর কেউ কিছু বল। এত সাধু-ব্রহ্মচারী—অথচ speak-টি not! speak-টি not মানে জান তো?

—বলুন মহারাজ।

মহারাজ : কথাটি বলে না।

—মহারাজ, না জেনে যদি কেউ পাপ করে ফেলে তাহলে সেটা কী হবে?

মহারাজ : তাতে তার পাপ হবে না। না জেনে করলে তাতে পাপ হবে না।

—কিন্তু কর্মটার ফল হবে না? পাপ তো একটা কর্ম। কর্মের তো ফল আছেই বলা হয়।

মহারাজ : তা আছে। না জেনে যদি খুন করে, হুঁ? না জেনে ফাঁসি হবে! (সকলের হাসি)

—এত গূঢ় অর্থ! আপনার ভেতরে যে এত আছে, তা আমরা বুঝব কী করে?

মহারাজ : তবে একটা কথা আছে, পুরাণের কথা। খুব কম বয়সের বাচ্চাদের পাপ-পুণ্য হয় না।

—ও আচ্ছা। বয়সের দিক দিয়ে?

মহারাজ : হ্যাঁ, বয়সের দিক দিয়ে।

—সেটা কত?

মহারাজ : পাঁচ বৎসর না কত।

—পাঁচ বৎসর।

—শিশুদের এইজন্য ভগবান বলে?

মহারাজ : ভগবান কেউ বলে না।

—ভগবানের মতো।

মহারাজ : ভগবান অত বোকা হয় নাকি? (সকলের হাসি) শিশুদের বলে অজ্ঞান। ওদের জ্ঞান হয়নি এখনো। তা ভগবানেরও জ্ঞান হয়েছে কিনা সন্দেহ! (সকলের হাসি)

—ভগবানের কি জ্ঞানের দরকার আছে?

মহারাজ : জ্ঞান যদি না হয় তো সৃষ্টি করবেন কী করে?

—এমনি কি সৃষ্টি হয়?

মহারাজ : সৃষ্টি মানে বলা হচ্ছে 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।' (মহানারায়ণপোনিষদ্, ১।৬২) সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতিকে বিধাতা আগের কল্পের মতো সৃষ্টি করেন। তাই সেখানে আগের কল্পের জ্ঞান তো থাকা চাই।

—তাহলে লীলাটা যে বলা হচ্ছে, সেটা আগের কল্পের মতো?

মহারাজ : কল্পে কল্পে ভগবান লীলা করছেন তো।

—একই কিনা? আগেরটার মতো যে বলছেন।

মহারাজ : আগেকার মতো—এই বিশ্বসৃষ্টি আগেকার মতো বলছেন। আর তিনি আগেকার মতো দুষ্টুমি করবেন কিনা, সেকথা বলছেন না।

—কিন্তু এই দুষ্টুমি করা বা ভাল কাজ করা—সেটা তো জ্ঞান বা অজ্ঞানের জন্যই।

মহারাজ : ভগবান কি দুষ্টুমি করবেন? দুষ্টুমি করতে হলে তাঁকে ধূর্ত হতে হবে তো। ধূর্ত না হলে দুষ্টুমি করবেন কিভাবে?

—তাই। সেই ধূর্তামি নিয়েই আবার যদি করে, যে-জন্মে করবে সেখানেই সেটা তো শেষ হয়ে গেল। তা যদি না হয়, তাহলে মুক্ত হল কী করে? জীবের কথা বলছি। জীব যতটা এগিয়ে থাকল আগের জন্মে—পরে আবার নতুন করে সে শুরু করছে সেখান থেকে। তাহলে যাদের সেখানে মুক্তি হয়নি, সেই—

মহারাজ : কর্মের শেষ নেই, শেষ হয় না। তার রেশ চলে। জ্ঞান হলে কর্মের নাশ হয়।

—জ্ঞানেই শুধু নাশ হয়?

মহারাজ : হুঁ।

॥ ১২১ ॥

মহারাজ : ও কী বলছে?

—বলছিলাম, ঘড়িটা যে কখন ঘুরে গেল খেয়াল করতে পারিনি! পড়ছিলাম, পড়তে পড়তে দেখি ৭টা ৩৫ হয়ে গেছে। সময় পেরিয়ে গেছে। তাই ছুটে এলাম আর কী।

মহারাজ : ও, যদি হোঁচট খেতে?

—হোঁচট খাইনি মহারাজ। প্রবুদ্ধ ভারত-এ একটা খবর পড়ছিলাম। দার্জিলিঙ-এ ওখানকার ভক্তরা—আমাদের এখান থেকে সাধুরাও গিয়েছিলেন—সেখানে স্বামীজীর ভারত-প্রত্যাবর্তন এবং রামকৃষ্ণ মিশনের শতবর্ষ উৎসব—এগুলো সব পালাক্রমে পালন করেছে। ছবিও দিয়েছে অনেক। তা দেখতে দেখতে হঠাৎ করে দেখি সময় পেরিয়ে গেছে। আমি ভাবছি, কী করে সময় গেল! দার্জিলিঙ-এ নাকি স্বামীজী ৯৫ দিন ছিলেন। আবার নিবেদিতাও ছিলেন। ওখানেই নিবেদিতার শরীর যায়।

মহারাজ : হ্যাঁ, নিবেদিতার শরীর যায় ওখানে।

—তাঁরা ওখানে ছিলেন তো বেশ কিছু দিন। সেজন্য বলছে, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি দার্জিলিঙ-এর অনেক অবদান আছে।

মহারাজ : নিবেদিতার দেহ যাওয়াটা অবদান নাকি?

—তা নয়। ওঁরা তো ঐখানে গিয়ে বাস করেছেন।

মহারাজ : এটা অবদান হল?

—ওঁরা ওখানে বাস করেছেন এবং সেখানে যা চিন্তা-ভাবনা করেছেন—

মহারাজ : তুমি যে এই মঠে খাচ্ছ, তা কি অবদান হচ্ছে? (সকলের হাসি)

—স্বামীজী বা নিবেদিতা ওখানে বাস করেছেন মানেই হল তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, তাঁদের জীবন ওখানে ব্যয়িত হয়েছে; সেই জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁদের যে-অবদানটা, সেখান থেকে তো গৃহীত।

মহারাজ : অবদান কথাটা মাঝখানে খাপ খাচ্ছে না।

—স্বামীজী দার্জিলিঙ থেকে নেমে এসেই রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করলেন এবং এর আগে কথাবার্তা বলছিলেন ঐ দার্জিলিঙ-এ।

মহারাজ : তা অবদানটা তাঁর দার্জিলিঙ-এ হল, না, এখানটায় হল?

—না, তা নয়। দার্জিলিঙ কথাটা দিয়ে—একথাটা বলতে চাচ্ছি যে, স্বামীজীর দার্জিলিঙ-এ যে বাস, অবস্থান—সেইটাই আর কী।

মহারাজ : অবদান নয়, অবস্থান।

—হ্যাঁ। দার্জিলিঙ-এ যে তাঁর অবস্থান।

মহারাজ : তাহলে মিলে গেল।

—ঐভাবেই তো আমরা বলছি। দার্জিলিঙ-এর অবদান বা স্বামীজীর জীবনে খেতড়ির অবদান তো ঐভাবেই নিতে হবে।

মহারাজ : খেতড়িতে অবস্থানও করেছেন, অবদানও রেখেছেন—দুইই আছে।

—সেইভাবে বলছেন যে, দার্জিলিঙ-এর মানুষদের—তাদেরও একটা গর্ব আছে যে, স্বামীজী এখানে এসেছেন এবং এখানে বাস করে গেছেন। আমাদের জীবনে অনেক কিছু দিয়ে গেছেন।

প্রশ্ন : মহারাজ, একবার একজন ব্রহ্মচারীকে অলপী মহারাজ খুব বকে দেওয়ার পর অলপী মহারাজকে আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন—বকাটা একটু বেশি হয়ে গেল না?

মহারাজ : হ্যাঁ, একবার অলপী একজন ব্রহ্মচারীকে খুব বকেছে। তারপর বকা হয়ে গেলে সে চলে গেছে। তারপর আমি বললাম, অলপী তোমার মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গেছে। (সকলের হাসি) তখন অলপীর অনুতাপ হল। তখন আবার তাকে ডেকে এনে বলল, মহারাজ আমাকে বকেছেন—তোমাকে বকেছি বলে। তুমি কিছু মনে করো না।

—মহারাজ, এই যে আপনার অনুভবটা হল এটা কিসের ওপর নির্ভর করে? অলপী মহারাজকে যে বললেন, বকার মাত্রাটা একটু বেশি হয়ে গেছে—এই ভাবনাটা কেন হয়েছে, জিজ্ঞাসা করছি।

মহারাজ : কেন হল? ধর আমাকে যদি কেউ বকত, তাহলে মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তখন আমারও তো দুঃখ হতো।

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ।। (গীতা, ৬।৩২)

আমার নিজের ক্ষেত্রে ঘটলে যেটা হতো সেটা ওর হয়েছে বলে মনে করলাম। তাই বললাম।

—মহারাজ, আমরা যখন অন্যকে বকি তখন কি এটা মনে করা সম্ভব?

মহারাজ : তোমার কথাটা বুঝতে পারলাম না। একটু বুঝিয়ে বল তো।

—ঐ ঘটনায় আপনার একটা অনুভব হল যে, বকার মাত্রাটা বেশি হয়ে যাচ্ছে। কেউ যদি কাউকে বকে, বকার পরে ঐ ভাবনাটা তার ভেতর আসা উচিত কিনা?

মহারাজ : একেবারে বিটকেল মানুষ যদি না হয় তাহলে তার মনে অনুতাপ হওয়ার কথা। যাহোক, আমাদের ভেতরে মাঝে মাঝে ভাল কথাও হয়। (সকলের হাসি)

—বেশির ভাগই ভাল কথা হয়। রাজা মহারাজ বলেছিলেন—

—উ—মহারাজ খেয়েছিল বকা।

মহারাজ : কে?

—এই যে উ—মহারাজ।

মহারাজ : অলপী মহারাজের কাছে? বকা খেয়েছিল? তা খেতে কেমন লাগল? (সকলের হাসি)

—বলছেন সুন্দর—এখনো ঢেঁকুর উঠছে।

মহারাজ : গম্ভীর মহারাজ আমাকে বলছেন একদিন—দেখুন কাউকে যদি বকতে হয়, আপনি পারবেন না। আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। আর কাউকে যদি মিষ্টি করে বোঝাতে হয়, আমি পারব না। আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। (মহারাজের হাসি)

—ঠিকই বলেছেন মহারাজ।

॥ ১২২ ॥

প্রশ্ন : ঠাকুর বলছেন যে, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার। আবার সাকার-নিরাকারের পার। আর একজায়গায় বলেছেন, ব্রহ্ম কী তা মুখে বলা যায় না।

মহারাজ : ব্রহ্মের স্বরূপ মুখে বলা যায় না। কথাটা হল, ব্রহ্ম কী বস্তু তা মুখে বলা যায় না।

তাহলে এই যে সাকার বলা হচ্ছে, নিরাকার বলা হচ্ছে—এর দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ বলা হচ্ছে না?

মহারাজ : না। সাকার নিরাকার—এগুলো কি ব্রহ্মের স্বরূপ?

—ব্রহ্মের রূপের কথা বলা হচ্ছে। আবার ব্রহ্ম অরূপ—তা-ও বলা হচ্ছে।

মহারাজ : রূপ আছে—কে বলেছে?

—শাস্ত্রেই বলা হয়েছে। বেদের বাক্যতেই তো আছে।

মহারাজ : বেদে কি বলা হয়েছে, ব্রহ্মের রূপ আছে?

—হ্যাঁ। তিনি চতুষ্পাদ। সেখানে পুরুষের বর্ণনা করা হচ্ছে। চতুষ্পাদ।

মহারাজ : চতুষ্পাদ মানে কী?

—মহারাজ, এরকম তো অনেক বর্ণনা আছে। তাঁর রূপের বর্ণনা আছে।

মহারাজ : চতুষ্পাদ মানে চার পা-ওয়ালা? (সকলের হাসি)

—আমাদের সেটা বক্তব্য নয়। আমাদের জিজ্ঞাসা হল যে, একজায়গায় রূপের বর্ণনা করা হচ্ছে, আর একজায়গায় বলছে, তিনি অরূপম্—রূপ নেই।

মহারাজ : যা মুখে বলা হয় তা ব্রহ্ম নয়—'নেদং যদিদং উপাসতে'। ব্রহ্মের স্বরূপ নির্ণয় নেতি দিয়ে, তিনি কী নন—সেরকম কথা দিয়ে বলার চেষ্টা হয়। নেতি নেতি—'অস্থূলম্, অনণু, অহ্রস্বম্, অদীর্ঘম্, অলোহিতম্, অস্নেহম্, অচ্ছায়ম্....' (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৩।৮।৮)। এইভাবে তাঁকে 'না', 'না' বলে বলা হয়। ব্রহ্ম 'এই নয় এই নয়' বলা যায়। কিন্তু ব্রহ্ম 'এই'—একথা বলা যায় না।

—আমরা দেখি শাস্ত্রের যে-বাক্য, তার মধ্যে থেকেই ভিন্ন ভিন্ন ধারায় বিচার হচ্ছে। একজন বলছেন যে, না, তিনি সাকার। আরেকজন বলছেন, না, তিনি নিরাকার। সকলেই তো শাস্ত্রবাক্যকে উদ্ধৃতি করে বিচার করছেন।

মহারাজ : সকলে মানে, কারা তারা?

—শঙ্করাচার্য বলছেন, ব্রহ্ম হচ্ছেন অরূপ—তাঁর রূপ নেই। আর রূপের কথা যা বলা হচ্ছে, তা ভ্রান্ত। তিনি যে বিচার করছেন, সে তো শাস্ত্র-বাক্যকে ধরেই বিচার করছেন।

মহারাজ : আসল কথা হচ্ছে কী, শব্দ দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে হবে না। তোমাদের যুক্তি দিয়ে শব্দের অর্থ ঠিক করতে হবে। বাস্তবে যে-জিনিস সাকার, হয়তো তা নিরাকার নয়। মাস্টারমশায় বলছেন, যে নিরাকার হয়েছে সে সাকার হতে পারে না। এ তো যুক্তি দিয়ে বোঝা যায়। তাহলে ঠাকুর যখন বলছেন, তিনি সাকার এবং নিরাকারও, তখন কী অর্থে বলছেন সেটা বিচার করে দেখতে হবে। আর কথা হচ্ছে, এগুলি তাঁর উপাধি। তাঁর স্বরূপ মুখে বলা যায় না। কিন্তু তাঁর উপাধিগুলো বলা হচ্ছে। যা বলা হচ্ছে, তা উপাধি।

—হ্যাঁ, এগুলো উপাধি। আবার ঠাকুর একটা উপমায় বলছেন যে, সাপ যখন স্থির হয়ে আছে, তখনো যে সাপ, আবার যখন চলে ফিরে বেড়াচ্ছে, তখনো সে-ই সাপ।

মহারাজ : তা ব্রহ্ম কি পরিবর্তনশীল?

—এইটাই আমাদের বক্তব্য। ঠাকুরের এই কথাটার কী অর্থ?

মহারাজ : মানে যাকে চলে ফিরে বেড়াচ্ছে বলে দেখছি, আর যাকে স্থির বলে দেখছি—দুইই সাপ। আর জগৎটা—যখন বৈচিত্র দেখছি, আর যখন বৈচিত্র দেখছি না—দুইই ব্রহ্ম। ব্রহ্মের ওপরে আধারিত এগুলি।

—তা, আধারিত যে-জিনিস বা উপাধি সেটা তো মিথ্যা। উপাধি তো মিথ্যা।

মহারাজ : উপাধিগুলি মিথ্যা বৈকি!

—তা উপাধি যদি মিথ্যাই হয়ে যায়, তাহলে সবই তো—

মহারাজ : সবই মিথ্যা কেন হবে?

—উপাধিটা মিথ্যা।

মহারাজ : উপাধি তো উপাধেয় নয়। যার ওপরে আরোপিত হচ্ছে, সেটা তো মিথ্যা হচ্ছে না। দড়িটাকে সাপ বলে দেখছি, সাপ মিথ্যা হল। তখন কি দড়িটাও মিথ্যা হয়ে গেল?

—ঠিকই কথা মহারাজ। কিন্তু আমরা বলছি, যখন কোন ভক্ত ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করছেন যে, তিনি সাকার না নিরাকার? তিনি তো বলতে পারতেন যে, সাকারটা মিথ্যা, নিরাকারটাই সত্য?

মহারাজ : যাকে সাকার দেখছ, তা-ও তিনি। যাকে নিরাকার বলছ, তা-ও তিনি। ঠাকুরের বলবার তাৎপর্য এইটাই।

—হ্যাঁ। আমরা বলছি যে, ঠাকুর তো পরিষ্কার বলে দিতে পারতেন যে, তিনি নিরাকার। তা না বলে তিনি বললেন সাকার এবং নিরাকার।

মহারাজ : দুই-ই বলেছেন। তার মানে দুটোই তাঁর উপাধি। তা না হলে তো তাঁকে বলা হয়ে গেল।

—মহারাজ, সাকারত্ব বা রূপত্ব—এটা উপাধি বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু নিরাকারত্ব ও অরূপত্ব উপাধি কী করে? সেখানে কিছুই তো নেই?

মহারাজ : সাকার-নিরাকারকে ব্যাখ্যা করলেই—যা বলেই কর না কেন তা উপাধি হয়ে গেল।

—না, এটা বুঝতে পারছি না, নেতি নেতি করাটা উপাধি কেন?

মহারাজ : তিনি 'এই'—একথা বলা যায় না। মূল কথা হচ্ছে এই। তিনি 'এই নয়'—একথা বলা যায়। কিন্তু 'তিনি এই'—একথা বলা যায় না।

—মহারাজ, তিনি 'এই নয়'—এইটা উপাধি কী করে? 'নেতি নেতি' করাটা উপাধি কী করে? আমাদের বিচার চলছিল যে, শাস্ত্রের বাক্যকে নিয়ে বিচার হচ্ছে, ঠাকুর বলছেন বা ভাষ্যকারেরা বলছেন যে, বেদেতে শুধু তাঁর আভাস আছে। কিন্তু যেখানে ব্রহ্মের শুধু আভাস আছে, সেই বাক্যকে নিয়ে এত বিচার কেন করা হয়েছে?

মহারাজ : এত বিচার—ব্রহ্ম সম্বন্ধে আমাদের সংশয় দূর করবার জন্য। বিচারের দ্বারা সংশয় দূর হবে। সংশয় দূর করবার জন্য বিচার। যাহোক, কানের যন্ত্রটা সরিয়ে নেওয়ায় এখন ভাল শুনছি। (সকলের হাসি) বল, বল।

—দেখা যাক।

মহারাজ : দেখা যাবে কী করে? শব্দ কি দেখা যায়? শব্দ শোনা যায়।

—না না, মহারাজ। এই দর্শন কথাটার অর্থ ব্যাপক।

মহারাজ : ব্যাপক কথাটার মানে কী? যেমন সমুদ্র ব্যাপক—সেরকম নয়। এ ব্যাপক মানে একটা তার দৃষ্টান্ত দেওয়া। যেমন যাতে বিভিন্ন বস্তু আধারিত হচ্ছে, সেই বস্তুটি ব্যাপক। আধারটি ব্যাপক। কিন্তু আধারিতগুলি ব্যাপক নয়। একটা যেখানে, আরেকটা সেখানে নেই।

—ধূম আর অগ্নির মধ্যে ব্যাপক কোন্‌টি?

মহারাজ : ন্যায় পড়েছে। (সকলের হাসি) বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বত।

—ব্যাপক—যেটি বেশি জায়গা জুড়ে।

মহারাজ : বহ্নিব্যাপ্যধূমবান্ পর্বত। ধূমেতে বহ্নি আছে। অন্য জায়গাতেও বহ্নি আছে। যেমন জ্বলন্ত লোহার গোলক। দেখ, এখানে বহ্নি আছে

পিণ্ডে ধূম নেই। কাজেই বহ্নি হল ব্যাপক। আর ধূম হল ব্যাপ্য। এসব পড়ে কী হল? ব্যাপকত্বমধিকতর বৃত্তিত্বম্। ব্যাপ্যত্বম্—অল্পদেশিত্বম্।

প্রশ্ন : মহারাজ, আজকে যে-কথাটা লিখে এনেছিলাম, ঐটাই আগের কথার মধ্যে এসে যাচ্ছে। স্বামীজী বলেছেন, শঙ্করেরও জিজ্ঞাসা, তুমি কি সত্তাকে আর সব বস্তু থেকে পৃথক করে দেখতে পার? দুটি বস্তুর মধ্যে বিশেষ বা পার্থক্য কোন্‌খানে? ইন্দ্রিয়-জ্ঞানে নয়। কারণ, তাহলে সব জিনিসই একরকম বোধ হতো। দুটি বস্তুর মধ্যে বিশেষ বা পার্থক্য কোনখানে? সত্তাতে নয়, বরং পার্থক্যটা উপাধিতে—এইটাই কি বলছেন?

মহারাজ : সত্তা হল—অমুক সৎ, অমুক সৎ, অমুক সৎ। এই অমুক অমুকগুলো বদলে যাচ্ছে। সৎ তো রয়েছে। এই জিনিসটা আমরা বুঝি না। সৎ কাকে মনে করি—যেটি উপাধিবর্জিত অবস্থা তাকেই বলছে, এগুলিকে বলেছেন সত্তাবিশেষ। অমুক আছে, অমুক আছে মানে অমুকের সত্তা আছে, তা নয়। সত্তা অমুকরূপে প্রতীত হচ্ছে। এইভাবে বুঝতে হবে।

—এই তো সময় হয়েছে মহারাজ।

মহারাজ : কোনরকম করে কালক্ষেপ করা। (সকলের হাসি)

—ভাল কথাই তো হল, মহারাজ।

মহারাজ : দক্ষিণ দেশে বলে, হরিকথা কালক্ষেপণ। (হাসি)

—ওখানে হরিকথা দু-তিন ঘণ্টা, চার ঘণ্টা ধরে চলে।

মহারাজ : হরিকথা কালক্ষেপণম্।

—হরিকথা খুব প্রিয়। আমাদের এখানে যেমন ঠাকুরের ওপরে, মায়ের ওপরে গীতি-আলেখ্য হয়, ওখানে হরিকথা খুব প্রচলিত। লোকে খুব পছন্দ করে।

মহারাজ : ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরকেও নাম বলে। এও তো হরিকথা।

—এ-নাম শুনলেই মানুষ ঘুমিয়ে পড়ে। কানে গেল তো ঘুমিয়ে পড়ল!

মহারাজ : না, ওদের হরিকথা হল তাঁর লীলাকথা। এছাড়া আছে—বাদ, জল্প, বিতণ্ডা। জল্প মানে তাতে কোন প্রতিষ্ঠা নয়। বিতণ্ডা হল খণ্ডন। আর বাদ হল তত্ত্বপ্রতিষ্ঠা। তা তোমরা কী করছ? বাদ করছ, না বিতণ্ডা করছ?

—আমরা বাদ করব।

মহারাজ : তাহলে বাদ পড়বে! (সকলের হাসি)

॥ ১২৩ ॥

প্রশ্ন : শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের মধ্যে যে-রাগের প্রকাশ আপনি দেখেছেন সে-সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন মহারাজ।

মহারাজ : রাগের প্রকাশ? কাদের?

—শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের।

মহারাজ : শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্যদের? জেনে কী হবে? খুব দেখেছি। বিশেষ করে মহাপুরুষ মহারাজ—চটে গেলে এমন ভাষাতে বকতেন যা আমরা তোমাদের এখন বলতেই পারব না! কিন্তু অন্তরটা ছিল স্নেহ-ভালবাসায় ভরা। শুনেছি স্বামীজীও, আমরা যাকে বলি গালিগালাজের ভাষা, তাই ব্যবহার করতেন। কিন্তু শরৎ মহারাজকে শাসনের সময় অন্যদের মতো গালমন্দ শব্দ ব্যবহার করতে কখনো দেখিনি।

—কিছু ঘটনা, আপনি দেখেছেন—

মহারাজ : ঘটনা বিশেষভাবে কিছু জানা নেই। তবে আমাদের এক সমসাময়িক ছিলেন—বৈরাগ্যানন্দ। তিনি আজ আর নেই। মহাপুরুষ মহারাজ তাঁকে গালমন্দ করে কিছু বললে তিনি তা মেনে নিয়ে বলতেন,

'হ্যাঁ, মহারাজ, আমি তাই।' মহাপুরুষ মহারাজ জিজ্ঞাসা করতেন, 'তুই অমুক?' তিনি জবাব দিতেন, 'হ্যাঁ, মহারাজ।'

—মঠে যখন আসতেন, তখনকার কিছু মনে পড়ে?

মহারাজ : আমরা তো বিশেষভাবে কিছু লক্ষ করতাম না। মনে পড়ে না কিছু।

প্রশ্ন : মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজ যখন মঠে ছিলেন সেসময় সকালে গান হতো? শিবানন্দ বাণীতে এক জায়গায় রয়েছে শিবের গান হয়েছে, মহাপুরুষ মহারাজ বলছেন—'শিবের গানের পর মায়ের (শক্তির) গান গাইতে হয়।'

মহারাজ : সকালে গান হতো না, ধ্যান হতো। মহাপুরুষ মহারাজ ঠাকুর ঘরে গিয়ে ধ্যান করতেন। আমরাও ধ্যান করতুম। তা, মহাপুরুষ মহারাজ গান খুব পছন্দ করতেন। চাইতেন ছেলেরা যেন গান-বাজনা করে। নিজেরও গলা মিষ্টি ছিল।

—মহাপুরুষ মহারাজকে গান গাইতে শুনেছেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, শুনেছি। একদিন শরৎ মহারাজকে বলছেন—শরৎ, নে বাঁয়াটায় ঠেকা দে—বলে তিনি গান গাইলেন। শরৎ মহারাজ বাজালেন, মহাপুরুষ মহারাজ গাইলেন। মহাপুরুষ মহারাজ তবলা বাজাতেও পারতেন। তবে হারমোনিয়াম ধরতে দেখিনি।

আরেকবার জন্মাষ্টমীর দিন ভাগবতপাঠ হল। মহাপুরুষ মহারাজ নিজে এসে বসলেন। আমি পাঠ করলুম শ্রীকৃষ্ণের জন্মের অংশটুকু। তারপর বলছেন—এবার গান হোক। সকলে তো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে—কে গাইবে। অপূর্বানন্দ স্বামী—তখন ও ব্রহ্মচারী না সন্ন্যাস হয়েছে মনে নেই। গান ধরল কিন্তু গলা বেরোচ্ছে না।

মহাপুরুষ মহারাজের সামনে গানের গলা বেরোচ্ছে না। মহারাজ এই দেখে নিজেই হাতে তালি দিয়ে গান ধরলেন—'যাদবায় নমঃ' ইত্যাদি।

প্রশ্ন : মহারাজ, মথুরার কৃষ্ণ আবার বৃন্দাবনের কৃষ্ণ—এরকম বলে কেন?

মহারাজ : দু-জায়গায় দু-রকম লীলা বলে।

—মহারাজ, ভাগবতে রাধার কথা নেই। তবে রাধার কথা কীভাবে প্রচলিত হল?

মহারাজ : ভাগবতই কি একমাত্র গ্রন্থ?

—বৈষ্ণবদের কাছে তো ভাগবতই authority, তাতে যখন শ্রীকৃষ্ণের জীবন বৃত্তান্ত রয়েছে সেখানেই রাধার কথা স্বাভাবিক।

মহারাজ : ভাগবতে নেই। হরিবংশে রয়েছে। কিন্তু যেহেতু ভাগবতই বৈষ্ণবদের authority সেইজন্য ভাগবতে রাধার উল্লেখ দেখাতে পারলে সেটা authoritative হবে। তাই তাঁরা গোপীগীতার একটি শ্লোক উদ্ধৃতি করে বলেন, এই তো! যে প্রধানা গোপীর দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ পূজিত হলেন তিনিই রাধা।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঋত মানে কী?

মহারাজ : ঋত মানে কর্মফল—যেটা ফিরে আসে। কর্মের ফল অবশ্যম্ভাবী, যদিও সেটা চিরস্থায়ী নয়। তাই পারমার্থিক সত্যের সঙ্গে তুলনা করলে ঋত-কে আপেক্ষিক সত্য বলতে পার। সত্য—পারমার্থিক—একমাত্র ব্রহ্ম। ঋত—আপেক্ষিক—কর্মফল। এ দুটোকে—সত্য ও ঋতকে দুটো চোখ বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : মহারাজ কার্যের কারণে লয় হওয়ার অর্থ কী?

মহারাজ : হুঁ, ধর—কতগুলি মাটির খেলনা রয়েছে। ওগুলো ভেঙে গেলে কী রইল? যা দিয়ে তৈরি তা-ই রইল। অর্থাৎ মাটি। খেলনা—কার্য। মাটি—কারণ। কার্য না থাকলে কী থাকল? কারণ থাকল। জগৎ কার্য। তার কারণ ব্রহ্ম। বিকৃতি থেকে কার্য। বিকৃতি না হলে কার্য হয় না। তখন শুধু কারণরূপে অবস্থান। এই হল কার্যের কারণে লয় হওয়া।

—ব্রহ্মোপলব্ধি হলে জ্ঞানীর কাছে জগৎরূপ যে কার্য সেটা থাকে না। তার কাছে শুধুই ব্রহ্ম থাকে। এটা কি কার্যের কারণে লয় হওয়া?

মহারাজ : না, শুধু জ্ঞানীর ক্ষেত্রে নয়। এটা সত্য। সকলের জন্য কার্যরূপে যখন তার প্রকাশ হয় না তখন তা কারণরূপেই থাকে।

—এটা কি প্রলয়ের সময়ে?

মহারাজ : না, যেকোন সময়েই। বস্তু একটিই—কখনো তা কার্যরূপে ব্যক্ত আবার কখনো বা তা কারণরূপে অব্যক্ত বা অবিকৃত।

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী এক জায়গায় (বাণী ও রচনা, ৯ খণ্ড, পৃষ্ঠা-৪৮৯) বলেছেন—প্রকৃত জ্ঞানী তিনিই যাঁর হৃদয়ে অগাধ প্রেম রয়েছে এবং তিনি সর্বাবস্থায় অদ্বৈততত্ত্ব দর্শন করেন। মহারাজ, অগাধ প্রেম বলতে কী বোঝাচ্ছে এবং জ্ঞানীর কিভাবে অগাধ প্রেম হচ্ছে?

মহারাজ : অগাধ প্রেম—অগাধ মানে unlimited। কোন কিছুর দ্বারা limited হচ্ছে না। কেন limited হচ্ছে না? কারণ—জ্ঞানী সর্বাবস্থায় অদ্বৈততত্ত্ব দর্শন করেন। মানুষের সর্বাপেক্ষা প্রিয় হচ্ছে আত্মা। আত্মার প্রতি ভালবাসা অগাধ।

—মহারাজ, এখন তো আমরা আত্মা যে ভূমা ইত্যাদি সেটি বুঝতে পারছি না। কেবল একটা স্বার্থবুদ্ধি আমি-র প্রতি আমাদের টান বা ভালবাসা।

মহারাজ : স্বার্থবুদ্ধি তাকেই বলে যখন কেউ অপরকে বঞ্চিত করে নিজের জন্য সব করে। কিন্তু যখন সেইরকম স্বার্থবুদ্ধি থাকবে না তখন কি তার সম্পূর্ণ ভালবাসাটাই আত্মার প্রতি হবে না? (চুপ করে আছি। ঠিক বুঝতে পারিনি বলে মহারাজ আবার বলছেন—)

ধর, আমি তোমায় ভালবাসি। আবার ওকেও ভালবাসি। ওকে ভালবাসি মানে তোমার প্রতি আমার ভালবাসা ওর দ্বারা limited হয়ে গেল। তোমার প্রতি ভালবাসার ক্ষেত্রে ও limit করে দিল। দ্বিতীয় বস্তু থাকলেই limit হয়। জ্ঞানী যেহেতু সর্বাবস্থায় অদ্বৈততত্ত্ব দর্শন করেন সেহেতু তাঁর কাছে দুই নেই। তাঁর ভালবাসা তাই unlimited, limit করবার জন্য দ্বিতীয় কেউ নেই। বুঝলে?

—হ্যাঁ, মহারাজ।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর সরলতা সম্পর্কে জটিল বালকের কথা বলেছেন। শুধু সে কেন সকল বালকই তো শৈশবে সরল থাকে।

মহারাজ : না, সকলেই সেরকম সরল হয় না। জটিল বালকের বিশ্বাসের কথায় ঠাকুর বলেছেন—মা বলেছেন, ও তোর মধুসূদন দাদা। সত্যিই তাই! কী বিশ্বাস! ওরকম বিশ্বাস তুমিও ছেলেবেলায় করনি, আমিও করিনি।

সরলতা দেখেছি শুদ্ধানন্দজীর। একবার শুদ্ধানন্দজী বলেছেন—তপস্যায় যাব। শুনে শশী মহারাজ বলেছেন—সুধীর, তপস্যায় যে যাবে, তপস্যায় গেলে গাছতলায় শুতে হয়। একথা শুনে সুধীর মহারাজ খুব চিন্তিত হয়ে গেলেন। বললেন—তাই তো, আমি তো কোন দিন গাছতলায় শুইনি। তা যাই হোক, আজকে রাতটা গাছতলায় থেকে দেখব। সত্যি সত্যি সেদিন রাতে গাছতলায় গিয়ে থাকলেন। এদিকে ঠাণ্ডায় গলাটলা

ফুলে একসার। দেখ কী বিশ্বাস! এ ঘটনাটা আমরা ওঁর মুখেই শুনেছি। (সকলের হাসি)

ঠাকুর শুনেছেন, সাপে কামড়ালে আবার যদি সাপ কামড়ায় তবে বিষ উঠে আসে। তাই কী একটা হয়ত পোকা কামড়েছে, সাপ কামড়েছে ভেবে সাপের গর্তের মুখে হাত দিয়ে বসে আছেন। একজন দেখে বললে, যে জায়গায় কামড়েছে ঠিক সেই জায়গায় আবার কামড়ালে তবে বিষ উঠে আসবে। শুনে ঠাকুর উঠে এলেন। দেখ কীরকম বিশ্বাস! (আলোচনা শেষ। সকলে প্রণাম করে উঠে আসছে। আমরা ২।৪ জন রয়েছি।)

মহারাজ : অ— শোন, আমার জীবনেই এরকম একবার হয়েছিল। কলকাতায় ছাদের উপরে রাত্রে কী একটা কামড়েছে। ভাবলুম, ঠিক সাপ কামড়েছে। মা বললেন—একটু চিনি খেয়ে দ্যাখ। সাপে কামড়ালে নাকি চিনি খেলে তখন মিষ্টি লাগে না। তা, চিনি খেয়ে দেখি মিষ্টিই লাগছে! (আমাদের হাসি। মহারাজও খুব হাসলেন।)

—মহারাজ, বিশ্বাস কী করে হয়?

মহারাজ : ঠাকুর বলেছেন, সরল হলে বিশ্বাস হয়। এখন বলবে—সরল কীভাবে হওয়া যায়? কুটিলতা ত্যাগ করলে, কপটতা ত্যাগ করলে সরল হয়। তাহলে বিশ্বাস হয়।

—মহারাজ, ছেলেবেলায় অনেকেই সরল থাকে। তারপর—

মহারাজ : তারপর দেখেশুনে, ঠকে, খুইয়ে বিশ্বাস হারিয়ে যায়। অবিশ্বাস আসে। তাহলে শোন গল্প বলি—

তখন আমি ঢাকায় Assistant Secretary। সম্বুদ্ধানন্দজী Secretary। একদিন বাইরে কোথা থেকে মঠে ঢুকতেই সম্বুদ্ধানন্দজী বললেন—বুঝলে,

আজ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটেছে। আমি বললুম, কী হয়েছে?—এই একটু আগে একটি লোক এসেছিল, সঙ্গে তার স্ত্রী। যেতে যেতে পথের ধারে মহিলাটির একটি সন্তান প্রসব হয়। কোলে রয়েছে। কাপড়ে ঢাকা। এখন কোথায় যাবে, কীভাবে নিয়ে যাবে ইত্যাদির জন্য একটু সাহায্য চাইতে এসেছিল। তা আমি কটা টাকা আর দুটো কাপড় দিয়ে দিয়েছি। আমি বললুম—ও বাচ্চাটাচ্চা কিছু হয়নি। কিছু নেই। সম্বুদ্ধানন্দজী বললেন—কী বলছ! এই এসেছিল। সকলেই দেখল মায়ের কোলে কাপড়ে জড়ানো শিশু। এই ওরা সব ছিল। আমি জোরের সাথেই বললুম—বাচ্চাটাচ্চা কিছু নেই। দেখুন ডেকে। বলতেই Students' Home-এর ছেলেরা ও অন্যান্য ভক্তেরা ছুটে বেরিয়ে গেল। গিয়ে একটু দূরে তাদের ধরেছে। বলছে—দেখি বার কর তোমাদের বাচ্চা দেখব। তারা কিছুতেই দেখায় না। মহিলাটির কোলে করা জড়ানো কাপড়টাপড় টেনে বার করতেই দেখা গেল একটা বড় পুতুল!

এরপরে সম্বুদ্ধানন্দজী বললেন—আচ্ছা তুমি কী করে জানলে যে ওদের ওর মধ্যে কোন বাচ্চা নেই? আমি বললুম—ঠেকে শিখেছি। আমরা কলকাতার ছেলে। এরকম অনেক দেখে দেখে ঠেকে শিখেছি।

(পূজনীয় মহারাজ এরপর ওই প্রসঙ্গে ২।৩-টে কলকাতার গল্প বললেন। একটি হল—)

শেয়ালদহ স্টেশনে একটি মেয়ে ছোটাছুটি করছে, আর পাশে তার মা মরে পড়ে রয়েছে। আবার একটি লোক যেন ঠিকানা চিনতে পারছে না। বলছে—অমুকবাবুর তেলকলটা কোথায়? ইত্যাদি। আর একটি, অপরিচিত একটি লোক একবার বেলুড় মঠে চলে এসেছিল। বলল, সঙ্গে কিছু পয়সা নেই। কী করে যাবে ইত্যাদি। মঠের সাধুদের দয়া হল।

একজন হাওড়া পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে টিকিট কাটতে গেল তার গন্তব্যস্থানে পৌঁছানোর জন্য। এদিকে সে উধাও। ভেবেছিল ধাপ্পা দিয়ে কিছু টাকা-পয়সা আদায় করবে।

(একটার পর একটা গল্প আমরা বেশ enjoy করলাম। এরপর মহারাজ বললেন—) কলকাতায় কিছুদিন থাকলেই যা বিশ্বাস-টিশ্বাস ছিল সব একেবারে শেষ। (সকলের হাসি)

—আজ আসি মহারাজ।

॥ ১২৪ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, ইউরোপে গোপাল মহারাজ—মানে স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দজীর দ্বারা একটি তত্ত্ব খুব চালু আছে। শশী মহারাজকে উদ্ধৃত করে তিনি বলতেন যে, 'লীলাপ্রসঙ্গ'তে শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধি সম্পর্কে একটি বিবর্তনের তত্ত্ব রয়েছে। তাঁর ঈশ্বরত্ব তিনি নিজ অনুভূতিবলে ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিলেন। গোপাল মহারাজের মতে, শশী মহারাজ প্রায়ই বলতেন, ব্যাপারটা সেরকম কিছু ঘটেনি। শ্রীরামকৃষ্ণের যা যা প্রয়োজন সবই তাঁর জানা ছিল।

মহারাজ : প্রথম থেকেই জানা ছিল?

—না, প্রথম থেকে ঠিক নয়; ভবতারিণীর মন্দিরে সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতার পর।

মহারাজ : সেই অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধিটা কী?

—মানে, মন্দিরের সেই অলৌকিক অভিজ্ঞতা; সেই দর্শনের পর পড়ে যাওয়া ইত্যাদি।

মহারাজ : তবে, এসবই হল গিয়ে তত্ত্বকথা। লীলাপ্রসঙ্গকার অবতারের আধ্যাত্মিক ক্ষমতা প্রকাশের ক্রমবিবর্তনে বিশ্বাস করতেন। তাই লীলাপ্রসঙ্গে

সেটাই বলা হয়েছে। আর শশী মহারাজের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, অবতারের সমস্ত ক্ষমতাই তাঁর জন্মগত। আমরা জানি না কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। তবে দুটো ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি। আর দুটোই সমান বিশ্বাসযোগ্য।

—রাজা মহারাজের কী মত ছিল—মানে এব্যাপারে রাজা মহারাজের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল?

মহারাজ : রাজা মহারাজ ঠাকুরের উপলব্ধির ক্রমবিবর্তনে বিশ্বাসী ছিলেন না। তবে এটা বিশ্বাস না করলেও এব্যাপারে তিনি স্পষ্ট কিছু বলেননি। কথামৃতে যেরকম বলা আছে তাতে ঠাকুরের ব্যাপারে দুভাবেই ভাবা যায়। পুরাণেও এটাই দেখা যায়। সেখানে ভগবানকে কখনো দেখানো হয়েছে একজন সাধারণ মানুষ হিসাবে, আবার কখনো সর্বশক্তিমান ঈশ্বর হিসাবে। বোধহয় সেটাই অনেক যুক্তিসম্মত।

—তা ঠিক।

মহারাজ : তাহলে কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে—ঠাকুর যে-সাধনাগুলি করলেন তা কি শুধু আমাদের দেখানোর জন্য, নাকি তাঁর নিজের জীবনেও এগুলির প্রয়োজন ছিল?

—প্রয়োজন—আপনার কী মনে হয়—শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনা সম্বন্ধে?

মহারাজ : সেগুলি শুধুমাত্র লোক দেখানোর জন্য ছিল না; বরং পরম সত্য উপলব্ধির জন্য সাধকের যে-ব্যাকুলতা তার একটা স্পষ্ট ছবি আমরা সেখানে পাই।

—তবে তো শরৎ মহারাজের দৃষ্টিভঙ্গিকেই সমর্থন করা হচ্ছে।

মহারাজ : কারণ সেটিই বেশি যৌক্তিক। ঠাকুরের একটি কথা প্রায়ই বলা হয়—'এর মধ্যে দুজন রয়েছে : একটি ভক্ত, অন্যটি ভগবান।' একথাটিও

মনে হয় যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত। কারণ, সব পুরাণে লীলাকে এভাবেই দেখানো হয়েছে। লীলা মানেই হল কিছু দেখানো—বাইরে থেকে দেখানো, যাতে একটি আদর্শ তৈরি হয়। এটি আন্তরিক ব্যাকুলতায় ভক্তের ঈশ্বরসন্ধান। এটা ঈশ্বরের জন্য ভক্তের ব্যাকুলতা ছাড়া আর কিছুই না।

—কিন্তু পুরাণের চাইতে ঠাকুরের ঘটনাগুলি তো অনেক বেশি সত্য। পুরাণ তো প্রধানত লোককাহিনি বা রূপকথা। কোন কোন ক্ষেত্রে ইতিহাসের উপাদান থাকলেও প্রধানত পুরাণ হল কল্পনা। পুরাণ—গল্পকথা।

মহারাজ : পুরাণে কিন্তু কোনটা সত্য, কোনটা নয়—তুমি জোর দিয়ে বলতে পার না। শ্রুতিবাক্য দ্বারা যাকিছু সমর্থন করা হয়েছে সেটাই শুধু যুক্তিসম্মত ও গ্রহণযোগ্য বলে ধরে নিতে হবে। আর যাকিছু, তা লোকশিক্ষার জন্য জানতে হবে। এবং ভাগবতে বলছে যে, অবতারের আচার-আচরণ অন্ধভাবে অনুকরণ করা উচিত নয়। ‘ঈশ্বরাণাং বচঃ কার্যং তেষামাচরণং ক্বচিৎ।’ তিনি যা শিক্ষা দেন তা মেনে চলতে হবে; কিন্তু তাঁর আচরণ ততটুকুই মেনে চলা যতটুকু আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হবে। অন্য কিছু নয়।

—রাসলীলার বর্ণনা যেভাবে করা হয়েছে তা তো মারাত্মক—

মহারাজ : রাসলীলা—সেটা তো পরিষ্কার বলা আছে—অলৌকিক। কারণ, প্রতি দুজন গোপিনীর মধ্যে একজন করে ঈশ্বরের উপস্থিতি—মানে ঈশ্বর একাধিক বলে প্রকাশ হচ্ছে। এটা নিছক মানবিক ঘটনা নয়।

—অতিজাগতিক কাণ্ড!

মহারাজ : হ্যাঁ। কারণ, তাঁর আচার-আচরণ নিয়ে তখনই আমরা ভাবনা-চিন্তা করব যখন তা আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির পক্ষে অনুকূল বলে মনে হবে।

—কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে আমরা এমন কিছুই পাই না যা অনুসরণযোগ্য নয়—তত্ত্বের দিক দিয়ে।

মহারাজ : অনেক কিছু পাই।

—যেমন?

মহারাজ : যেমন, অল্পবয়সে তাঁর সমাধি অবস্থা। তাঁর সমস্ত জীবনই এরকম বহু দিব্যলীলার (অলৌকিক লীলার) উদাহরণে পরিপূর্ণ।

—হ্যাঁ মহারাজ, তা ঠিক। কিন্তু দেখুন, এমন কোন আচরণ—মানে তাঁর জীবনে এমন কোন আচরণ তো দেখি না যেটা আদর্শ হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়।

মহারাজ : 'আনন্দাসন'-কে কী বলবে? সেটা কি আদর্শ হতে পারে?

—নয় কেন মহারাজ?

মহারাজ : ওটা বিপজ্জনক!

—বিপজ্জনক ঠিকই, কিন্তু তাত্ত্বিকভাবে দেখলে ওটা একটা আদর্শ তো বটেই। কারণ শ্রীরামকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন, ওগুলোও পথ।

মহারাজ : তন্ত্রে সাধারণ স্তরের সাধকদের জন্য ওগুলি কঠোরভাবে নিষিদ্ধ বলা আছে। ধর, বীরভাব—একমাত্র বিশেষ স্তরের সাধকদের জন্য এই বীরভাব—সকলের জন্য নয়। তাই একে 'রহস্য' বলা হয়েছে—অর্থাৎ গোপন রাখতে হবে।

—সেটা বোঝা যায়, কিন্তু তবু—দেখুন, এর যে মূল উদ্দেশ্য তা তো কাম চরিতার্থ করা নয়—তার ঊর্ধ্বে ওঠার উপায় দেখানো।

মহারাজ : সবকিছুর ঊর্ধ্বে ওঠা তো সাধকের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। ওটি একমাত্র সম্ভব যখন কোন দিব্য মহাশক্তি রক্ত-মাংসের শরীরে অবতাররূপে আসেন।

—হঠযোগ ব্যাপারটা কী মহারাজ? হঠযোগ সম্পর্কে আপনার মত কী? ঠাকুর নিজে হঠযোগ অভ্যাস করেছিলেন অথচ অন্যদের তিনি হঠযোগ অভ্যাস করতে নিষেধ করতেন। নিজে অভ্যাস করেছেন অথচ অন্যদের নিষেধ করছেন—

মহারাজ : বললাম তো—'ঈশ্বরাণাং বচঃ কার্যং তেষামাচরণং ক্বচিৎ।' পুরাণে একথা স্পষ্ট করে বলা আছে।

—মহারাজ, ঠাকুরের অসুখ ও রোগভোগের ব্যাপারটা আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব?

মহারাজ : অসুখ, কষ্টভোগ—কারণ তিনি তো মানুষরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, মানুষের যা-যা কষ্ট তা সব তাঁর শরীরে ফুটে উঠবেই। আর তাহলেই লোকে তাঁকে তাদেরই একজন হিসাবে গ্রহণ করতে পারবে।

—এসব তো তাঁর জীবনে সত্য সত্যই ঘটেছে।

মহারাজ : হ্যাঁ ঘটেছে। কিন্তু এর অন্য একটা দিকও রয়েছে। কেউ যখন তাঁকে বলছে, আপনার রোগ-ভোগ সবটাই লোক-দেখানো, তিনি তা অস্বীকারও করছেন না। বলছেন, 'শালা ধরে ফেলেছে রে!'

—এর অর্থ, তাঁর রোগটা সত্য ছিল না? তিনি কোন কষ্টভোগ করেননি?

মহারাজ : সাধারণ ভক্তদের জন্য এটা জরুরি ছিল—সাধারণ মানুষ, যারা ঈশ্বরের সাধক তাদের জন্য। তা নাহলে অবতারের তো কোন মানে থাকে না। দেবত্বের প্রকাশ যদি আগেই হয়ে যায় তবে তো তা মানুষের কাজে আসবে না।

—আমরা যদি বলি, ঈশ্বরসত্তা কষ্ট পাননি—

মহারাজ : ঈশ্বরসত্তাকে তো গোপন রাখতে হবে।

—ভক্তসত্তাই তাঁর ভিতরে আসলে কষ্টভোগ করেছিলেন, অসুস্থ হয়েছিলেন।

মহারাজ : হ্যাঁ।

—ঈশ্বরসত্তাটি নয়।

মহারাজ : না।

প্রশ্ন : ঈশ্বরকোটিদের একটি তালিকা আছে—'পুঁথি' অনুযায়ী তাঁদের সংখ্যা দশ। এই পুঁথিতে তারকনাথ মুখোপাধ্যায়কে একজন ঈশ্বরকোটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কথামৃতেও উল্লেখ করা হয়েছে যে—'নরেন রুই আর তারক হল মিরগেল।'

মহারাজ : তারকনাথ মুখোপাধ্যায়টা কে?

—তারকনাথ মুখোপাধ্যায় হলেন শ্রীরামকৃষ্ণের একজন শিষ্য। 'বেলঘরের তারক।' আপনি তাঁকে দেখেননি?

মহারাজ : না।

—ও।

মহারাজ : তারকনাথ মুখোপাধ্যায়।

—কিন্তু আমি তাঁর পৈতৃক বাড়িতে গিয়েছি—বেলঘরিয়ার তারকনাথের বাড়িতে—ওখানে তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি ছবি চেয়েছিলাম। ওরা আমাকে একটা ছবি দিয়েছিল আমার ইউরোপ চলে যাওয়ার আগে। কিন্তু দুঃখের কথা, সেটা হারিয়ে গেল। আমি ছবিটা হারিয়ে ফেলেছি। ছবিটা দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে, তিনি একজন মহাপুরুষ, দৃঢ়চেতা এবং খুব সাত্ত্বিক।

মহারাজ : খুব?

—হ্যাঁ, খুব উজ্জ্বল। তাঁর চেহারাটাই খুব আকর্ষণীয় ছিল।

মহারাজ : হ্যাঁ, বেলঘরিয়ার তারকের উল্লেখ রয়েছে বটে। কিন্তু আমি তাঁকে দেখিওনি, তাঁর সম্পর্কে বড় একটা শুনিওনি।

—আমাদের ধারণা, সে-সময়ে বেলুড় মঠে আপনি অবশ্যই তাঁকে দেখে থাকবেন। আর অন্য ভক্তদের—গৃহী ভক্ত, যেমন বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল—

মহারাজ : বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালকে আমি কাছ থেকে দেখেছি।

—তাঁর সম্পর্কে আপনার মনোভাব কিরকম?

মহারাজ : তাঁর সম্পর্কে একটা ধারণা হল—তিনি একটু কৃপণ ছিলেন। (হাসি) কিন্তু ওঁর সম্পর্কে অন্যরকম একটা ধারণাও আছে। একবার আমরা দুর্গাপুজো করব বলে ঠিক করলাম। আমি পূজারি। ছাপ্পান্ন টাকা জোগাড় হল। দুর্গাপ্রতিমা বায়না দিয়ে ফেললাম, কিন্তু কোথায় পুজোটা হবে সেটাই ঠিক করে উঠতে পারলাম না। এক ভক্তকে পুজোর কথাটা বলতে সে তো আঁতকে উঠল—'ওরে বাবা! দুর্গাপুজো একটা বিরাট অনুষ্ঠান। ও আমরা পারব না।' শেষে আমরা বৈকুণ্ঠনাথ সান্যালের কাছে গেলাম। তাঁর ছেলেরা সকলেই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব, তারাও ঐ পুজোয় যোগ দেবে। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল বললেন, 'তা-তা বা-বাবা ক-কত টা-টাকা তুলেছ?' (সকলের হাসি) আমি বললাম, 'আমরা সকলে মিলে ছাপ্পান্ন টাকা তুলেছি।' 'তা-তা বাবা, দু-দুর্গাপুজো কি ছা-ছাপ্পান্ন টাকায় হয়?' (সকলের হাসি) কী ছেলেমানুষী! আবেগের বশে আমরা পঁচিশ টাকার প্রতিমার বায়নাটা দিয়ে দিয়েছি আগেই! তারপর তাঁর ব্যবস্থায় সব সামলানো গেল। তাঁর এক ছেলে হল তন্ত্রধারক, অন্য ছেলেটি হল চণ্ডীপাঠক, আর আমি নিজে হলাম পূজারি। তখন আর তাঁকে কৃপণ মনে হচ্ছিল না। প্রথমে দেখা গেল, প্রতিমাটি দরজা

দিয়ে ঢোকাবার পক্ষে অত্যধিক বড়। তিনি বেশ খোশমেজাজে ছিলেন, বললেন, 'ভাঙো! ভেঙে ফেল! প্রতিমা নয়, দরজাটা!' (হাসি) 'দরজা ভাঙো।' কিন্তু সেটার দরকার হয়নি। চালচিত্রটা সরিয়ে নিতেই প্রতিমা দরজা দিয়ে গলে গেল। তারপর, পূর্ণাহুতির সময়ে তিনি এতটাই উৎসাহিত হয়ে উঠলেন যে, একবারে অনেকটা ঘি আগুনে ঢেলে দিলেন আর লকলকিয়ে আগুনের শিখা ওপর অবধি উঠে গেল। দেওয়ালে একটা আয়না ছিল। আগুনে সেটা গেল পুড়ে! তিনি বললেন—'যাক গে!'

এ তো গেল একটা দিক। অন্যদিকে, শরৎ মহারাজের শরীর যাবার পরে, সেবছর মঠে প্রতিমায় দুর্গাপুজো হয়নি। এক ভক্ত সব খরচ দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহাপুরুষ মহারাজ তীব্র আপত্তি জানালেন। তাই কোন প্রতিমায় সেবার পুজো হল না। আর বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল সাধুদের তাঁর বাড়ির পুজোয় নেমন্তন্ন করলেন। ও হ্যাঁ, আরেকটা কথা। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ছিলেন আমাদের বেলুড় মঠের হিসাবরক্ষক। তাঁর হিসাবরক্ষণের একটা নমুনা দিচ্ছি : 'তা-তা তোমাদের এত নু-নুন খরচ হয় কেন?' (হাসি) 'আ-আমাদের বা-বাড়িতে আমরা মো-মোট ছজন মিলেও এ-এত নু-নুন খরচ ক-করি না। কে-কেন তো-তোমাদের নু-নুন এত বে-বেশি খরচ হয়?' তা সেবছর প্রতিমায় পুজো হয়নি। তিনি তাঁর বাড়িতে সব সাধুদের প্রসাদ পাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। তা আমরা গেলাম—অনেকেই গেলাম। তিনি খুশি হলেন। কিন্তু পরিবেশন ভাল হচ্ছিল না। তিনি এসে সব দেখে বললেন, 'দই দাও, পান্তুয়া দাও, পান্তুয়া।' কিন্তু প্রত্যেকের ভাগে পান্তুয়া পড়তে লাগল দেড়খানা করে! (হাসি) এটাই আমার অভিজ্ঞতা।

আর দুর্গাপুজো—তিনি আমাদের কথা ভেবে সরস্বতী প্রতিমাটা সরাতেন না—বিদ্যা; লক্ষ্মী-সরস্বতী তাই থেকে যেত। প্রতিমা থেকে কেবল কার্ত্তিক আর গণেশটাকে সরিয়ে নিতেন। (হাসি)

—যে-প্রতিমাটা পুজো হয়েছিল, সেটা থেকে কার্ত্তিক আর গণেশ তিনি পুজো শেষ হলেই সরিয়ে নিয়েছিলেন?

মহারাজ : না না সেবছর নয়, পরের বছর। তিনি প্রতি বছরই পুজোটা করতেন। কার্ত্তিক আর গণেশকে পরের বছর সরিয়ে দিতেন। (সকলের হাসি)

॥ ১২৫ ॥

মহারাজ : বল।

প্রশ্ন : এ একটা পুরনো প্রশ্ন, ঠাকুর এক জায়গায় বলছেন, ভগবতী নিজে পঞ্চমুণ্ডীর ওপরে বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন লোকশিক্ষার জন্য। শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম। তিনিও রাধাযন্ত্র কুড়িয়ে পেয়ে লোকশিক্ষার জন্য তপস্যা করেছিলেন। রাধাযন্ত্র বলতে কী বোঝাচ্ছে?

মহারাজ : যন্ত্র বলতে তান্ত্রিকদের যে নানারকম আঁকা থাকে, সেইরকম একটা আঁকাজোঁকার নাম রাধাযন্ত্র।

—আচ্ছা। তাহলে রাধার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই?

মহারাজ : না। রাধার নামে প্রচলিত। অর্থাৎ কৃষ্ণ তো রাধা রাধা করে রাধার সাধনা করে গেছেন। শক্তিসাধনা। রাধা হচ্ছেন হ্লাদিনী শক্তি, তার সাধনা করেছিলেন।

—পঞ্চমুণ্ডীর ওপরে ভগবতী সাধনা করেছিলেন, এরকম ব্যাপারগুলো বইতে পাওয়া যায়?

মহারাজ : আছে তো। লীলাপ্রসঙ্গে আছে।

—না, ভগবতীর—কোন পুরাণ-টুরাণে আছে কিনা, তাই বলছি।

মহারাজ : ঠাকুর পঞ্চমুণ্ডীর ওপর বসে সাধনা করেছিলেন।

—ভগবতীও নিজে পঞ্চমুণ্ডীর ওপরে বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

মহারাজ : ভগবতী?

—হ্যাঁ, ভগবতী, ঠাকুর বলছেন।

মহারাজ : পুরাণে আছে। টুরাণে তুমি কেন বললে? তাচ্ছিল্যে ওরকম বলা হয়।

—না, এটা সমজাতীয় অন্যান্য গ্রন্থের কথা বলতে গিয়ে বলছেন, পুরাণ-টুরাণ।

মহারাজ : সমজাতীয়? জাত কোথায় এর? কী হল?

—ঐ তো। ভগবতী নিজেই পঞ্চমুণ্ডীর ওপরে বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

মহারাজ : হয়তো শিবকে পাবার জন্য।

—ঠিক আছে। স্বামীজী একটি চিঠিতে লিখছেন আলাসিঙ্গাকে—সত্যই আমার ঈশ্বর, সমগ্র জগৎ আমার দেশ। আমি কর্তব্যে বিশ্বাসী নই। এই কর্তব্য হচ্ছে সংসারীর পক্ষে অভিশাপ, সন্ন্যাসীর জন্য নয়। কর্তব্য একটা বাজে কথা মাত্র। এখানে কর্তব্য বলতে কী বোঝাচ্ছে?

মহারাজ : Duty যাকে ইংরাজীতে বলে। বর্ণাশ্রমধর্ম—এগুলি কর্তব্যের ভেতরে পড়ে।

—এগুলি অভিশাপ বলছেন কেন?

মহারাজ : অভিশাপ মানে—তা বাধ্য করে, মানুষকে দুর্বল করে দেয়। এটা না করলে পাপ হবে, ওটা না করলে এই হবে। এইজন্যে অভিশাপ।

—সমাজ বা এই শৃঙ্খলারক্ষার জন্য কর্তব্য তো প্রয়োজন। অভিশাপের কথা সংসারীদের জন্য বলেছেন।

মহারাজ : প্রয়োজন তো বটে। কিন্তু স্বামীজী বারবার বলেছেন, নিয়ম হল নিয়মের পারে যাবার জন্যে। এই কর্তব্যগুলি কর্তব্যকে অতিক্রম করবার জন্যই।

—মহারাজ, আমাদের সংঘজীবনে আমরা যে-কাজ করছি বা একটা নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলছি, বজায় রাখছি—এর মধ্যেও তো duty ব্যাপারটা এসে যাচ্ছে।

মহারাজ : ঐ তো। সংঘ থেকে পালাবার জন্য তৈরি হচ্ছি। (সকলের হাসি)

—মানে মহারাজ? অতিষ্ঠ হয়ে উঠছি নাকি?

মহারাজ : এ্যাঁ?

—বলছি, আমরা এই কর্তব্যপালনের ফলে আসলে হাঁপিয়ে উঠছি, সেই ভাবটা বলছেন?

মহারাজ : হাঁপিয়ে উঠি শুধু নয়, দাসত্ব করছি যেন মনে হয়। হ্যাঁ? 'শাস্ত্রানুবর্তনং ত্যক্তা ত্যক্তা লোকানুবর্তনং / দেহানুবর্তনং ত্যক্তা ত্রয়ং ত্যক্তা সুখী ভবেৎ।'

—মানে? মানেটা বলুন মহারাজ।

মহারাজ : দেহের প্রতি কর্তব্য, শাস্ত্রের নির্দিষ্ট কর্তব্য, আর লোকে কী বলবে—মানুষ এই নিয়ে কর্তব্য করে চলেছে। এই তিনটি কর্তব্যকে পরিত্যাগ করলে মানুষ সুখী হয়। ভগবান বলছেন :

> ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি।। (গীতা, ৩।২২)

—মহারাজ, আমাদের সংঘজীবনে এটা কী করে সম্ভব?

মহারাজ : সেই তো। সংঘজীবনে কর্তব্য ত্যাগ করলে আমরা যাব কোথায়?

—হ্যাঁ। সেইটাই তো কথা। সংঘে থেকে সাধনার সুবিধা হবে বলে এখানে আমরা রয়েছি।

মহারাজ : কর্তব্য করতে করতে যখন দেখবে যে বড় হয়ে গেছ, তখন কর্তব্য আর থাকবে না। কর্তব্য করতে করতে মানুষের উন্নতি হয়। এর ফলে কর্তব্যের পারে যায়। তখন আর তার কর্তব্য বলে কিছু থাকে না।

—মানে এটা স্বাভাবিক হয়ে যায়, তাই না মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ—স্বাভাবিক হয়ে যায়, তা বলতে পার। আর এগুলি আর আমাদের বন্ধনের কারণ হয় না। সংসারের কর্তব্যগুলিই আসলে বন্ধনের কারণ।

—ঠিক। কিন্তু নিয়মের বশে চলতে চলতে তো একটা সময় তার ওপর যন্ত্রবৎ নির্ভর করে আমরা চালিত হয়ে থাকি। তা সেটা তো বন্ধনই।

মহারাজ : হ্যাঁ, বন্ধন বৈকি।

—তখন তার থেকে মুক্ত ভাবটা আসবে কী করে? তাহলে কি কাজটা করব না?

মহারাজ : করতে করতে যখন মন শুদ্ধ হবে, তখন আর কর্তব্য থাকবে না। কর্তব্য খসে পড়বে।

—কর্তব্য বলে যে-কাজগুলো করা হচ্ছিল, সেগুলি তো করতেই থাকব?

মহারাজ : যেগুলোর বিধান আছে সেগুলো তো করতে হবেই। আর, এই তো কর্তব্য সবে আরম্ভ করলে! কর্তব্য না সারা পর্যন্ত কর্তব্যের বাঁধন।

—মহারাজ, আর একটি কথা বলি—

মহারাজ : বল।

—কথামৃত থেকে বলছি। ঠাকুরের কাছে নরেন্দ্র গান গেয়ে গেল। তারপরে ঠাকুর বলছেন, আগুন জ্বেলে গেছে। এখন থাকল আর গেল। কাপ্তেন প্রভৃতির প্রতি—চিদানন্দ আরোপ কর। তোমাদেরও আনন্দ হবে। চিদানন্দ আছেই। কেবল আবরণ ও বিক্ষেপ। বিষয়াসক্তি যত কমবে, ঈশ্বরের প্রতি মতি তত বাড়বে।—এই যে মহারাজ, চিদানন্দ আরোপ কর, তোমাদেরও আনন্দ হবে—এইটি।

মহারাজ : চিদানন্দ আরোপ কর—নিজে আমি চিৎ-আনন্দ স্বরূপ, এই আরোপ কর। অনুভব তো তখনো হচ্ছে না, তাই আরোপ কর। আরোপ করতে করতে শেষে অনুভূতি আসবে। তোমাদেরও আনন্দ হবে।

—একটা জিনিস ভাবতে ভাবতে সেটা কি আসে? নাকি সেটা কল্পনা?

মহারাজ : দুইরকম আছে। ভাবছি যেটা—সেটা যদি সত্য হয়, তাহলে সত্য লাভ হয়। আর ভাবছি যেটা—সেটা যদি মিথ্যা হয়, তাহলে আর সত্য লাভ হয় না। সংবাদী ভ্রম আর অসংবাদী ভ্রম। সংবাদী ভ্রম—যাতে ভ্রমের ভেতর দিয়ে বস্তুলাভ হয়। অসংবাদী ভ্রম—যাতে ভ্রম থেকেই যায়, তার আর বস্তুলাভ কিছু হয় না। আমার স্বরূপ বা সত্তা যা, তা মনন করলে সেটার উদ্ভাস বা প্রকাশ হবে। কিন্তু যা আমি নই তা লক্ষ-কোটি বার ভাবলেও তার প্রকাশ ঘটবে না।

—তার মানে চিদানন্দ আছেই সেটা যে বললেন, সেইজন্যে সেটা আরোপ করলে সেটা সত্য অনুভব হবে।

মহারাজ : হ্যাঁ।

—আচ্ছা। তখন তো মহারাজ এটা বিশ্বাস। প্রথম যে আরোপ করা বলছেন সেটা বিশ্বাস।

মহারাজ : প্রথমটা আরোপ, তখন অনুভব হচ্ছে না। এইজন্য আরোপ। তার পরে অনুভব হয়ে যায় তার থেকে।

—প্রথম স্তরে সেটা আমরা বিশ্বাস করি, তাই না মহারাজ?

মহারাজ : বিশ্বাস করতে চেষ্টা করি।

—চিদানন্দ মানে কী হবে?

মহারাজ : চিৎ প্রকাশে আনন্দিত হবে। নিজে আনন্দস্বরূপ হবে। চিদানন্দ হচ্ছে ব্রহ্ম। সৎ-চিৎ-আনন্দ যাকে বলে।

—ঠাকুর ছোট্ট কথায় একেবারে পুরো তত্ত্বকথা বলে দিয়েছেন, চিদানন্দ আছেই। কী সুন্দর করে বলছেন—বেদান্তের কথা।

মহারাজ : না পড়লেও একটু একটু জানতেন তো। ঠাকুর তোমাদের মতো বেদান্তসার পড়েননি। (হাসি)

—অদ্ভুত লাগে। আবার বড় বড় পণ্ডিতরা তর্ক করতেন ঠাকুরের সামনে।

মহারাজ : যখন দেখলে সমস্যার সমাধান হয় না, তখন সবাই আশ্চর্য হয়ে গেল—সত্যিই তো!

—ছোটবেলার কথা বললেন—লাহাবাবুদের বাড়িতে। প্রশ্নটা—সেটা ঐ 'রামকৃষ্ণ ভাগবতম্'—সেইখানে ঘটনাটা দিয়েছে। সেটা উনি কোথা থেকে পেলেন? এই প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন আছে মহারাজ—কী ছিল সেই সমস্যাটা? জানা আছে মহারাজ? প্রশ্নটা শুনেছেন?

মহারাজ : না। আরেকটা কথা বলে, স্বামীজী যে হাতি-নারায়ণ আর মাহুত-নারায়ণের কথা—যে-তত্ত্ব সাতদিন ধরে বুঝিয়েছিলেন তিনি; শুনেছেন যিনি, তিনি হয়তো বুঝেছেন। আমরা কী করে জানব?

—শরৎ মহারাজ লীলাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন যে, এই গল্পটা হরমোহনকে স্বামীজী সাতদিন ধরে বুঝিয়েছিলেন। প্রসঙ্গ হচ্ছিল যে, ঠাকুরের যে-

কোন একটা কথা নিয়ে ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন লেখা যায়। তখন বললেন—এই গল্পটাই ধর না।

মহারাজ : হ্যাঁ, আজকে আবার ভাণ্ডারা আছে।

—হ্যাঁ, মহারাজ। আজকে ভাণ্ডারা আছে। গো— মহারাজ ভাণ্ডারায় এসেছে। আর উত্তরাখণ্ডে শুনি খুব সাধু-ভাণ্ডারা হয়। এই সাধু-ভাণ্ডারায় যাওয়ার সঙ্গে আমাদের সাধুজীবনের বা উপযোগিতার কী সম্পর্ক?

মহারাজ : আনন্দ করা—খেয়েটেয়ে। আর কী করবে!

—শুধু আনন্দ করা, এইরকম ফূর্তি করা?

মহারাজ : যারা ভাণ্ডারা দেয় তাদের পুণ্য হয়।

—আর যারা খান তাঁরা?

মহারাজ : তাদের আনন্দ হয়। (সকলের হাসি) আমাদের মঠে—কনখলে যখন ভাণ্ডারা হয়, সাধুরা খুব আগ্রহ করে আসে। বলে, আরে গোলাপজামুন মিলেগা! গোলাপজামুন মিলেগা! (সকলের হাসি) সাধুদের ভাণ্ডারায় মোটামুটি মিষ্টি হল লাড্ডু। আর এখানে মিষ্টি দেওয়া হয় গোলাপজাম। এইজন্যে তারিফ করে খুব। আরে গোলাপজামুন মিলেগা! (হাসি)

—এই ভাণ্ডারাদিতে সাধুদের সাধন-ভজনের ওপর কি কিছু effect হয়?

মহারাজ : হ্যাঁ, হয়। তমোগুণ বাড়িয়ে দেয়।

—ঠিক আছে মহারাজ। কালকে থেকে হবে। আসছি মহারাজ।

মহারাজ : এস।

॥ ১২৬ ॥

মহারাজ : কী বলছ, কাগজ?

—হ্যাঁ।

মহারাজ : কাকে বলছ, অ—কে? (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : মহারাজ, আমার মনে একটা প্রশ্ন উঠেছিল, এই যে নিবেদিতা গার্লস স্কুল—আপনারা এটা কোথায় দেখেছেন প্রথমে?

মহারাজ : কোথায়—বোসপাড়ায়।

—এখন যেখানে প্রথম বাড়ি করে সারদা মিশন করেছে, সেইখানে? না এর আগে বোসপাড়া লেনে দেখেছিলেন?

মহারাজ : বোসপাড়া লেন। বোসপাড়া লেনে হয়েছে কী, আমার ঠিক মনে নেই। এটা নিয়েও ওদের পত্রিকার মধ্যে অনেক ছবি দিয়ে লিখেছে, অনেক ইতিহাস লিখেছে। তারপর আবার একটা কথা বলেছে যে, ১৯১৪ সালে ভগিনী সুধীরা—তিনি আবার বোর্ডিং করেছিলেন মাতৃমন্দির নাম দিয়ে। সেই সময়েও স্কুল চলছিল। তা সেখানে মা নাকি আবার ছিলেন। উদ্বোধনের বাড়ি তখন হয়ে গেছে। তার পরেও রাধুকে নিয়ে একসময় ছিলেনও নাকি।

—মহারাজ, নিবেদিতা যে-বাড়িতে থাকতেন ওই বাড়িটা Government থেকে acquire করা হচ্ছে। একটা স্মৃতিমন্দির হবে।

মহারাজ : তাই নাকি? তোমরা গিয়ে বসবে নাকি?

—না মহারাজ। ওরা বসবে।

মহারাজ : তোমরা বসবে?

—না, সারদা মিশন।

মহারাজ : তারাই বসবে।

—ওরা তো আবেদন করেছে সব। Acquire করেছে Government থেকে। Proposal নিচ্ছে Government-এর কাছ থেকে। নিবেদিতার ভারতে আসার শতবর্ষ (১৯৯৮) পালিত হচ্ছে। ঐ উপলক্ষে proposal দিচ্ছে যে acquire করা হবে। আর মন্ত্রীও refer করে দিয়েছেন।

মহারাজ : তুমি এক কাজ কর। তোমার একটা শতবর্ষ লাগিয়ে দাও। (সকলের হাসি) অতদিন অপেক্ষা করা যায় না। লাগিয়ে দাও একটা।

—আমরা আপনাকে নিয়ে আপনার শতবর্ষ করব।

মহারাজ : ও। (সকলের হাসি)

—আমাদের age-টা হচ্ছে centenary age। আমরা শুধু centenary দেখে যাচ্ছি। কাজেই আপনারও centenary আমাদের করতে হবে। আবার বলছে বেলুড় মঠের centenary করবে।

মহারাজ : দেখ। আর কত বাড়বে। বিরক্তিকর! (সকলের হাসি)

—যা বলেছেন মহারাজ। অত বেশি করলে হালকা হয়ে যায়। Centenary মানেই তো বক্তৃতা।

মহারাজ : বক্তৃতা কিরকম! তিনদিন চারদিন ধরে বক্তৃতা চলছে। এ লোকে কখনো enjoy করতে পারে? একদিনের বক্তৃতা শুনলে তাতেই ভরে যায়। আবার তিনদিন চারদিন ধরে lecture দিচ্ছে।

—শুধু বক্তৃতা নয় মহারাজ, তারপর এইরকম মধুর কণ্ঠের announcement!

মহারাজ : ও বাবা! (সকলের হাসি) এ তো বাঁড়ুয্যেমশায়ের ব্যাপার। (সকলের হাসি)

—তা বাঁড়ুয্যেমশায় কী বললেন?

মহারাজ : বাঁড়ুয্যেমশায় গান করে। তার গান শুনে কেউ টিঁকতে পারে না। তা সে বলছে, আমি পয়সা দেব। পয়সা দিয়েও কেউ টেঁকে না।

একজন খুব গরিব লোক, খেতে পায় না। সে বাঁড়ুয্যেমশায়কে বলল—আচ্ছা, আমি আপনার গান শুনব। বাঁড়ুয্যেমশায় খুব খুশি। তারপর সে তো একদিন দুদিন শুনে আর পারছে না। এখন কী করবে? তা বলে—আর এজীবন রাখতে পারছি না। গলায় দড়ি দিয়ে মরি গে। তো সে গলায় দড়ি দিয়ে মরতে যাচ্ছে—দড়ি-টড়ি লাগিয়েছে সব। এমন সময় একটা ভূত এসে বলল—কী ব্যাপার? বলে—বাঁড়ুয্যেমশায়ের জন্য আর পারি না। তা ভূতটা বলছে—ভাই, আমারও তাই। (সকলের হাসি) বলল—এক কাজ করি চল, তোমাতে আমাতে একসঙ্গে চলে যাই। গিয়ে অন্য জায়গায় আমরা আসর জমিয়ে বসব। আমি কাউকে ধরব। আর তুমি গেলে ছেড়ে দেব। এতে তোমার পসার হয়ে যাবে। তা সেরকমই করেছে। নানান জায়গায় গেছে, আর ভূতে ধরেছে। এ গেলেই ভূত ছেড়ে গেছে। তা এইভাবে নাম হয়ে গেল—খুব ভাল ওঝা। এখন রাজার সুন্দরী মেয়েকে ঐ ভূতে পেয়েছে। তো রাজা সেই ওঝাকে ডেকেছে। সে গেছে। ভূত বলল—দেখ। তোমাকে নিয়ে তো আমি অনেক ঘুরেছি। তোমার কাজের হিল্লে হয়েছে। এখন যদি আমাকে এখান থেকে যেতে বল আমি কিন্তু তোমার ঘাড় মটকাব। রাজার মেয়েকে ছেড়ে আমি কিছুতেই যাব না। ওদিকে রাজা ওঝাকে বলল—আমার মেয়ের যদি ভূত ছাড়াতে না পার, তাহলে তোমার গলা কেটে দেব। সে ভাবল, এ তো মুশকিল! এদিকে গলা যায়, ওদিকে প্রাণ যায়—কী করব? তারপর সে তো আবার ভূতের কাছে গেছে। ভূত তখন চটে গেছে। বলছে—কেন এসেছ, বল। লোকটা বলছে—দেখ, একটা কথা বলতে এলাম। শুনলাম, নাকি বাঁড়ুয্যেমশায় আসছে। (সকলের উচ্চ হাসি) তখন তো ভূত 'ওরে বাবা' বলে পলায়ন। (সকলের হাসি)

—তাহলে আমাদের বাঁড়ুয্যেমশায় এইসব ভেঙে ফেলবে। (সকলের হাসি)

মহারাজ : আমাদের বাঁড়ুয্যেমশায়। এই বাঁড়ুয্যেমশায়কে দিয়েই তো যত বক্তৃতা-টক্তৃতা করায়। সোজা নাকি?

—গলাটা মাইক দেখে একটু change হয়ে যায়।

মহারাজ : মাইকটা ফেটে যায়? (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : মহারাজ, নিবেদিতা স্কুল বিষয়ে ওঁরা ঐ সময়ের যে-ইতিহাস লিখেছেন, সেখানে একটা খুব বড় কথা আছে। স্বামীজী নিবেদিতাকে বলছেন যে, ঐরকম অদ্বৈতভাবের একটা আশ্রম করতে হবে। একটা হিমালয়ে হবে, আরেকটা এখানটায়। মানে নিবেদিতার স্কুলে।

মহারাজ : তা ওদের এখন আলমোড়াতে হয়ে গেছে। করেছে।

—জোরকদমে এগিয়ে চলেছে।

মহারাজ : হোক না। পায়ে ব্যথা হলে তখন টের পাবে। (সকলের হাসি)

—পায়ে ব্যথাটা কী জিনিস তাই বলছেন।

মহারাজ : এইভাবে শুদ্ধ হয়ে গঙ্গা স্নানটান করে এস, তারপরে এসব ভাব। এমনি এসব বেদবাক্য। তুমি জান না? (সকলের হাসি)

—আমরা গঙ্গাস্নান করে এসেছি।

মহারাজ : সে তো করেছ আগে। তারপরে অশুচি-টুচি হয়ে গেছে। আর একবার গঙ্গাস্নান করে এস।

—আগে গোময় খেতে দিত। এই তো নিবেদিতা কোন বাড়ির মেয়েকে ছুঁয়েছিল বলে বাড়ির ঠাকুমা-দিদিমারা গোবর খাইয়ে দিয়েছিল।

মহারাজ : আগে যারা বিলেতে যেত সমুদ্রপার হয়ে, তাদের গোবর খাইয়ে প্রায়শ্চিত্ত করত। গোবরের সঙ্গে মিষ্টি-টিষ্টি দিত কিনা জানি না। (সকলের হাসি)

—স্বামীজীর ওপরে একটা নতুন বই বেরিয়েছে মহারাজ। Oxford University Press থেকে publish করেছে, ওতে অনেকগুলি প্রবন্ধের সঙ্কলন। তার মধ্যে এখানকার দুজন আমরা চিনলাম। নিমাইসাধন বসুর একটা লেখা আছে। আর তপন রায়চৌধুরী, Oxford-এর Professor। ওঁরও একটা লেখা আছে। কথাটা মনে পড়ল। ওখানে এরকম আছে যে, হিন্দুরা কি স্বামীজীকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিল? যখন স্বামীজী হিন্দুধর্ম প্রচার করতে পাশ্চাত্যে গিয়েছিলেন, তখন তো ওরা প্রতিবাদ করেছিল যে, তিনি সন্ন্যাসী নন— তিনি শূদ্র। তিনি কালাপানি পেরিয়ে গেছেন—এইসব। এখন তো আবার হিন্দুরা বলছে, না, তিনি আমাদের হিন্দুধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন। এইসব বাদ-বিতণ্ডা—এই আর কী। মহারাজ, আসছি।

মহারাজ : এস।

॥ ১২৭ ॥

প্রশ্ন : মঠে যোগ দেওয়ার আগে আপনি কাদের সঙ্গ করতেন, ও সেসব জানতে খুব আগ্রহী।

মহারাজ : জ্ঞান মহারাজ আমাকে খুব প্রভাবিত করেছিলেন। স্বামীজীর শিষ্য জ্ঞান মহারাজ।

প্রশ্ন : মহারাজ! মহাপুরুষ মহারাজের সঙ্গে আপনার অন্তরঙ্গ সম্পর্কের কথা শুনেছি। আপনি কি তাঁর খুবই অন্তরঙ্গ ছিলেন?

মহারাজ : শরৎ মহারাজের চেয়েও বেশি। কারণ, আমি তাঁর সঙ্গ করতাম খুব। শরৎ মহারাজের সঙ্গও অনেক করেছি। কিন্তু তা সাময়িক। শরৎ মহারাজ যখন মঠে আসতেন, শুধু তখনই তাঁর সঙ্গ করার সুযোগ পেতাম।

—মহাপুরুষ মহারাজ ছাড়া আর অন্য কোন সাধুর সান্নিধ্য পেয়েছিলেন?

মহারাজ : এটা খুব কঠিন প্রশ্ন। (হাসি) তাঁর ঠিক পরেই তুমি শরৎ মহারাজকে ধরতে পার।

—সুধীর মহারাজ? শুদ্ধানন্দজী—ওনার সঙ্গে নিশ্চয়ই খুব অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল?

মহারাজ : নিশ্চয়ই। তাঁর সান্নিধ্য ঘনিষ্ঠভাবেই পেয়েছি।

—আর অখণ্ডানন্দজী?

মহারাজ : অখণ্ডানন্দজীর সঙ্গে আমার ততটা অন্তরঙ্গতা ছিল না, কারণ দীর্ঘদিন তাঁর সান্নিধ্যে আসার সুযোগই পাইনি। একমাত্র যখন তিনি বেলুড় মঠে আসতেন তখন তাঁর সান্নিধ্যলাভ করতাম।

—খোকা মহারাজের সঙ্গ তো আপনি করেছিলেন, মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—শ্রীরামকৃষ্ণের পার্ষদরা ছাড়া আর কোন কোন সাধুর সঙ্গ করেছেন?

মহারাজ : শুদ্ধানন্দজীর সঙ্গ করেছি যখন তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট।

—আপনি আত্মানন্দজীর সান্নিধ্য পাননি?

মহারাজ : আত্মানন্দজী সম্পর্কে আমার স্মৃতি খুব অস্পষ্ট—আবছা-আবছা একটা ধারণা।

—কানাই মহারাজ?

মহারাজ : আলোচনাটা কি কেবল কিছু ব্যক্তিদের নিয়ে?

—আলোচনা মানে—ধ্যান। আপনার মুখ থেকে পবিত্র ভাব—

সু—মহারাজ : ধ্যানের বস্তু হচ্ছে পূত জীবন।

মহারাজ : তা, একটি বা দুটি। তার বেশি নয়।

—জগদানন্দজী? তাঁর সঙ্গ পাননি?

মহারাজ : আমরা তাঁকে দেখেছি বটে, তবে দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গ করার খুব একটা সুযোগ হয়নি।

—কিন্তু আপনি তো হিমালয়ে অনেক তপস্যা করেছেন।

মহারাজ : অনেক নয়, মাত্র তিনবছর।

—সেসময়ে সংঘ-বহির্ভূত অন্য কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গ করেছেন?

মহারাজ : আমাদের সংঘের বাইরের কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে।

—কার কথা আপনার সব চাইতে বেশি মনে পড়ে?

মহারাজ : শান্তি আশ্রম নামে একজন ছিলেন। খুব ভাল সাধু।

—সন্ন্যাসীর নাম শান্তি আশ্রম?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—শান্তি আশ্রম একটা সন্ন্যাসী সংঘ—তাই না?

মহারাজ : 'আশ্রম' হল উপাধি। আমরা যেমন পুরী। সেরকম। সাধুটির নাম শান্তি, আর তিনি 'আশ্রম' সম্প্রদায়ভুক্ত। আমি তোমাদের একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

—দিন, মহারাজ।

মহারাজ : একজন নতুন সাধু এল, যে থাকার জন্য একটা কুঠিয়া খুঁজছিল। সে আশ্রম-কে চিনত না। তবু আশ্রম তাকে নিজের কুঠিয়ায় থাকতে দিল। তা সে ভাবল, এখানে তো খুব কষ্ট, কোথাও কিছু নেই। অন্য এক সাধু হঠাৎ তাকে সেখানে দেখতে পেয়ে ভাবল, কী ব্যাপার!

ঐ সাধুটি শান্তি আশ্রমের কুঠিয়াতে ঢুকছে কেন? জিজ্ঞাসা করাতে নতুন সাধুটি জানাল, 'একজন আমাকে এই জায়গাটা দেখিয়ে দিয়েছে। এটা যে শান্তি আশ্রমের কুঠিয়া তা তো জানি না!' কেমন একটা উদাসীন উদাসীন ভাব। সাধুত্বের ভানটা বড় চমৎকার করতে পারত।

—কোন অর্থে ভান?

মহারাজ : ধীরে ধীরে হেঁটে সে খুব দেরি করে ছত্রে পৌঁছাত। ভাল সাধুরা যেখানে দুপুর একটার মধ্যেই ছত্রে পৌঁছে যেত, উদাসী সাধুর সেখানে ছত্রে পৌঁছাতে বেলা গড়িয়ে সন্ধে হয়ে যেত। তার থাকবার কোন নির্দিষ্ট জায়গা ছিল না। সে প্রায়ই রাস্তার ধারে শুয়ে থাকত। আমার কিন্তু তার প্রতি খুব একটা শ্রদ্ধা জাগেনি। সবটাই ভান মনে হতো। কিন্তু শান্তি আশ্রমের কোন ভান ছিল না। সে খুব ভাল সাধু ছিল।

—তার সাথে আপনার কোন কথাবার্তা হয়েছে কখনো?

মহারাজ : কোন কথাবার্তা হয়নি। আসলে সে ছিল মৌনী।

—ওঃ, তাই বুঝি?

মহারাজ : কোন কথাবার্তা হতো না। তবে মাঝে মধ্যে সে—

—কিন্তু শুনেছি তারা নাকি দীর্ঘদিন ধরে এই ব্রত পালন করে না। সত্যিই কি ওরা একটানা কয়েক বছর এই মৌনব্রত পালন করে?

মহারাজ : যখন জিজ্ঞাসা করলাম—আপনার নাম কী? 'শুভ্নাম'? সে বলল, 'নাম তো কুছ্ নেহি হ্যায়। কোই কোই কহতে হ্যায় মৌনীবাবা।' (সকলের হাসি)

—মহারাজ, আপনি যখন উত্তরকাশীতে ছিলেন, তখন কি কৈলাশ মঠে গিয়েছিলেন? মহন্ত কে ছিলেন?

মহারাজ : নাম মনে পড়ছে না। বুড়ো একজন কৈলাশের মহন্ত। তার চেয়ে কোঠারী বেশি প্রভাবশালী। মহন্তের চেয়ে কোঠারী বেশি প্রভাবশালী।

সু—মহারাজ : আর ঐ নাথ সম্প্রদায়ের সাধু?

মহারাজ : চেলা কজন ছিল। তিনজন জানি—ললিত নাথ, শান্তি নাথ, প্রজ্ঞা নাথ। ললিত নাথকে আমি দেখেছি। সে কনখল আশ্রমে আসত। শান্তি নাথকে আমি দেখিনি।

—নাথ সন্ন্যাসীদের বৈশিষ্ট্য কী?

মহারাজ : দেখে মনে হয় তারা ত্যাগের ভাবে পরিপূর্ণ, তারা নিষ্ঠাবান।

—কিন্তু সামগ্রিকভাবে বেদান্তকে কি তারা গ্রহণ করেছে?

মহারাজ : গোঁড়া বৈদান্তিক। কিন্তু বেশির ভাগ সাধুই আমাদের মতো সাধারণ। ভাল কথা বল।

প্রশ্ন : মহারাজ, ভগবানে বিশ্বাস হয় না কেন?

মহারাজ : তাঁকে দেখা যায় না বলে।

—মহারাজ, কথামৃতের একজায়গায় (অখণ্ড, পৃষ্ঠা-৬১২) হাজরামশায় ঠাকুরকে বলছেন—'নরেন্দ্র আবার মোকদ্দমায় পড়েছে।' ঠাকুর বলছেন—'শক্তি মানে না। দেহধারণ করলে শক্তি মানতে হয়।' মহারাজ, প্রশ্ন হল—শক্তি মানা না-মানার সঙ্গে মোকদ্দমার কী সম্পর্ক?

মহারাজ : হুঁ, মানে মোকদ্দমা-সংসারের দুঃখকষ্ট ইত্যাদি শক্তির ব্যাপার—শক্তির এলাকা।

—শক্তি মানলেই যে দুঃখকষ্ট থাকবে না, তা তো নয়—

মহারাজ : তা ঠিক। তবু তাঁকে মানলে, পূজা করলে প্রার্থনা করলে, তিনি দুঃখকষ্ট কমিয়ে দিতে পারেন। তাই ঠাকুর নরেনকে বলেছিলেন—তুই আমার মাকে মানিস না। তাইতো তোর এত কষ্ট। মাকে গিয়ে

বলনা—কিন্তু নরেন্দ্র বলতে পারেনি। তাতে ঠাকুর খুশি হয়েছেন। তিনি তো এরকম নরেন্দ্রকেই চান। ঠুনকো নরেন্দ্রকে চান না। তিনি চান এমন নরেন্দ্রকে যে নরেন্দ্রকে পাথরে আছড়ালেও কিছু হবে না। ঠাকুর বলেছিলেন, আমি কী করব? তোর কপালে সংসারসুখ নেই। নরেন্দ্র মাকে মেনেছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর দুঃখ-যন্ত্রণার লাঘব হয়নি। মাকে না মানার আগে তাঁর ছিল একটিমাত্র পরিবারের দুঃখের ভার। আর মাকে মানার পর তাঁর দুঃখ শত গুণে বেড়ে গেল। তারজন্য সারা সংসারের দুঃখকষ্টই যেন তাঁর নিজের কাঁধে চলে এল। তাঁর চেষ্টা একটিমাত্র পরিবারের দুঃখ-কষ্টের লাঘবে নিয়োজিত হল না। সারা জগতের দুঃখ দূর করাই তাঁর জীবনের ব্রত হয়ে গেল।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর বলছেন, 'শরীরটা কিছুদিন থাকত, লোকদের চৈতন্য হত।' একটু পরে বলছেন, 'তা রাখবে না।... তা রাখবে না,—সরল মূর্খ দেখে পাছে লোকে সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে ধ্যান-জপ নাই।' (কথামৃত—অখণ্ড, পৃষ্ঠা-১১২৪) মহারাজ, তিনি তো দিতেই এসেছেন। তবে তাঁর আশঙ্কার কী আছে?

মহারাজ : পাছে জগৎলীলা না চলে, সব মুক্ত হয়ে যায়—তাই। যা দেবার দিয়ে দিয়েছেন। চৈতন্যদেবও এরকমই বলেছিলেন—চল, আর না ইত্যাদি। তিনিই মুক্ত করছেন আবার তিনিই বন্ধ করছেন।

প্রশ্ন : মহারাজ, একটির পর আরেকটি যোগ alternately করাকেই synthesis বলা হয়, নাকি একটি যোগের মধ্যেই অন্য যোগের element রয়েছে—এরকম ভাবাকেই synthesis of yoga বলা হয়?

মহারাজ : একটার মধ্যে অন্যগুলো রয়েছেই, শুধু ভাবা নয়।

—ঠাকুরের গলায় ব্যথা। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার এসেছেন। তাঁকে ঠাকুর বলছেন—'আমার গলার ব্যথাটা সারিয়ে দাও না, মায়ের নাম করতে পারছি না।' মহেন্দ্রলাল সরকার বললেন—'ধ্যান কর।'

ঠাকুর—'তা কেন? আমি একঘেয়ে হব কেন? আমি কখনো ধ্যান করব, কখনো নাম করব, কখনো পূজা করব ...।' এর মানে ঠাকুর একটার পর আরেকটা alternately করার কথা বলছেন না কি?

মহারাজ : ঠাকুরের ভাব হল, একঘেয়ে কেন হব? বিভিন্নভাবেই তাঁকে আস্বাদ করব। কখনো ধ্যানে কখনো বা অন্যভাবে। ওই যে ধ্যান করতে বসে বলছেন না—ভাবলুম, চোখ বুজলেই তিনি আছেন আর চোখ চাইলে তিনি নেই। মানে, তিনি ভগবানকে ভিতরে-বাইরে, সাকারে-নিরাকারে, রূপে-অরূপে বিভিন্নভাবে আস্বাদ করতে চান।

পূজনীয় রঙ্গনাথানন্দজী একবার T.C.-তে lecture দিলেন। বিষয় ছিল দুটি শ্লোক। একজন একটির উল্লেখ করল, কিন্তু পুরো শ্লোকটা কেউ বলতে পারল না। সেটি মাণ্ডূক্যকারিকা থেকে। মহারাজ বারবার জিজ্ঞেস করলেন কারিকাটি কী? যাইহোক ঐ প্রসঙ্গে মহারাজ বললেন : মাণ্ডূক্যকারিকায় একেবারে চূড়ান্তভাবে সবকিছুকে অস্বীকার করেছে। খুব কঠিন বোঝা। মাইশোরে যখন ছিলাম একবছর মাণ্ডূক্যকারিকা নিয়ে ঘষামাজা করেছি। যাহোক, মহারাজ বললেন—যা থাকে কপালে, মাণ্ডূক্যকারিকাটা নিয়ে এস।

পরদিন কারিকাটা মুখস্থ করে বই সঙ্গে নিয়ে গেলাম। প্রণাম করতেই মহারাজ সঙ্গের বই দুটো লক্ষ করে বললেন—বল, বল, কারিকাটা বল। যেন মহারাজ সেটির জন্যই অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কারিকাটি বললাম। তারপর বই খুলেও

মহারাজের সামনে ধরলাম। মহারাজ পড়ে একটু একটু করে মানে করতে লাগলেন—

তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ।
তত্ত্বীভূতস্তদারামস্তত্ত্বাদপ্রচ্যুতো ভবেৎ।।

(মাণ্ডূক্যোপনিষদ্-কারিকা, ৬৭।৩৮)

আধ্যাত্মিক—মানে এই দেহে। তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা seeing the reality in this body—তত্ত্বং দৃষ্ট্বা বাহ্যতঃ—বাহ্যতঃ মানে outside, outside the body. Seeing or knowing the reality also externally or in the outside তত্ত্বীভূতঃ one who has identified himself with the reality তদারামঃ who enjoys bliss, happiness. তত্ত্বাৎ অপ্রচ্যুতঃ ভবেৎ he should not slip or fall from the reality.

—আচ্ছা মহারাজ, একবার তত্ত্বকে জানার পরও চ্যুত হয় কেন?

মহারাজ : সংস্কারবশে। পূর্বের সংস্কারবশে। একটা দড়ি পড়ে আছে, সেটি সাপ নয়। কিন্তু পূর্বসংস্কারবশে দড়িটাকে সাপ মনে করে চমকে উঠি আমরা। উঠি না?

—মহারাজ, মাণ্ডূক্যকারিকায় এই যে জগৎকে অস্বীকার অর্থাৎ মিথ্যা প্রমাণ করা হচ্ছে—জগতের মিথ্যাত্ব প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মের সত্যত্ব কি প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে?

মহারাজ : হ্যাঁ, হচ্ছে। কোনকিছু মিথ্যা বলা মানে তার একটি আস্পদ আছে, সেটির উপর এই মিথ্যাবস্তুটি রয়েছে, সেই আস্পদটি সত্য। জগৎ মিথ্যা মানে জগতের যে আস্পদ মানে underlying সেটি সেই ব্রহ্ম, সেটি সত্য। রজ্জু সত্য, সেই সত্য-রজ্জুটির উপরই মিথ্যা-সর্প রয়েছে মনে হচ্ছিল। রজ্জু যদি না থাকত তবে সর্পভ্রম হতো না।

—আচ্ছা মহারাজ, সত্য-কারণ থেকে মিথ্যা-কার্য কী করে হওয়া সম্ভব? কারণ যখন সত্য, কার্যও তো সত্যই হওয়া উচিত।

মহারাজ : এটা রামানুজের মত। কারণ তারা জীব ও জগৎকেও নিচ্ছে, ব্রহ্মকেও নিচ্ছে। তাদের ব্রহ্ম জীব-জগৎবিশিষ্ট ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যখন সত্য, জীব-জগৎও সত্য। কিন্তু অদ্বৈতীরা তো সেটা বলবে না। তারা জগৎ যে হয়েছে—সেটাই বলবে না। তাদের মতে, জগৎরূপ যে কার্য তা কারণরূপ ব্রহ্মে কল্পিত। সত্যি সত্যি কার্য ঘটেনি।

—মহারাজ, ঐ যে আরেকটা কারিকায় আছে—

'আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা।' (মাণ্ডূক্যোপনিষদ্-কারিকা, ৩৫। ৬)

মহারাজ : (একটু হেসে) এ কেমন যুক্তি। আদি এবং অন্তে যা নেই তা বর্তমানেও নেই। জগৎটাকে উড়িয়ে দিল।

—মহারাজ, মানে, তিনকালে বর্তমান থাকলেই সেটা সত্য। অর্থাৎ সত্যের সংজ্ঞাটিকে আগে সিদ্ধান্ত করে কারিকাটি তৈরি করেছেন। গৌড়পাদের মাথায় তো রয়েছে যে, যা তিনকালে রয়েছে তাই শুধু সত্য।

মহারাজ : (ঘাড় নাড়ালেন) অর্থাৎ সত্য যদি হয় তবে তার কখনোই অভাব হবে না, সেটি কখনো নেই এরকম হবে না। আবার যা অসৎ তা রয়েছে এরকম হতে পারে না। এটা কিন্তু খুব strong যুক্তি। 'নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।' (গীতা, ২। ১৬)

—মহারাজ, গতকাল কথা হচ্ছিল কোন কিছুকে মিথ্যা হতে গেলে সেটির যেটি আস্পদ বা sub-stratum সেটিকে সত্য হতে হবে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হচ্ছে। রজ্জু সত্য। এখন, রজ্জু জগতের অন্তর্গত। অতএব রজ্জু মিথ্যা, তার (জগতের) আস্পদ ব্রহ্ম সত্য। তাহলে দেখা যাচ্ছে রজ্জু

একবার সত্য এবং আরেকবার মিথ্যা হয়ে যাচ্ছে। মানে মিথ্যা আস্পদের উপরেও ভ্রম হতে পারে। আস্পদ যে সত্য হতে হবে—তা দাঁড়াচ্ছে কোথায়?

মহারাজ : বুঝেছি তোমার যুক্তি। কিন্তু দুটোকে একসঙ্গো মেলালে চলবে না। রজ্জু সত্য in comparison with snake। যখন সাপের সঙ্গো তুলনা করছ তখন রজ্জু সত্য, সর্প মিথ্যা। আর রজ্জু যখন in comparison with Brahman তখন ব্রহ্ম সত্য রজ্জু মিথ্যা। রজ্জুর সত্যতা আপেক্ষিক। Relative রজ্জুর পারমার্থিক সত্যতা নেই। রজ্জুতে যখন সর্পভ্রম হচ্ছে রজ্জু ব্যাবহারিক সত্য, কিন্তু সর্প ব্যাবহারিকভাবেও মিথ্যা। আর পারমার্থিক সত্যতা কেবল ব্রহ্মের আছে।

॥ ১২৮ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, সংঘাধ্যক্ষ হিসেবে সংঘের বিভিন্ন নীতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দুটি দিক সম্পর্কে আপনার ভাবনা কী?

মহারাজ : কে সংঘাধ্যক্ষ?

—আপনি, এই সংঘের সর্বাগ্রগণ্য সদস্য।

মহারাজ : তাতে কী!

—সংঘের ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিক সম্পর্কে আপনার ভাবনাগুলি কী?

মহারাজ : তোমার প্রশ্নগুলি খুব তীক্ষ্ণ।

—না, আমি বিষয়গতভাবে জানতে চাই।

মহারাজ : বিষয়গতভাবে, কিন্তু অন্যেরা ব্যাপারটাকে গুরুতরভাবে দেখবে।

—এতে তাদের উপকারই হবে।

মহারাজ : আগে, শুরুর দিকে সদস্যরা সংঘের সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতেন না। সাংগঠনিক দিকটা খুব প্রকটও ছিল না। তাঁরা বেশি চিন্তা করতেন ব্যক্তিগত সাধনা নিয়ে। তারপরে গুরুত্ব পেত লোকহিত—জগদ্ধিত ইত্যাদি। ওটা আমাদের কাছে গৌণ ছিল। অবশ্যই স্বামীজীকে আমি অন্যদের ভিতর ধরছি না। আমার চোখে এটাই বিশেষভাবে ধরা পড়েছে। আমার পর্যবেক্ষণ ভুল হতে পারে। কিন্তু প্রথমদিকের সদস্যদের আচার-আচরণ সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত মোটের ওপর এটাই।

—পরবর্তী কালে সবাই কি সাংগঠনিক বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন—মানে একটা বিবর্তন বা পরিবর্তন—

মহারাজ : বিবর্তন না পরিবর্তন? না, বিবর্তন না, পরিবর্তনই মনে হয়।

—এবিষয়ে আপনার সিদ্ধান্ত কী?

মহারাজ : এখন আমরা সংগঠন সম্পর্কে অনেক বেশি সচেতন হয়েছি এবং ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক উন্নতি এখন আর আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়—ওটা গৌণ হয়ে যাচ্ছে।

—হ্যাঁ, আধ্যাত্মিক দিকটি—কিন্তু আপনার কী মনে হয় আমরা সত্যি সত্যিই স্বামীজীর ইচ্ছানুসারে কাজ করছি?

মহারাজ : দুটো বিষয়েই স্বামীজীর সমান শ্রদ্ধা ছিল—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—দুটোর প্রতিই; কিন্তু আমরা আজকাল জনপ্রিয়তার দিকে ঝুঁকে পড়েছি, 'জগদ্ধিতায়'-তে আমাদের মনোযোগ অনেক বেশি, 'আত্মনো মোক্ষ'-র দিকে ততখানি নয়। স্বামীজী দুটোকে সমান গুরুত্ব দিতেন।

—কিন্তু মহারাজ, দেশের কয়েকটি মাত্র বিশেষ অংশেই রামকৃষ্ণ-আন্দোলন সীমাবদ্ধ থেকে গেছে বলে আপনার যে-অভিমত, তার কারণ কী? বিশেষত ভারতবর্ষে?

মহারাজ : বিশেষত?

—এদেশের কয়েকটি অংশবিশেষে মাত্র। আন্দোলনটি এদেশের সর্বত্র বিস্তারলাভ করেনি।

মহারাজ : এদেশে আমরা আরো বিস্তৃতভাবে প্রসারলাভ করতে পারি। অন্য দেশগুলির কথা আমি জানি না। কিন্তু এদেশের বিভিন্ন অংশ সম্পর্কে আমার যা অভিজ্ঞতা, তাতে মনে হয় লোকের কাছে আমরা আরো বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠছি।

—কিন্তু তা তো দেশের কয়েকটি অংশে মাত্র। বিরাট উত্তর-পূর্ব ভারতের হিন্দু-বলয় আর রায়পুর অঞ্চল বাদ দিলে, এটা বোধগম্য হয় না। আন্দোলনটা খুব একটা বেড়ে উঠছে না। মানুষ স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে বা তাঁর গুরু রামকৃষ্ণ পরমহংস সম্পর্কেও হয়তো-বা কিছু জানে; কিন্তু গভীরভাবে এই আন্দোলন বেড়ে উঠছে না।

মহারাজ : মোটের ওপর মানুষের দুটো ভাগ আছে—একভাগ বিবেকানন্দকে জানে, অন্য ভাগ জানে রামকৃষ্ণকে। কিন্তু দুজন সম্পর্কেই জানে এমন মানুষ খুব কম, সব জায়গায় প্রায় দেখা যায় না। আমাদের আধুনিক প্রজন্ম বিবেকানন্দকে নিয়ে মেতে আছে, আমাদের আগের প্রজন্ম শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়েই ভাবত বেশি। আমার এই মনে হয়। আমার এই সিদ্ধান্তটায় পক্ষপাতিত্ব থাকতে পারে। আমি আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গি আর সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ধরতে পারছি না। তাছাড়া অতীত ও বর্তমানের দুটি দৃষ্টিভঙ্গির ভারসাম্য বজায় রাখাও কঠিন।

—মহারাজ, ২৭ বছর আগে আমি প্রায় একই প্রশ্ন প্রভু মহারাজকে করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন যে, স্বামীজীর ছকে দেওয়া পথেই আমরা চলেছি, কিন্তু আমরা একটা ভুল করে ফেলেছি।

মহারাজ : তাই নাকি?

—হ্যাঁ। তিনি বলেছিলেন যে, একটা সাধারণ ভুল করে ফেলেছি আমরা। ভুলটা প্রধানত হল, আমরা মধ্যবিত্তের দিকে মনোযোগ দিয়েছি, অথচ স্বামীজী চেয়েছিলেন আমরা দরিদ্রদের জন্য কাজ করি। এবং তিনি আশা করেছিলেন পরবর্তী প্রজন্ম এই ত্রুটি দূর করবে।

মহারাজ : আমরা যে শুধু সমাজের নিম্নস্তরের অবহেলাই করেছি তা নয়, বিশেষ কিছু তাদের জন্য করিওনি। আমরা মধ্যবিত্তের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়েছি; আর উচ্চবিত্তরা হয়েছে আমাদের অর্থের যোগানদার।

—এতে ভুল কোথায়? তাদের তো অর্থ দিতেই হবে। এটা ঠিক আছে।

মহারাজ : ঠিক নেই।

—কেন নয়, মহারাজ?

মহারাজ : স্বামীজীর হৃদয় পদদলিতদের জন্য রক্তাক্ত হতো।

—না, মানে—কিন্তু টাকাটা তো আসতে হবে! কোত্থেকে আসবে? টাকা আসবে বড়লোকদের কাছ থেকে।

মহারাজ : তাতে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু দুধের জন্য গাভীকে যদি খাওয়াতে চেষ্টা করি তাহলে খাওয়ানোর চেয়ে দুধটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। এজন্যই সেসমস্ত আলোচনা, যাতে আমাদের মধ্যে যারা নবীন তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার হয়।

—এ তো ভাল মহারাজ, এসব তাদের ভাবতে সাহায্য করবে।

মহারাজ : দৃষ্টিভঙ্গির অবনতি নিয়ে বলতে গেলে একটা কথা মনে পড়ে। কেউ একজন বলত, বাইরের কাজে খুব বেশি জড়িয়ে গেলে তা দৃষ্টিভঙ্গির অবনতি ঘটায়। এভাবে আমরা অনেককে হারিয়েছি। প্রভু মহারাজ বলেছেন, এটা খুব বেশি নয়। যদি এটি অনেককে সাহায্য

করে, আর তার জন্য সামান্য কজনকে হারাতে হয়, তাহলে মোটের ওপর এটি গ্রহণীয়।

—হ্যাঁ, তা সত্য। কিন্তু ভারসাম্য রাখতে হবে তো! বড়দের দায়িত্ব হল এই ভারসাম্য তৈরি করে দেওয়া।

মহারাজ : সন্ন্যাসী ভাইদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তিগত, ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয়। প্রভু মহারাজ ব্যক্তিনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কথা বলতেন। বহুজনহিতায়—এর মধ্যে যে ত্যাগের ভাব তাকেই তিনি গ্রহণীয় বলতেন। আমরা তাঁর সাথে একমত হচ্ছি কিনা, সেটা অন্য কথা।

॥ ১২৯ ॥

মহারাজ : কুম্ভস্নান চলছে। অনেক লোক মারা গেছে।

—ওসবে বাহ্য আড়ম্বরটাই বেশি। বাহ্য আড়ম্বর—

মহারাজ : আড়ম্বর মানে কী জানি না। হৈহৈ আর ভিড়ে একেবারে চেপটে যাওয়া—এইরকম হয়। সব জায়গায় হয়। হজেতে এইরকম কত লোক মারা গেল।

—তা শুনলাম বেশি না, ১৮০ জন।

মহারাজ : মারা গেছে। ও বেশি ছিল না! তোমার তৃপ্তি হল না?

—সত্যি। সাধুরা পঙ্গাতে বলছে, আমরা দেখেছি ১৮০ জন। তবে এখানের সাধুরা গঙ্গায় স্নান করে নিয়েছেন সকালবেলায়।

মহারাজ : তুমি করেছ কিনা?

—হ্যাঁ। আমি করেছি।

মহারাজ : করেছ? সেটা বলছে না। (সকলের হাসি) সেটা বলছে না, অপরে করেছে—সেটা বলছে। কিন্তু কটার সময় স্নান করেছ?

—সে তো অত মনে নেই। ওদিকে আমার—

মহারাজ : তাহলে কী হল, ঘোড়ার ডিম?

—মহারাজ এত যোগ-টোগ দেখে, সময়-ক্ষণ দেখে এত আড়ম্বরে স্নানাদি করা—এর কিছু তাৎপর্য আছে তো, না কি?

মহারাজ : এসব পাঁজিতে লেখা আছে।

—তা তো আছে। সে সকলে মানছে তো?

মহারাজ : সকলে মানে না। প্রথম কথা হচ্ছে, আমরাই মানি না তো, সকলে কী মানবে?

—যাক। আঙুরফল টক। মহারাজ, গরম পড়েছে। সকালবেলায় গঙ্গা-স্নান করে নিয়েছে জ— মহারাজ। এইটা একটা কাজের কাজ করেছে।

মহারাজ : গঙ্গাস্নান করে কেন জান? পাপ সব ধোবার জন্যে। এত পাপ গায়ে লাগিয়ে রেখেছে কেন?

—এর কী জানি? এসব জানি না। সাধুরা করছেন, আমরাও করলাম।

মহারাজ : সাধুরা কারা? সাধুরা—পাপী সাধুরা? (হাসি)

—না, না। তা কেন? সাধুরা কি কখনো পাপী হয় মহারাজ? সাধু মানেই তো সজ্জন ব্যক্তি।

মহারাজ : তাহলে যোগ্য ব্যক্তি?

—আপনাকে একবার একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, কে একজন মহারাজ—আপনি গঙ্গাস্নান কেন করেন?

মহারাজ : কত গঙ্গায় স্নান করেছি। একবার গোবর মেখে, একবার মাটি মেখে। (হাসি)

—বেলুড় মঠের গঙ্গাস্নানের একটা বিশেষত্ব আছে। জোয়ারের সময় এদিকে যায়, ভাঁটার সময় ওদিকে যায়। এর জল বিশেষ জল।

মহারাজ : বাবা! এসব শুনিনি কখনো। ভবিষ্যপুরাণের কথা। এসব ভবিষ্যপুরাণের কথা! (সকলের হাসি) একবার, আমি তখন ছোট। তা বলাবলি করছে—গঙ্গায় স্নান কেন করে? তা, আমি বলছি গঙ্গায় স্নান করলে পৈতে স্নিগ্ধ হয়। এইরকম সব বলছি। আর দুজন লোক যাচ্ছিল বয়স্ক—বুড়ো। তা বলছে, বাব্বা! এর মধ্যে এত জানে। (সকলের উচ্চ হাসি)

—মহারাজ, আর কিছু বলেনি?

মহারাজ : ছেলেবেলায় অনেক কাণ্ড করেছি। এখন ভবনদীর পারে এসে বেড়াল বসেছে নাম নিতে।

—বেড়াল নাম নিচ্ছে কী মহারাজ?

মহারাজ : লক্ষ্মী হয়ে পক্ষীর মাংস ছেলেবেলায় খায়নি, এখন ভবনদীর কুলে এসে বেড়াল বসেছে নাম নিতে। (সকলের হাসি) আমাদের একজন—আমি বেলুড় মঠে যাই, সে জানে। তা বলে, বেলুড় মঠ কী করে চেনা যায় জান? একদিকে পালকের পাহাড়, আরেকদিকে হাড়ের পাহাড়! এই হচ্ছে বেলুড় মঠ!

—তখনো এইরকম বলত?

মহারাজ : তখনই এইরকম, এখন অতটা বলে না।

—মহারাজ, ভাণ্ডারা আগে বেশি হতো, না এখন বেশি হয়?

মহারাজ : এখন বেশি হয়। পক্ষীর মাংস মানে মুরগী। (মহারাজের হাসি)

—গৌহাটির মহারাজ বলেন—সীতাপতি বিহঙ্গা।

মহারাজ : সীতাপতি বিহঙ্গা। মানে, রামপাখি।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমাদের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে কেন?

মহারাজ : আমাদের নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলে না। যে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী সে গৃহেই থাকে, সন্ন্যাস নেয় না। সে গুরুগৃহে বাস করে গুরুসেবা করে। গুরুর অদর্শনে গুরুপত্নীর সেবা করে। গুরুপত্নীর অদর্শনে গুরুপুত্রের এবং গুরুপুত্রের অদর্শনে গুরুগৃহের অগ্নির সেবা করে। সে সন্ন্যাস নেয় না। আমাদের ব্রহ্মচর্য সন্ন্যাসেরই একটা preparatory stage।

—মহারাজ, ব্রহ্মচর্যমন্ত্রগুলি কি রোজ পাঠ করা অত্যাবশ্যক?

মহারাজ : না, সেরকম কিছু নিয়ম নেই। করতেই হবে এরকম compulsion নেই। তবে করতে পারলে ভাল। আর পাঠ যেন গতানুগতিক routine না হয়ে যায়। পাঠের উদ্দেশ্য মন্ত্রার্থগুলি স্মরণে রাখা এবং সেই অনুযায়ী নিজের দৈনন্দিন জীবনকে regulate করা।

—মহারাজ, প্রত্যেকটি ব্রহ্মচর্যমন্ত্রের পরে একটি আহুতিপ্রদান মন্ত্র রয়েছে। প্রত্যেকটি ব্রহ্মচর্যমন্ত্রের সঙ্গে সেই সেই আহুতিপ্রদান মন্ত্র কি সম্পর্কিত?

মহারাজ : না, সেরকম কিছু না। ১২টা মন্ত্রের সাথে ১২টা আহুতি প্রদান মন্ত্র। ব্রহ্মচর্যমন্ত্রের কোন একটির সঙ্গে বিশেষ একটি আহুতিপ্রদান মন্ত্রের সেরকম ধরাবাঁধা সম্পর্ক নেই।

—মহারাজ, একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে, '... মিথ্যাকল্পনাদিকং ... বর্জনীয়াঃ'। মিথ্যাকল্পনা বলতে কী বোঝাচ্ছে?

মহারাজ : এই রাজা হব, উজির হব এইসব। Practical হতে হবে।

—মহারাজ, অপর একটি মন্ত্রে বলা হয়েছে : পরচর্চা থেকে আত্মচর্চা খুব লাভকরী। এখানে আত্মচর্চা মানে কি আত্ম-ব্রহ্ম এসব চিন্তা?

মহারাজ : না, আত্মচিন্তা মানে এখানে নিজের চিন্তা। পরচর্চার বিপরীত আত্মচর্চা।

—মহারাজ, এই যে অগ্নিসাক্ষী করে আমরা ব্রহ্মচর্যব্রতগুলি পালন করব বলে সংকল্প করলাম এখন যদি ঠিক ঠিক সেগুলি পালন করতে না পারি তাতে প্রত্যবায় হবে না?

মহারাজ : হবে। সেইজন্যই তো বলেছি যে, এই যে ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করলে এটাকে সহজভাবে নেবে না, seriously গ্রহণ করবার চেষ্টা করবে। নিজের যতটুকু সাধ্য চেষ্টা করে যেতে হবে। তাই মন্ত্রগুলোতে রয়েছে—যতিষ্যে, মানে চেষ্টা করব। যথাসাধং যতিষ্যে—যথাসাধ্য চেষ্টা করব ইত্যাদি।

প্রশ্ন : এখন মঠ থেকেই তীর্থে যাবার টাকা দেওয়া হয়, কারো কাছে হাত পাততে না হয়।

মহারাজ : টাকা হয়েছে তাই দেওয়া হয়।

—এমনকী হয়তো কনখল যাবে, গেল রাজধানী express-এ দিল্লি, তারপর ওখান থেকে হরিদ্বার।

মহারাজ : তবে? এখন অধিকাংশই তীর্থে বা তপস্যায় গেলে আগে থেকে সব সুবন্দোবস্ত করে বা সুবন্দোবস্ত হবে জেনে যেতে চায়, নতুবা যায় না। এমনকী ঘুরে এসেও টাকা বেঁচে হাতে থাকে।

—মহারাজ, এরকম কি বৈরাগ্য কমের জন্য হয়?

মহারাজ : তাছাড়া আর কী?

—মহারাজ, বৈরাগ্য কীভাবে বজায় থাকে বা বাড়ানো যায়?

মহারাজ : বিচারের দ্বারা।

—সেইরকম জীবন না দেখলে কী হয়?

মহারাজ : কেন? এটা (নিজের হাত দিয়ে মাথাটা দেখিয়ে) কি নেই? যদি বিচার করা যায় কেন এসেছি, জীবনের উদ্দেশ্য কী—এই aspiration যদি থাকে তাহলে ওসব ঠিক থাকে।

একবার মাধবানন্দজীর কোথা থেকে ফেরবার কথা। Station-এ গেছি receive করতে। First class, second class compartment-গুলোর দিকে হন্যে হয়ে খুঁজছি। দেখি শতরঞ্চি দিয়ে মোড়া bedding বগলে করে third class একটা compartment থেকে নামছেন। সম্ভবত তিনি তখন General Secretary। এও তো দেখেছি।

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনারা ছুটি দিলেই তপস্যায় বেরোব। একেবারে ready আছি। কিন্তু ছাড়ছে কোথায়?

মহারাজ : তাহলে শোন। আমি তখন রাজকোটে। আমার একজন worker তপস্যায় যাবে, ছুটি চাইলে। ছুটি দিলুম। টাকা দিলুম। উৎসাহ দিলুম। যাওয়ার কথা ঋষিকেশ বা অন্য কোথাও ঠিক মনে নেই। শুনলুম, সে মায়াবতী গেছে। মায়াবতী যাবে সে কথা আমাকে বলেনি। শুনে বিরক্ত হলুম। মায়াবতীতে লিখলুম, সে যে ওখানে গেছে আমি তাকে পাঠাইনি। লিখলুম কেন, নয়তো ওরা ভাববে আমি পাঠিয়েছি। চিঠি পৌঁছানোর পর সে মায়াবতী পৌঁছোয়। ওখানকার মোহন্ত ধুলোপায়েই ওকে ওখান থেকে বিদায় দেয়। এটা শুনে আমার খুব খারাপ লেগেছিল। শাস্তিটা একটু বেশিই হয়েছিল। আমার এ-উদ্দেশ্য ছিল না। তারও মনে খুব লেগেছিল। তখনি সে স্থির করে একদিন না একদিন মায়াবতীর worker হয়ে আসবে। পরে হয়েওছিল ওখানকার worker। (সকলের হাসি)

॥ ১৩০ ॥

প্রশ্ন : সকালবেলা কথা হচ্ছিল—এটা কি ১৪০৪ না ১৪০৫? বলছে, ১৪০৫ শুরু হল।

মহারাজ : তবে ১৪০৫-এর চেয়ে ১৯৯৮-টা বেশি পরিচিত।

—কারণ আমাদের কাজকর্ম সব ইংরেজি মতে হচ্ছে কিনা!

মহারাজ : আজ নববর্ষ। হালখাতা করে। কেউ কেউ আমাকে দিয়ে খাতা ছুঁইয়ে নিয়ে গেছে। শুদ্ধ (মহারাজ)! হালখাতা করেছ?

—মহারাজ, সেইভাবে ডাকুন। আসল ডাকটা দিন।

মহারাজ : অ-শুদ্ধ! (সকলের হাসি) হালখাতা করেছ? (শুদ্ধ মহারাজ না-সূচক ঘাড় নাড়লেন) সে কী কথা!

—মহারাজ, এ-বাড়িতে যখন অফিস ছিল, শুদ্ধ মহারাজের সিন্দুকটা আপনার ঘরে থাকত।

মহারাজ : চাবিকাঠিটা কিন্তু ওর কাছে থাকত। (সকলের হাসি)

—একবার যোগোদ্যানে ডাকাতি হয়েছিল। আপনি তখন ছিলেন না।

মহারাজ : ডাকাতি হয়নি। চুরি হয়েছিল। ডাকাতি বলব না, চুরি।

—টাকা নিয়ে চলে গেছে।

মহারাজ : তা নিয়ে গেছে। আরও ছিল, সব নিয়ে যেতে পারেনি। সময় পায়নি। তারপর আবার যা নিয়ে গেছে, একজন ভক্ত সব পূরণ করে দিয়েছে। (হাসি) ভক্তরা বলছিল—প্রভুর কী মহিমা! একজন নিয়ে গেল। আরেকজন ভরে দিল!

—চোরেরা যদি এটা শুনতে পায়, তাহলে আরো উৎসাহ বোধ করবে।

মহারাজ : আরো আসবে। (সকলের হাসি) কত নিবি নে। কত নিবি নে। একজন কুয়ায় স্নান করছে। তা, বালতিটা হাত থেকে পড়ে গেছে জল তুলতে গিয়ে। চটে গিয়ে যা পাচ্ছে বাসন-কোসন কুয়ায় ফেলছে আর বলছে—কত খাবি খা। (সকলের হাসি)

—মানে রেগে গেছে। এখন রাগের চোটে সব দিয়ে দিচ্ছে ওর মধ্যে।

মহারাজ : যা পাচ্ছে ফেলছে, আর বলছে—খা, কত খাবি খা। (হাসি)

—এইরকম বোকা সে!

মহারাজ : বোকা নয়; রাগেতে। সেই রাগের গল্প জান না?

—কী মহারাজ, রাগের গল্প?

মহারাজ : বাঙালকে খ্যাপায়—বাঙাল চিংড়ি মাছের কাঙাল। তা একজন ঐরকম খেপিয়েছে। সে তাকে ধরেছে, মেরেছে। মেরে মাটিতে পুঁতে দিয়েছে। তবু রাগ যায়নি। তা যখনই যায় সেখানে, লাথি মারে আর বলে—হালার পুত হালা, কও—বাঙাল চিংড়ি মাছের কাঙাল। কও। (সকলের হাসি)

—মেরে পুঁতে দিয়ে লাথি মারছে আর বলছে, কও! এটাই ঠিক ঠিক রাগ।

মহারাজ : বরিশালের গল্প আছে—ছেলে কোথাও কাজ করে, সে এসেছে। মা ভাত বাড়ছে তার জন্য—খেতে দেবে। ভাত বাড়তে বাড়তে মা বলেছে—ওরে, অমুকে আমারে গাল দিয়া গেছে। আচ্ছা, তুমি ভাত বাড়, আমি আইতাছি। বলে, রামদাটা নিয়ে তার গলাটা কেটে ফিরে এসে বলে—দাও, এখন ভাত দাও।

।। ১৩১ ।।

প্রশ্ন : আপনার তো মহারাজ কৈলাস যাওয়া হয়নি?

মহারাজ : কৈলাস যাইনি। তবে ছেলেবেলা থেকে শিবের পুজো করেছি। শিব যেখানে থাকে সেখানেই তো কৈলাস।

—তাই তো বটে, মহারাজ।

মহারাজ : তবে?

—শিবের স্থান মানেই কৈলাস। ঠাকুরও বলেছেন যে, যেখানেই থাকি না কেন, আমি ভাবি রামের অযোধ্যাতেই আছি।

মহারাজ : বাঃ! রামের অযোধ্যা ছাড়া অন্য অযোধ্যা আছে নাকি?

—সেটি অনুবাদ মাত্র। সেই কথাই বলা হচ্ছে।

মহারাজ : কীরকম রামের অযোধ্যা—অযোধ্যা থেকে ১৪ বছর বনবাসে যেতে হল। তারপর ছেলেবেলাতে বিশ্বামিত্র নিয়ে গেল রাক্ষস বধ করবার জন্য। তারপরে বুড়ো বয়সে জলে ডুবে মরতে হল। (সকলের হাসি)

—ভগবান হয়েও নিস্তার নেই।

মহারাজ : ভগবান—

—হয়েও নিস্তার নেই। সেই বনবাস করতে হল। আবার সরযূর জলে—

মহারাজ : তোমার যেমন আচার্য হয়েও নিস্তার নেই। (সকলের হাসি)

—সত্যি নেই। আমাদের তো ছুটি নেই মহারাজ।

মহারাজ : আচ্ছা গোবিন্দ কোথায় যেন আছে?

—এই তো। গোবিন্দ দর্শন দিন।

মহারাজ : গোবিন্দ তুমি—কবে যাওয়ার কথা ছিল?

—দুপুরে মহারাজ।

মহারাজ : আজকে দুপুরে?

—আজ্ঞে, মহারাজ।

মহারাজ : কেন? আর কোন ভাণ্ডারা নেই? (সকলের হাসি)

—কপাল চুলকানো আর প্রণাম করা—দুটোই একসাথে হয়েছে। ব্যাঙ্কে কাজ ছিল। আর Headquarters-এও কাজ ছিল। দুটো একসঙ্গে হয়ে গেল।

মহারাজ : ব্যাঙ্ক বলছ? আমি শুনছি ব্যাঙ। ব্যাঙ্কে চিঠি দিয়ে এলে?

—এখানে account খোলা হল। United Bank বেলুড় branch-এ account খোলা হল।

মহারাজ : ও, তা অনেক টাকা নাকি!

—না মহারাজ, এই যে কলকাতা থেকে টাকা আনছি—তা, পথে একবার মার গেছে।

মহারাজ : টাকাতে মৃত্যু আনে। ঠাকুর সাধে কী আর বলছেন—কামিনী আর কাঞ্চন?

—মা বলেছেন, চাকি কী না করতে পারে!

মহারাজ : চাকি?

—টাকা, রূপোর টাকা আর কী।

মহারাজ : একটা ভাল কথা বল না।

প্রশ্ন : রামপ্রসাদের গানে আছে, 'দেহ বেচে ভবের হাটে দুর্গা নাম কিনে এনেছি'—এর মানেটা কী মহারাজ?

মহারাজ : দেহ ধারণ করেছি দুর্গা নাম করবার জন্য।

—ও। দেহ বেচে মানে দেহ ধারণ করেছি। আরেকটা প্রশ্ন মহারাজ।

মহারাজ : বল।

প্রশ্ন : স্বামীজী যে দুপুরবেলায় দুঘণ্টা বিশ্রামের কথা বলেছেন—এই বিশ্রামটা কি ঘুমানো, নাকি অন্য কিছু?

মহারাজ : যে যেমন জানে।

—না, অফিসটা এইজন্যে বন্ধ থাকে, নাকি সত্যি ঘুমের জন্য বা অন্য কিছু?

মহারাজ : আগে এত অফিস-টফিস ছিল না।

—আচ্ছা। অনেকের এইটা জিজ্ঞাসা আছে। ও, তাহলে উনি ঘুমানোর কথা বলেননি।

মহারাজ : স্বামীজীর সময়েতে অফিস ছিল না।

—বিশ্রাম বলতে? দুঘণ্টা বিশ্রাম—একথা তো স্বামীজী বলেছেন।

মহারাজ : বিশ্রাম—মানে শ্রম না করা।

—ঘুম নয়?

মহারাজ : শ্রম না করা।

—সে তো বিশ্রাম—মানে, ঘুমানোর কথা বলেননি।

মহারাজ : কারো কারো ঘুমাতেও শ্রম লাগে। (হাসি) যখন ঘুম হয় না, তখন কী করবে? যাকগে, তুমি ভাল কথা বল।

—এইটা একজন জিজ্ঞেস করল বলবার জন্য যে, বিশ্রাম অর্থে স্বামীজী ঘুমাতে বারণ করেছেন, নাকি ঘুমের কথা বলেছেন?

মহারাজ : দুঘণ্টার জায়গায় যদি তিন ঘণ্টা হয়, তাতেই বা দোষ কী?

—কিন্তু মহারাজ, স্বামীজী বাবুরাম মহারাজকে বকছেন যে, সন্ন্যাসীর আবার দিবানিদ্রা কী? আবার এদিকে rules বইতে বলছেন দুঘণ্টা বিশ্রাম।

মহারাজ : 'দিবা মা স্বাপ্সী'—দিনের বেলায় ঘুমাবে না—এই কথা আছে ব্রহ্মচারীদের জন্য। সাধুদের জন্য নয়। (সাধুদের হাসি)

—কিন্তু স্বামীজী বাবুরাম মহারাজকে বকছেন।

মহারাজ : তা বকেছেন।

—আর এইখানে আবার বলে দিচ্ছেন—দুঘণ্টা বিশ্রাম। এ তো বিরোধ হয়ে যায়।

মহারাজ : স্বামীজীর ঘুম হতো না। তার জন্য এইরকম করেছেন। (হাসি)

—স্বামীজী ঘুমাতেন না। স্বামীজী তো নিজেরটা নিজে বলবেন। তা আমাদের জন্যে বলবেন কেন এরকম? আমাদের তো ঘুম হয়।

মহারাজ : তা, তাহলে অন্যায় করেছেন। (সকলের হাসি) ওখানে দুঘণ্টা limit করে দিয়ে বিপদ করেছেন। ধর, আসমুদ্র। মানে সমুদ্র অবধি কি? নাকি, সমুদ্রকে ছাড়িয়ে যাবে?

ঈষদর্থে ক্রিয়াযোগে মর্যাদাভিবিধৌ চ যঃ।
এতমাতং ঙিতং বিদ্যাদ্ বাক্যস্মরণয়োরঙিৎ।।

অর্থাৎ, মর্যাদা বা সীমা, অভিবিধি বা ব্যাপ্তি এবং ঈষদর্থ বুঝালে কিংবা ক্রিয়ার সঙ্গে যোগ হলে, অব্যয় আ-কারের সন্ধি হয়।

—আপনার এখনো মুখস্থ আছে! সূত্র মুখস্থ বলে দিলেন!

মহারাজ : একসময় করেছিলাম। এসমস্ত এখন আর দরকার লাগে না।

—সেইটাই তো বলে দিচ্ছেন পটাপট।

মহারাজ : মাথায় যে ঢুকে আছে। এগুলোকে তো বিদায় করা যায় না।

—শ্লোক আছে বিদ্ ধাতুর কী অর্থ হয়। বিদ্ ধাতু—

মহারাজ : বেত্তি বেদ বিদ জ্ঞানে, বিন্তে বিদ বিচারণে।
বিদ্যতে বিদ সত্তায়াং, লাভে বিন্দতি বিন্দতে।।

আত্মা শব্দেরও ভারী সুন্দর ব্যাখ্যা আছে।

—কী মহারাজ?

মহারাজ : যদাপ্নোতি যদামদত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ।
যস্মাত্তি বিশ্বতো ভাবো তস্মাৎ আত্মা ইতি কথ্যতে।।

এতগুলো আত্মার মানে। আত্মা শব্দের এতগুলো অর্থ।

—মহারাজ, আজ এই পর্যন্ত থাক।

মহারাজ : এস।

॥ ১৩২ ॥

প্রশ্ন : সনাতন হিন্দুধর্ম কেন বলে?

মহারাজ : সনাতন মানে সর্বদা যা আছে। হিন্দুধর্ম বেদের ওপর নির্ভর করে। বেদকে আবার নিত্য বলে।

—বেদের ওপরে হিন্দুধর্ম নির্ভর করে। বেদ নিত্য। সেইজন্য এইটিও নিত্য বা সনাতন? বেদ নিত্য হয় কী করে? আমরা তো জানি, ঈশ্বর বা ব্রহ্ম নিত্য।

মহারাজ : ব্রহ্মই বেদ।

—ব্রহ্মই বেদ?

মহারাজ : হুঁ।

—আমরা তো দেখতে পাচ্ছি বেদ হল শব্দ।

মহারাজ : শব্দমাত্র বেদ নয়। শব্দ যখন আছে, তার প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু আছে তো।

—আজ্ঞে।

মহারাজ : সেই প্রতিপাদ্য বস্তু নিত্য।

—প্রতিপাদ্য বস্তুটি নিত্য। তার নাম বা শব্দ তো নিত্য হতে পারে না।

মহারাজ : না। শব্দ নিত্য নয়। কিন্তু 'যথাপূর্বমকল্পয়েৎ'। বেদ জ্ঞানরাশি—ভগবান যখন সৃষ্টি-কর্তৃত্ব করেন, তখন নামরূপের ওপর বেদের আবির্ভাব হয়। সেই বেদ নতুন সৃষ্টি হল না। পূর্ব পূর্ব কল্প অনুসারে সেই জ্ঞান ঈশ্বরের হৃদয়েতে প্রতিফলিত হয়।

—কল্প কল্প ধরে একই বেদ রয়েছে। সেইজন্য কি তা নিত্য?

মহারাজ : হ্যাঁ। আর এই হল Orthodox-দের মত। আর Rational-দের মত হল—বেদ হচ্ছে অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশি।

—অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশি। মহারাজ, জ্ঞান কি এরকম অনন্ত হয়? না, এক অনাদি—

মহারাজ : জ্ঞান দুরকম। একরকম জ্ঞান হয় বিষয়-ইন্দ্রিয় সংস্পর্শজন্য। এটি অনিত্য জ্ঞান। আর যে-জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ, সে-জ্ঞান নিত্যজ্ঞান।

—এইজন্যই তো আমরা বলি যে, ব্রহ্মের যে-জ্ঞান—

মহারাজ : জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম।

—জ্ঞানস্বরূপ তিনি। সেটিই নিত্য। আর স্বামীজী একজায়গায় বলেছেন, বেদে শাশ্বত তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে, সেজন্য বেদ শাশ্বত বা নিত্য।

মহারাজ : কিন্তু ঐ তো বললাম, জ্ঞানরাশি। বেদে বলা হয়েছে, বেদ এখানে গ্রন্থ নয়। জ্ঞানরাশি।

—আর মহারাজ, এরকম আপেক্ষিকভাবে বলা যেতে পারে যে, এই হিন্দু-ধর্ম বহু বহু যুগ ধরে আছে?

মহারাজ : বহু যুগ ধরে থাকলেও সে তো সনাতন হয় না। তবে সকল ধর্মের ভেতরেই কিছু আছে যেটা সনাতন। Prophet-রা হল তার বক্তা। 'স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।' (গীতা, ৪।৩)

—এখন আমরা এইটি বুঝতে পারছি যে, সনাতন হিন্দুধর্ম বলতে যে হিন্দুধর্ম বেদের ওপর নির্ভর করছে। বেদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আর বেদ শাশ্বত সত্যের কথা বলে থাকে। সেইজন্য হিন্দুধর্ম সনাতন। এই যুক্তিটাই আসল।

মহারাজ : বেদ অনেক কথাই বলে। শুধু শাশ্বত তত্ত্বের কথা বলে না। যাগ-যজ্ঞের কথাও বলে, সেগুলো শাশ্বত নয়।

—কিন্তু পরম্পরাক্রমে ওরা তো ব্রহ্মতেই তাৎপর্য বলে ব্যাখ্যা করে।

মহারাজ : ব্রহ্মেতে তাৎপর্য মানে—যাগ-যজ্ঞ, তার তো তাৎপর্য ব্রহ্মেতে নয়, ভোগেতে তাৎপর্য। স্বর্গাদিতে তাৎপর্য।

—যারা প্রবৃত্তিমার্গী তারা ভোগ করবে। ভোগ করবার জন্যে ওদের ঐ কর্মকাণ্ড দেওয়া হয়েছে। তারপরে ওদের বিবেক জাগবে, বৈরাগ্য হবে, তখন আবার উপনিষদের দ্বারা এই জ্ঞানলাভ হবে।

মহারাজ : তাহলে তাৎপর্য কিসে হল? বেদে তো যাগ-যজ্ঞের কথা বলা আছে। যাগ-যজ্ঞ—তার দ্বারা স্বর্গাদি ফল লাভ হয়। যাগ-যজ্ঞ অনিত্য এবং স্বর্গাদি ফলও অনিত্য।

—তার থেকেই তাদের মনের শুদ্ধি হবে। শুদ্ধি হলে পরে তখন তাদের ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হবে।

মহারাজ : যাগ-যজ্ঞ না করলে হবে না?

—সে এ-জন্মে না হলেও অন্য জন্মে করা আছে তাহলে।

মহারাজ : কল্পনা মাত্র। অন্য জন্ম—অন্য জন্মের কথা কী করে জানবে?

—যারা জানতে পারে তারা তো বলেছে।

মহারাজ : আবার যারা বলছ! তাহলে তাদের কী করে জানবে?

—তারা তো পূর্ব জন্মের কথা বলতে পারে।

মহারাজ : আমরা তাদের কী করে জানব?

—আমরা তাদের কথাগুলো পাচ্ছি। মহারাজ, তাহলে কর্মকাণ্ডের সব ফলই তো কল্পনা। স্বর্গাদি যাগ-যজ্ঞের সব ফলই তো তাহলে কল্পনা।

মহারাজ : বেদে—'সর্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি।' 'সর্বে বেদা' বলতে সমস্ত বেদ। তাহলে, কর্মকাণ্ড বাদ হল না। সমস্ত বেদ। কিন্তু সমস্ত বেদে পরম্পরাক্রমে তার শাশ্বত সত্য—সাক্ষাৎভাবে নয়। কার্যকারণ সম্বন্ধ দিয়ে তার তাৎপর্য।

—মহারাজ, ঠাকুর বলছেন—সনাতন ধর্মই থাকবে, আর সব আসবে যাবে।

মহারাজ : তা তো বটেই! বেদ নয় কিন্তু। বেদ তো মাস্টারমশায় তৈরি করেছেন। (হাসি)

—সেইখানে কি সনাতন ধর্ম বলতে আমরা হিন্দুধর্মকে বোঝাতে পারি?

মহারাজ : বেদমাত্রই হিন্দুধর্ম নয়। বেদের যেটা শাশ্বত ভাব সেটাই হিন্দুধর্ম বলেছে। আগে কথা হয়েছে যে, হিন্দু শব্দটা প্রাচীন নয়—সনাতন নয়।

—সনাতন ধর্মই থাকবে। ঠাকুর বলছেন।

মহারাজ : তাতে হিন্দুধর্ম কোত্থেকে এল?

—তাহলে সনাতন ধর্ম বলতে কী বোঝা যাবে?

মহারাজ : তার ভিতরে যা নিত্য তাই সনাতন ধর্ম।

—সর্বধর্মের মধ্যেও যেগুলো নিত্য—

মহারাজ : হিন্দুধর্মও নিত্য নয়। হিন্দুধর্ম বলতে কী বোঝায়? হিন্দু মানে গুরুকে ভক্তি করলেই কি হিন্দু হবে? হিন্দু মানে যে আচার-অনুষ্ঠানগুলো হিন্দুধর্মের ওপরে পড়ল, সেগুলো অনিত্য। যাগ-যজ্ঞ এখন কোথায়?

—বেদের তত্ত্বগুলো—

মহারাজ : বেদের তত্ত্ব বলতে—এত জীব আছে, কিন্তু আসলে সব ব্রহ্ম, ব্রহ্মাত্মৈক্য লাভ উদ্দেশ্য। এই। এটা তত্ত্ব। কিন্তু 'সোমেন যজেত'—এটা তত্ত্ব নয়—এটা বিধি।

—কিন্তু মহারাজ, আপনি যেরকম বলছেন, তার মানে তত্ত্ব একটিই হয়।

মহারাজ : হ্যাঁ, তত্ত্ব এক।

—কিন্তু এই যে সাংখ্যেরা তো চতুর্বিংশতি তত্ত্ব করেছে।

মহারাজ : আরে! ওটা আলাদা জিনিস। চতুর্বিংশতি মানে সেখানে কারণ। তত্ত্ব মানে কারণ। যেমন মৃত্তিকা হল সমস্ত মাটির তৈরি জিনিসের তত্ত্ব। কিন্তু মূল তত্ত্ব কারণাতীত।

—অন্য ধর্মের মধ্যেও তো কিছু সনাতন বা শাশ্বত তত্ত্ব আছে।

মহারাজ : আমি তো সেই কথাই বলছি।

—সেগুলো তো বেদের অংশ নয়। তারা কী করে নিত্য হচ্ছে—এটাই আমার প্রশ্ন।

মহারাজ : বেদের অংশ নয়—তাই বেদ।

—ধরুন, বাইবেল কী কোরান—এরা তো বেদ নয়। তাহলে তারা—

মহারাজ : কে বললে বেদ নয়?

—কী করে মহারাজ?

মহারাজ : বেদ মানে যদি অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশি হয়, তাহলে তাতে বাইবেল, কোরান প্রভৃতি ছাপ মেরে দিতে হবে—কোন যুক্তির কথা নয়।

—অপৌরুষেয়ত্ব তো বেদের লক্ষণ।

মহারাজ : প্রত্যেক ধর্মের ভিতর কিছু অপৌরুষেয় আছে।

—কিন্তু কোরান বা বাইবেলকে তো আমরা অপৌরুষেয় বলছি না।

মহারাজ : আরে, বেদ মানে যে 'সোমেন যজেত'—এটা অপৌরুষেয় তো?

—হ্যাঁ।

মহারাজ : তাহলে সেটা বেদ, মানে নিত্য।

—কিছুটা নিত্য।

মহারাজ : আবার কিছুটা নিত্য! এরকম হয় নাকি কখনো?

—কেন, মহারাজ? বেদ যতদিন আছে, ততদিন তো বেদ থেকেই এটা জানতে হবে।

মহারাজ : হয় নিত্য। না হয় অনিত্য। কিছুটা নিত্য, কিছুটা অনিত্য—এরকম হয় নাকি?

—বেদ যতদিন আছে, সেটা বেদ থেকেই তো জানতে হবে।

মহারাজ : আরে, বেদ যতদিন আছে মানেই তো অনিত্য।

—মহারাজ, বেদ নিজেই যদি অনিত্য হয়, তাহলে জ্ঞান কী করে নিত্য হবে?

মহারাজ : বেদ অনিত্য নয়, বেদ মানে জ্ঞান।

—সোমযাগের যে-বিধি সেটা তো বেদেরই জ্ঞান—বেদ থেকেই তো প্রাপ্ত।

মহারাজ : বেদ থেকেই প্রাপ্ত। কিন্তু সেগুলো তো আর নিত্য নয়। সাক্ষাৎভাবে সেগুলো ব্রহ্মাত্মৈক্যের উৎপাদক নয়।

—তাহলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় না এখানে—সে কি এইজন্যে? আসল কারণটা কী?

মহারাজ : আসল তত্ত্ব হল—মহাবাক্যের ভিতর দিয়ে তত্ত্ব বলা হয়।

—'অহং ব্রহ্মাস্মি'-ও বেদে আছে। বেদ যদি অনিত্য হয়, তাহলে এই 'অহং ব্রহ্মাস্মি' তত্ত্বও তো অনিত্য।

মহারাজ : 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বেদে নয়—'অহং ব্রহ্মাস্মি' যা, তাই বেদ।

—ও, আচ্ছা। (হাসি) তত্ত্বটাকে যে প্রকাশ করছে, সেই হচ্ছে বেদ।

মহারাজ : এইজন্যে তাকে মহাবাক্য বলা হয়।

—আচ্ছা। 'বেদা অবেদা ভবন্তি।'

মহারাজ : 'তত্র বেদা অবেদা ভবন্তি।' বেদ অবেদ হয়ে যায়। বেদ মানে ব্রহ্মের বাচক যা, সেগুলো অবেদ হয়ে যায়। অজ্ঞান নাশ হয়ে যায়। ব্রহ্মের বাচক—ব্রহ্ম বাক্যমনাতীত, তার বাচক কেউ হতে পারে না। সুতরাং সেখানে বেদ অবেদ হয়ে যায়।

—বেদ মানেই জ্ঞান। জ্ঞান মানেই আবার ব্রহ্ম। তাহলে বেদ হয়ে গেল ব্রহ্ম।

মহারাজ : জ্ঞান মানে উৎপন্ন জ্ঞান নয়, জ্ঞান অনাদি জ্ঞান।

—অনাদি জ্ঞান। আবার সেই অনাদি জ্ঞানই ব্রহ্মস্বরূপ। সেইজন্যই নিত্য।

মহারাজ : ব্রহ্মজ্ঞানই নিত্য। উৎপন্ন জ্ঞানগুলো অবেদ হবে। ব্রহ্মচারী মুখ বন্ধ—তা নয়। যেখানে বুঝতে পারবে না, প্রশ্ন করবে।

—বেদ ব্রহ্মই। তাহলে এখানে স্বামীজী যে বলছেন, বেদ হল অনাদি অনন্ত জ্ঞানরাশি, এখানে তো দেখা যাচ্ছে—একাধিক জ্ঞানের কথা বলছেন তিনি।

মহারাজ : জ্ঞানরাশি বলছেন।

—আজ্ঞে মহারাজ।

মহারাজ : একাধিক জ্ঞান ডালপালা নিয়ে—ডালপালা নিয়ে গাছ হয় তো। সেই ডালপালা নিয়ে বলছেন। তার মূল এক। ব্রহ্ম মূল।

—অতীন্দ্রিয় অলৌকিক জ্ঞান। স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন যে, দুরকম সত্য আছে। ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের দ্বারা এক সত্যকে জানা যায়। তাকে বলে বিজ্ঞান। আর অতীন্দ্রিয় যোগজ শক্তির দ্বারা এক সত্যকে জানা যায়, তাকে বলা হয় বেদ।

মহারাজ : তাকে বলে পরমার্থ জ্ঞান।

—কিন্তু অতীন্দ্রিয় জ্ঞান তো—এটাও তারই যে, যেমন সোমযাগ করলে পরে স্বর্গ ফল হয়। এটা তো তার অতীন্দ্রিয় জ্ঞান।

মহারাজ : হ্যাঁ। ইন্দ্রিয় দিয়ে যা জানা যায় না, তাই অতীন্দ্রিয়।

—সেইটেই। তবে বেদ বলতে তো পরমার্থ জ্ঞান।

মহারাজ : 'ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং যৎ তু তদ্ অচিন্ত্যস্য লক্ষণম্।'

—আজ্ঞে মহারাজ। তা বেদ বলতে তো পরমার্থ জ্ঞানকে বোঝাচ্ছে।

মহারাজ : বেদ মানে দুরকম আছে। একটা হচ্ছে Orthodox interpretation, আরেকটা হচ্ছে Rational interpretation; Orthodox interpretation

বলতে শব্দরাশি। আর Rational interpretation হচ্ছে, শব্দরাশির প্রতিপাদ্য যে-বস্তু।

—সেইটেই। Rational স্বামীজী করতে গেছেন। বক্তৃতার মধ্যে বলছেন, 'আমি যদি বলে দিই যে, কতকগুলি বাক্য সমন্বয় হল বেদ, তা আপনারা হেসে উঠবেন।' এই কথা বলার পরে ঐ উদাহরণ দিয়েছেন যে, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আবিষ্কারের আগেও ছিল। আর যদি কেউ মনে না রাখে, তাহলেও সেইটি থাকবে।

মহারাজ : কী?

—মাধ্যাকর্ষণ—Law of gravitation; সেইরকম বলছেন যে, বেদও Spiritual law।

মহারাজ : Spiritiual law, তাকে তো আর ইন্দ্রিয় দিয়ে পরখ করা যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানের—এমন বিজ্ঞানের সত্য নেই যা ইন্দ্রিয় দিয়ে পরখ করা যায় না। আপাতদৃষ্টিতে ইন্দ্রিয় দিয়ে আমরা atom-কে জানতে পারি না। কিন্তু তার কার্য দিয়ে তাকে আমরা অনুমান করতে পারি এবং সেই কার্য দিয়েই ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষ করতে হয়।

—এটাই কি ব্যাখ্যা, মহারাজ, যে বলা হয় ভগবান বেদ স্বয়ং সৃষ্টি করেছিলেন—এটার কী অর্থ?

মহারাজ : মানে, ভগবানের প্রথমে যে সৃষ্টির ইচ্ছা হল, তখন সৃষ্টির ইচ্ছায় তাঁর অন্তরে বেদ উদিত হল। তাই বেদকে অবলম্বন করে 'যথাপূর্বম্ অকল্পয়েৎ।' 'সূর্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বম্ অকল্পয়ৎ।' (মহানারায়ণোপনিষদ্, ১।৬২) তিনি সেই আগের মতো করে সৃষ্টি করলেন।

—এইটাই হল বেদের সহায়তা।

মহারাজ : সহায়তা মানে বেদের পরতন্ত্রতা নয়। ঈশ্বর স্বতন্ত্র। কাজেই যখন সৃষ্টি করেন, তখন সৃষ্টির শব্দরূপে তার ওপরে প্রতিভাত হয়, স্ফুরিত হয়।

—ঠাকুর বলছেন, এখানের অনুভূতি বেদ-বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।

মহারাজ : তার কারণ হচ্ছে, বেদও শব্দের অতীত বস্তুকে বলতে পারে না। কারণ, বলতে গেলেই তো শব্দ অবলম্বন চাই। তা সেই অনুভব যে শব্দের অতীত অর্থাৎ তাকে বর্ণনা করা যায় না।

—এটা শ্রীরামকৃষ্ণের অনুভবের কথা? না, সকলেরই অনুভব এরকম—

মহারাজ : সকলেরই কথা। শুধু শ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষত্ব নয়, বলতে গেলে, সকলে বেদের অধীন হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেখানে—'তত্র বেদা অবেদা ভবন্তি।' তাহলে?

—তাহলে এখানে নতুনত্বটা কী, বিশেষত্বটা কী?

মহারাজ : ঠাকুরের স্বরূপ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, এখানের অনুভবটা বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে। স্বামীজী কেন, ঠাকুর নিজেও বলেছেন।

—না। ঠাকুরের কথা।

মহারাজ : এই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়টা ব্যাখ্যা, বেদের ভেতর দিয়ে তো হয় না।

—মহারাজ, একটা জায়গায় আছে—লীলাপ্রসঙ্গে—ঠাকুর যখন কাশীতে গেলেন, তারপর মণিকর্ণিকার ঘাটে তাঁর দর্শন হল—মৃতব্যক্তিকে বিশ্বনাথ তারকব্রহ্ম মন্ত্র শোনাচ্ছেন আর মা তার বন্ধন মুক্ত করে দিচ্ছেন—

মহারাজ : এই। এইসব অলৌকিক বিষয়ের ব্যাখ্যা হবে না।

—না, ব্যাখ্যার কথা বলছি না। এক পণ্ডিত বলছেন, কাশীখণ্ডে আমরা পড়েছি যে, কাশীতে মরলে মুক্তি হয়। কিন্তু কিভাবে হয়, আজকে আমরা নতুন শুনলাম। তবে শরৎ মহারাজ প্রথমেই বলছেন, এইজন্যেই ঠাকুর বলতেন, এখানকার অনুভূতি বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে।

মহারাজ : এইজন্যেই কথাটার মানে এ নয়। বেদের বিষয়কে শব্দের বর্ণনার ভেতর ধরতে হবে। কিন্তু পরমার্থ সত্য যা, তা শব্দের অতীত। 'অশব্দ' বলে তাকে বলা হয়েছে।

—মহারাজ, স্বামীজী এক জায়গায় বলেছেন যে, আমাদের সেই জায়গায় পৌঁছাতে হবে যে, যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরানও নেই।

মহারাজ : তা তো বেদই বলছে যে, 'তত্র বেদা অবেদা ভবন্তি।'

—এটার অর্থ কী?

মহারাজ : বেদ বলতে যে প্রতিপাদ্য শব্দের—শব্দ সেখানে পৌঁছায় না। কাজেই সেই অর্থেতে বেদকে ছাড়িয়ে যেতে হবে।

—এইটাই কি ঠাকুর বলছেন যে, এখানকার অনুভূতি বেদ-বেদান্তকে ছাড়িয়ে গেছে?

মহারাজ : আমাদের ব্যাখ্যা করার সময় এইরকম ভাবতে হবে। ঠাকুর কী বললেন, তা ঠাকুরই জানেন। আমরা কি ব্যাখ্যা করে তাকে বলতে পারব? বলতে পারব না।

—মহারাজ, যেকোন অনুভূতি—যেহেতু পুরোটা প্রকাশ করা যায় না—তা প্রকাশের থেকে বেশি হবেই।

মহারাজ : তাইতো, অনুভূতি তো শব্দের দ্বারা প্রকাশ করা যায় না, তাহলে এত ঝুড়ি ঝুড়ি বই লেখা হল কেন?

—অনুভূতি—যতটুকু প্রকাশ করা যায়, সেইটুকু।

মহারাজ : তা প্রকাশ করা যায় তো। এখন কিরকম করে প্রকাশ করা যাবে? উপমা দিয়ে প্রকাশ করা যাবে নিজের অনুভূতি। বলে, মিষ্টি কেমন—এর কি ব্যাখ্যা হয়?

—তাহলে এই লৌকিক বিষয়ে যখন এটা সত্য—

মহারাজ : না, তুলনা দিয়ে বলা হয়।

—না, এমনি লৌকিক বিষয়ে তো—

মহারাজ : না, উপমা দিয়ে বলা হয়। নিজ নিজ মতে। এখন মত বলতে সেরকম উপমা—যেমন, মিষ্টত্ব মিছরিতেও আছে, অন্য কিছুতে আছে।

—মহারাজ, এই যে লৌকিক দৃষ্টান্তগুলো, এই লৌকিক অভিজ্ঞতাগুলোও পুরো প্রকাশ করা যায় না।

মহারাজ : এইজন্যে তাকে শব্দ দিয়ে প্রকাশ করা না গেলেও উপমা দিয়ে বলা যায়।

—কিন্তু অতীন্দ্রিয় জিনিসের উপমা কী করে হবে? সে তো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে উপমা হবে।

মহারাজ : বোঝানো হল বৈকি! আমরা একটা idea করতে পারলাম। তারপর পরখ করে দেখে নাও। বিজ্ঞানের বিষয় পরখ করে দেখার বিষয়। পরখ করে যা দেখতে না পারা যায়, তাকে বিজ্ঞান বলে না। সেটা দর্শনের ক্ষেত্র হয়ে গেল।

—তাহলে আধ্যাত্মিক অনুভবকে দর্শন বলব, না বিজ্ঞান বলব?

মহারাজ : কোনটাকে?

—এই যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি, spiritual realization?

মহারাজ : এটা তো বিজ্ঞানের বিষয় নয়।

—না, আবার দর্শনও নয় তো।

মহারাজ : দর্শন নয়, মানে দর্শন শব্দের ব্যাপক অর্থ—তাই। দর্শন মানে ইন্দ্রিয় দিয়ে দর্শন নয়, অনুভব।

—তা আধ্যাত্মিক অনুভূতি দর্শনের মধ্যে পড়ল ব্যাপক অর্থে?

মহারাজ : হুঁ। বেদান্তদর্শন মানে বেদান্তের চার হাত চার পা আছে নাকি? দর্শন মানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এর চার হাত, কি দশ হাত—এখন এই নিয়ে গোঁড়ামি আছে। এগুলো মাত্র উপমার জায়গা। এগুলি যদি বাস্তব রূপ দেওয়া যায়, তাহলে গোঁড়ামি। শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম। গদা-পদ্ম-শঙ্খ-চক্র। শঙ্খ-গদা-চক্র-পদ্ম। (হাসি)

॥ ১৩৩ ॥

মহারাজ : এস। তুমি না এলে জমে না।

—ওরে বাবা! (হাসি)

প্রশ্ন : গীতায় অবতারের কথা আছে এবং অবতারের আসার উদ্দেশ্যের কথা আছে। তার মধ্যে কিন্তু আমাদের ঠাকুরের একটা জিনিস আমরা দেখি না। ওখানে যে বলছেন, সাধুদের পরিত্রাণ আর দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ করবেন—তা এখানে দুষ্কৃতকারীদের বিনাশ কোথায় করলেন তিনি?

মহারাজ : তিনি তো এখানে অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে আসেননি। বিনাশ করবেন কী করে?

—কিছু নেই, শুধু হাত।

মহারাজ : দুষ্কৃত মানে দুষ্কৃতি। দুষ্কৃতি—জগতের যত অমঙ্গাল, সেগুলো দূর করবার জন্যে এসেছেন।

—আর মঙ্গাল কী করে করলেন?

মহারাজ : করবার জন্যে এসেছেন। কতটা পারলেন, তা জানি না।

—সেইটেই তো। অমঙ্গল কি কমেছে মহারাজ?

মহারাজ : দেখ, এসব জিনিস দু-চার দিনের কথা নয়, দীর্ঘকাল লাগে।

—মানে স্থূলশরীরে যতদিন আছেন, তার পরেও তার কাজ চলতে থাকে।

মহারাজ : তা তো বটেই। ঠাকুর বলছেন—ছাঁচ গড়ে গেলুম, তোরা নিজেদের সেই ছাঁচে ঢেলে নে। বাড়া ভাত, রান্না করে গেলুম। বাড়া ভাতে বসে যা। তা এইগুলোর মানেটা কী হল, তাহলে? এই তো দুষ্কৃত বিনাশ হল না? দু-একদিনের কাজ?

—শুভ পথ একটা দেখিয়ে দিয়ে গেলেন। আর সেই পথে চললে শুভ আমাদেরও হবে। আর অশুভের—

মহারাজ : বিনাশ হবে।

—বিনাশ হবে। এইটা বলছেন। মহারাজ, একটা প্রশ্ন করছেন গোবিন্দ মহারাজ, আমরা যে শুভ পথে চলব—তা শুভ পথে চলবার জন্য উৎসাহ তো তিনি জোগাবেন। আর তিনি কি সূক্ষ্মশরীরে—

মহারাজ : সবই তিনি করবেন, তা তুমি করবে কী? তোমার কিছু করণীয় নেই?

—না, আমি তাঁর সে-উৎসাহটা অনুসরণ করব, আর কী!

মহারাজ : তিনি যে বললেন, কৃপাবাতাস তো বইছে, তোরা পাল তুলে দে। তারপর বলবে, পাল-টাল তিনি তুলুন! এটা তো কাজের কথা হল না।

—না, সেই।

মহারাজ : এখানে ভক্তরা বলে—আপনি করে দিন। আপনি আশীর্বাদ করুন। আরে, আমি তো করব। তোমরা কী করবে? আমাকে সবাই বলে—আপনি করে দিন।

—তবু তো ওরা ভক্ত।

মহারাজ : তার মানে, করবার আগ্রহ নেই। আগ্রহ না থাকলে কি হবে? ঐ কলাগাছ যেমন কলাগাছই থেকে যায়, চন্দন হয় না—সেইরকম হবে।

—সেইজন্যে চেষ্টা আগে। তারপরে ভগবানের কৃপা। আগে নিজের চেষ্টা। আরেকটা কথা, মহারাজ। এই যে অবতার—ঈশ্বর অবতার হয়ে আসেন, মানুষ হয়ে আসেন তো বলা হয়। তা কৃষ্ণ—তিনি অবতার নন, স্বয়ং ভগবান। এটা কী?

মহারাজ : এটা বৈষ্ণবদের গোঁড়ামি। বৈষ্ণবদের গোঁড়ামি। আমাদের কেষ্ট ঠাকুর কি তোমাদের অবতারের মতো হবে? স্বামীজী বলেছেন, ঠাকুর অবতারের বাবা! (হাসি)

—হ্যাঁ। এইখানে অবতারকে নিয়ে তো প্রশ্ন ওঠে। বৃন্দাবনে যে-লীলা ভগবান করলেন, সেইখানে তো ওরা বিশ্বাস করে যে, ভগবান মানুষ হয়ে এসেছিলেন, নাকি? বৈষ্ণবদের কী ভাব?

মহারাজ : মানুষ হলে কি এইরকম করতে পারে? এইসব দুষ্কর্ম?

—কী, এটা কী? এই যে বৃন্দাবন লীলা আমরা বইতে পড়ি বা শুনি, তা বৈষ্ণবরা কী ভাবেন এটা?

মহারাজ : এ ব্যাসঠাকুরকে জিজ্ঞেস কর।

—কৃষ্ণ কি এইরকম মানুষ-শরীরধারী হয়ে ছিলেন?

মহারাজ : ব্যাসঠাকুর যেমন করে গেছেন, তাঁর বুদ্ধি অনুসারে করেছেন। এখন তোমাদের বুদ্ধি খাটাও।

—সেইখানে যা বলছে, সে তো মানুষ হয়ে এখানে লীলা করে গেছেন—এটা বোঝা যায়।

মহারাজ : ব্যাপার হচ্ছে, 'ঈশ্বরাণাং বচঃ কার্যং তেষামাচরণং ক্বচিৎ।' সবসময় তিনি যা করেছেন, তা করতে গেলে মরবে।

—না, আমরা করতে যাচ্ছি না, মহারাজ। (সকলের হাসি) কথাটা হল উনি কি সত্যি এইরকম রক্ত-মাংসের শরীর নিয়ে এসেছিলেন—তারা কি এটা বিশ্বাস করে? বৈষ্ণবরা কী বলে?

মহারাজ : তা জানি না। ঠাকুর মথুরবাবু, তাঁর স্ত্রী—তাঁদের সঙ্গে শুয়েছিলেন। তোমরা যাবে? তাহলে বাঁচবে?

—না, বাঁচা যাবে না।

মহারাজ : তবে? ভগবান যাই করেন তাই লীলা। পাপ বলছেন মানুষের বেলা।

—মহারাজ, এই অবতারবাদ কি হিন্দুদের মধ্যেই সীমিত? অন্য ধর্মে আছে কি? খ্রিস্টান ধর্মে? খ্রিস্টান ধর্মে কি এরকম অবতারপূজা করা হয়?

মহারাজ : খ্রিস্টান—খ্রিস্টকে অবতার বলে কয়জন স্বীকার করেছে?

—খ্রিস্টানরা কী মানে তাহলে? Orthodox খ্রিস্টানরা—তাদের বিশ্বাসটা কী?

মহারাজ : তারা বলে যে, যিশুকে না ভজলে উপায় নেই।

—যিশুখ্রিস্ট কি ঈশ্বর? এই কথা বলছি।

মহারাজ : ঈশ্বরপুত্র।

—ঈশ্বরপুত্র বললেই কি তফাত হয়ে গেল?

মহারাজ : ওরা বলে, ভগবান মানুষকে এমন প্রেম করলেন যে, আপন সন্তানকে পাঠিয়ে দিলেন।

—ভগবান এমন প্রেম করলেন যে, ত্রাণের তরে নিজের পুত্রকে পাঠিয়ে দিলেন।

মহারাজ : কথা হচ্ছে, A saint is never respected in his life time। বলছে—দীর্ঘকাল পরে তার কদর লোকে করে। কৃষ্ণ কবে জন্মেছেন, কখনো জন্মেছেন কিনা তারই ঠিকানা নাই।

—সেই তো, তা নিয়ে তো অনেক বাদানুবাদ, তর্ক-বিতর্ক।

মহারাজ : রাসলীলা করলেন, তা প্রত্যেক গোপীর পাশে তিনি রয়েছেন। 'তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়ো'—দুই দুই গোপী, তাদের মধ্যে কৃষ্ণ। এ তো আর মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।

—তা সম্ভব নয়। তবে একথা বলতে পারি যে, তাঁর একটা অলৌকিক শক্তি ছিল।

মহারাজ : অলৌকিক শক্তি ছিল। অলৌকিকতার ওপর নির্ভর করার জন্যে অলৌকিকতা ছিল। আমাদের অলৌকিকতার ওপরে টান বেশি। সেইজন্য। আগে লৌকিক জীবনটাকে দেখ। তারপরে অলৌকিকে যাবে। স্বামীজী অলৌকিকতা সম্পর্কে বলতেন—ঠাকুরের সব অলৌকিক ঘটনা বাদ দিলে যা থাকে তা কি কিছু কম?

—অলৌকিক ঘটনা তো তাঁর জীবনে ঘটেছে—এরকম অনেক আছে। স্বামীজী এটা বারণ করেছেন কেন?

মহারাজ : অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে, তাতে তোমাদের কী লাভ?

—আমাদের লাভ, অলাভের ওপরে তিনি কি এই কথাটি বলছেন?

মহারাজ : বিশ্বাস হবে না।

—কিন্তু যেটা বলা হয়, যিশুখ্রিস্ট জীবনে অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়েছিলেন বলে লোকে বিশ্বাস করে যে, তিনি ভগবান।

মহারাজ : কিচ্ছু না, বিশ্বাস। স্বামীজী বলছেন, ঠাকুরের মদকে 'ডি গুপ্ত' করা ছাড়া আর কি কোন কাজ ছিল না?

—তা বলেছেন। মহারাজ, লৌকিক জীবন হলে সাধারণের থেকে তার তফাতটা কী করে বোঝা যাবে?

মহারাজ : যা মানুষের অনুসরণীয়। তফাত এইখানে—যা মানুষের অনুসরণীয়। শরৎ মহারাজ বলছেন, ঠাকুরের জীবনের এমন একটি ঘটনাও নেই যা জগতের কল্যাণের জন্য নয়। এইখানে বুঝতে পারবে।

—অলৌকিকত্ব কিছু না দেখিয়েও তাঁর প্রতিটি লৌকিক ব্যাপারে জগতের কল্যাণ হচ্ছে—এইটি বলছেন।

মহারাজ : না, লৌকিক ব্যাপারগুলি সাধারণ মানুষের সকলের পক্ষে অনুকরণীয়, অনুসরণীয়। স্মরণীয়, অনুসরণীয় এবং অনুকরণীয়।

—আসি মহারাজ। সময় হয়ে গেছে।

মহারাজ : এস, আর কী হবে!

॥ ১৩৪ ॥

প্রশ্ন : কী বললেন মহারাজ? আমরা তো বুঝতে পারলাম না।

মহারাজ : 'ভেককে ভালা বর্ষা বাদল। সাঁজকে ভালা ধূপ। নটীকে ভালা বোলনা চলনা। সতীকে ভালা চুপ।'

—তবে আমাদের কোন role হবে? সবাই সতী হয়ে যাবে দেখছি।

মহারাজ : কী হবে?

—সতী।

মহারাজ : সতী হতে হলে—

—চুপ করে থাকবে।

মহারাজ : মরতে হবে।

—সবাই তো মরবে। মরতে হবে আর কী!

মহারাজ : সতী হওয়া মানে, মরতে হয়।

—ও, তাহলে সতীদাহ যেটা সেইটা বলছেন?

মহারাজ : সহমরণ।

—এখন আর মরবে না মহারাজ। এখন আর হবে না এসব।

মহারাজ : তাহলে সতীও হবে না।

—আপনাদের ছেলেবেলায় কি এরকম ঘটনা ঘটেছে, জানেন?

মহারাজ : এমনি শুনেছি অনেক। মনে নেই। আমাদের যোগোদ্যানের পাশেই সতীমন্দির।

—সতীমন্দির?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—সতীর মন্দির বলতে, সতীদাহ হয়েছে—তাও হতে পারে।

মহারাজ : সতী স্মৃতিকা মন্দির। মাড়োয়ারীদের আড্ডায়। আগে আমাদের উৎসবের সময় সতীমন্দিরে গাড়ি পার্কিং করতে দিত। এখন আর দেয় না।

—ওরা জ্যান্ত মানুষকে আগুনে ছুঁড়ে দিত।

মহারাজ : আগুনে ঝাঁপ দিত—এই কথাটা ভাল আর আগুনে ফেলে দিত কথাটা ভাল নয়।

—ভাল নয়। কিন্তু কোনটা যে হতো তাও তো আমরা জানি না। একবার শুনেছি, জোর করে নাকি পুড়িয়েছিল।

মহারাজ : এও ভাল। ইজিপ্টের রাজারা মরলে রানি, ঘোড়া সব পিরামিডের মধ্যে রেখে দিত। খাবার-দাবারও থাকত। কিন্তু খাবে কে? ধন-রত্ন সব থাকত। আর রাজাকে মমি করে রেখে দিত।

—এখনো নাকি সব রাখা আছে।

মহারাজ : এখন করলে ফাঁসি দেবে।

—না, এখন না। আগে যা ছিল আর কী।

মহারাজ : এখনো পিরামিড আছে। পিরামিড এখনো আছে। কিন্তু ধনরত্ন সব লুঠ হয়ে গেছে।

—তবুও ওরা মমি করে রাখছে। মেরেছে। তারপর রেখে দিয়েছে। আর এরা মেরে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

মহারাজ : মমি করে রাখছে যারা—মরবার পর মমি করে রাখছে। মেরে মমি করেনি। রাজা দশরথকে মরবার পর তেলে ডুবিয়ে রেখে দিয়েছিল। খাসী পাহাড়ের রাজারা মরলে তাকে তেলে ডুবিয়ে রেখে দেয়। চিমকে-চিমকে—রাজাকে। তা যে কতদিন থাকবে কোন ঠিকানা নেই। তারপর সুবিধামত একদিন celebration হয়।

—পারসিদের শুনি dead body ওপরে রেখে দেয়।

মহারাজ : কাদের?

—পারসি।

মহারাজ : পারসিদের ওপরে রেখে দেয় মানে—একটা খাঁচার ভেতর রাখে। আর সেখান থেকে চিলেরা ঠুকরে ঠুকরে খায়। শেষ পর্যন্ত খালি হাড়টা থাকে। সেগুলি ফেলে দেয় সমুদ্রের ধারে কাছে। Arrangement-টা পাহাড়ের ওপর। ওকে বলে Tower of Silence।

—বোম্বেতে—

মহারাজ : কিছু ভাল কথা হবে?

—উত্তরাখণ্ডে সলিলসমাধি দেওয়ার পরে শরীরটা মাছে খেয়ে ফেলে।

মহারাজ : মাছে খায়, কচ্ছপও আছে। বৃন্দাবনে কচ্ছপে খায়। পাথরের ভেতর দেয়—পাথরের বাক্স করে। ডোমকে বললে পাথরের বাক্স করে দিয়ে যায়।

—পাথরের বাক্স?

মহারাজ : আর এমনি সাধারণ লোকে মরলে পাথর বেঁধে ডুবিয়ে দেয়। মরবার পর অবশ্য। (সকলের হাসি)

॥ ১৩৫ ॥

প্রশ্ন : আমরা আজ ভাণ্ডারায় যাইনি।

মহারাজ : না, ভাণ্ডারা এখানেই আছে তো। (সকলের হাসি) ভাগবতে পড়ছিলাম যে, বলরামের জলকেলি করবার ইচ্ছা হল। তা ডাঙায় তো হল। এখন জলে জলকেলি করতে হবে। তা যমুনাকে বললেন, এস। যমুনা ভাবছে, মাতাল কী বলছে না বলছে, তা এল না। কী আসবে না? লাঙল দিয়ে টেনে আনতে হবে। লাঙল দিয়ে টেনে টেনে নিয়ে এল। তা টেনে নিয়ে এল যখন, এইজন্য যমুনার খাতটা তফাত হয়ে গেছে। যেদিকে বইছিল, অন্যদিকে বইছে।

—এই হল পুরাণ। মহারাজ, এর নাম পুরাণ।

প্রশ্ন : মহারাজ, সত্যযুগের লক্ষণ কিভাবে বোঝা যাবে?

মহারাজ : সত্যযুগের লক্ষণ—সেখানে মানুষগুলো খুব লম্বা লম্বা হতো, দীর্ঘায়ু হতো।

—ধর্ম চতুষ্পাদ বলে যে?

মহারাজ : ধর্ম জিনিসটা তো ভাল জিনিস না। (হাসি)

—ধর্ম জিনিসটা ভাল জিনিস নয়—মানে?

মহারাজ : মানে, ও তো ভোগের পথ।

—পুণ্য কর্ম—তাকে বলছে ধর্ম।

মহারাজ : শুভ কর্মফলে শুভ হয়, অশুভ কর্মফলে অশুভ হয়। তখনো ছিল, এখনো আছে।

—পুরাণে এইরকম ধরনের ধর্মের ব্যাখ্যা রয়েছে।

মহারাজ : ধর্ম এইরকমই।

—ঐ পুণ্য কর্ম কর—স্বর্গে যাবে।

মহারাজ : সত্যং বদ, ধর্মং চর। সত্যং বদ মানে যেখানে গোলমাল নেই, সেখানে সত্যং বদ। আর যেখানে গোলমাল আছে, সেখানে অসত্যং বদ। (সকলের হাসি)

—আজকে মহারাজ আপনি mood-এ আছেন। আপনি একেবারে এরকম করে ধর্মকে attack করছেন যে!

মহারাজ : সাধুদের ভগবান বলছেন, 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।' (সকলের হাসি)

—ভগবান বলেছেন, সমস্ত ধর্ম ত্যাগ করে আমার কাছে এস।

মহারাজ : তবে তো ধর্ম মানে তার থেকে দূরে যাওয়া। (হাসি)

—মহারাজ, অভ্যুদয় ছাড়া নিঃশ্রেয়সও তো ধর্মের মধ্যে?

মহারাজ : ধর্মের মধ্যে নয়। নিঃশ্রেয়স ধর্মের থেকে ভিন্ন।

—কী সেটা তাহলে?

মহারাজ : ঠাকুরের সত্যযুগ মানে ঐ রোগীর ঝোল খাওয়া? (সকলের হাসি) কৃষ্ণ বিহার করেছিলেন। তা বলরাম ভাবল—ছোট ভাই, ও এত করল, আমি কেন বাদ যাব? তখন তাকে ছাড়িয়ে গেলেন। ছাড়িয়ে গেলেন এইজন্যে—রাসের ভেতরে মদ খাওয়ার কথা

কৃষ্ণের নেই। সেখানে বলরাম মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে গেলেন। (সকলের হাসি)

—হতচ্ছাড়াগুলো আর কিছু পেল না। শুধু ঐ জিনিসই পেল। (সকলের হাসি)

মহারাজ : ঐ কামিনী আর কাঞ্চন।

—যা আমাদের প্রভু বারণ করে গেলেন। ওরা এইভাবেই করে গেল।

মহারাজ : এদিকে দেখ না! স্বর্গেতে তো পারিজাত আছে। সত্যভামার জন্য লড়াই হয়ে গেল। কাজ কী? আমাদের চেয়ে অধম একেবারে। আমরা বড় জোর ফলের জন্য লড়াই করি। ওরা ফুলের জন্যও লড়াই করে! (উচ্চ হাসি সকলের)

॥ ১৩৬ ॥

মহারাজ : সব ভয়ে দেরি করে আসে।

—রাস্তায় আজকে আটকে গিয়েছিলাম মহারাজ।

মহারাজ : আটকে দিল? অবরোধ?

—হ্যাঁ। একজন ভক্ত এসেছেন রাজকোট থেকে। এখন তো মঠ অফিস বন্ধ। তা ঘুরে বেড়াচ্ছে—কোথায় যাব, কোথায় যাব?

মহারাজ : তাই তো।

—তারপরে চিঠি দেখাল। তা আমরা বললাম, আপনি Guest house-এ চলে যান। পরে অফিস খুললে দেখা করবেন।

মহারাজ : তাই তো। তা Guest house-এ যাকে-তাকে ঢুকতে দেবে কেন?

—চিঠি আছে। জিনিস আছে। Auto Rickshaw নিয়ে এসেছে। সে তো দাঁড়িয়ে থাকবে। তারপর অফিসও বন্ধ। তা আমরা বললাম যে, আটটা বাজুক না।

মহারাজ : আমাদের গোবিন্দের ঐ অবস্থা হয়েছিল। গোবিন্দ যখন প্রথম আসে, সিলেটের দিক থেকে এসেছে। এসে বাসের মধ্যে জিজ্ঞেস করেছে, ঐ সারদাপীঠের ঐদিকে নেমেছে। নেমেছে, ভাবছে—সারদাপীঠের বড় বড় বাড়ি দেখছে—বেলুড় মঠ ওখানে নাকি? তারপর বলছে—না, চলতে থাক। তা চলছে। চলতে চলতে তারপরে দেখে যে, আমাদের পুরনো অফিসটার সামনে চালতা গাছ ছিল। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। বিছানাটা বগলে। আমি কাছে আসছি—তা কী ব্যাপার, তুমি দাঁড়িয়ে কেন? বলছে, আমি নূতন এসেছি। যাকে জিজ্ঞাসা করছি বেলুড় মঠ যাব, সে বলছে—চলতে থাক। এখন সামনে তো গঙ্গা। (সকলের হাসি) তা আমি বললাম, আর চলতে হবে না। এখানে বিছানাটা রাখ। রেখে চা খেতে যাও। কাকে যেন বললাম, ওকে চা খাওয়াও। তা গেল।

—সেই। না জেনে খুব বিপদে পড়তে হয়। কী করব?

মহারাজ : লোকে এসে বিপন্ন হয়। কোথায় যাবে ঠিক করতে পারে না। অফিসও বন্ধ থাকে। আর কোথায় যে জিজ্ঞেস করবে!

—আজ শঙ্করপঞ্চমী। শঙ্করের জন্মদিন।

মহারাজ : শঙ্করপঞ্চমী। এইদিনে আমার প্রথম দীক্ষা হয়েছিল। আমার দীক্ষা নয়, আমার দেওয়া দীক্ষা হয়েছিল। ১৯৭৫-এ। ২৭ জন বোধ হয় হয়েছিল। যোগোদ্যান মঠে। ঠাকুরের শয়নঘর, তার পরে একটা ঘর। সেইখানে দীক্ষা হতো। ছোট ঘর। বেশি তো লোক ধরে না। ওখানে ২৭ জন ছিল, কী আরও কম হবে। শুভ দিন দেখে একটা আরম্ভ করা হয়।

—আমরা ভাবছি, ওরা বড় ভাগ্যবান। ঠাকুরের শয়নঘর। তার পাশে আপনার কাছে প্রথম দীক্ষা পেল।

মহারাজ : হুম্! সকলে একটা ভাল কথা বলতে পার না?

—আজকে আমাদের জন্য ভাল ব্যবস্থা হয়েছে। সকালবেলা ভাল ব্যবস্থা। দুপুরবেলা খুব টকের ব্যবস্থা হবে। সব নিরামিষ হবে। সব নিরামিষ আর টক।

মহারাজ : টক? বাবা! শঙ্কর জন্মেছিলেন তো কালাডিতে। তাঁর ক্রিয়াকর্ম তো অন্য জায়গায়।

—উত্তর ভারতে কাশী ঐ অঞ্চলে।

মহারাজ : কালাডিতে জন্ম হয়েছিল—তারা বলে শঙ্কর আমাদের। আমরাও আমাদের বলি।

—সব আচার্য ঐ দক্ষিণ ভারত থেকেই আসছেন, দেখা যাচ্ছে।

মহারাজ : শঙ্কর ছিলেন ঐদিকের। রামানুজও ঐদিকের। মধ্ব ঐ-দিকের। শঙ্করের গরিব ঘরেতে জন্ম। বিধবা মা। বাল্যকালে বাবা মারা যান।

—৮ বছর বয়সে বিদ্যা অর্জন করে নিলেন। এগুলো সত্য বলে স্বীকার করে নিতে হবে, মহারাজ?

মহারাজ : গল্পও হতে পারে। যাই হোক। 'শঙ্করবিজয়'টা তো গল্প। তাঁর জীবনী ঠিক ঠিক পাওয়া না। তবে জীবনী না পাওয়া গেলেও তাঁর ভাষ্য যা রয়েছে, তা তাঁকে অমর করে রেখেছে।

—মহারাজ, তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কি ছিল, অদ্বৈত মতবাদকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা?

মহারাজ : তা কী করে বলব? তাঁর সঙ্গে তো আমার আলাপ হয়নি। (হাসি) আর তিনি এই যে আসমুদ্রহিমাচল ভ্রমণ করেছেন, করে কেবল অদ্বৈত প্রতিষ্ঠা নয়, ধর্মেরও প্রতিষ্ঠা করেছেন। আচার্য তৈরি করেছেন এবং এর বিভাগ করে চার মঠে মঠাধীশকে বসিয়ে দিলেন। তাদের area

ঠিক করে দিলেন। একজন আরেক জনের area-য় interfere করবে না। ধর্মপ্রচার করবে। শেষে তাদের দশনামী সম্প্রদায় করলেন। অনেক কিছু করলেন তিনি। খালি অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠা নয়।

—সমস্ত দিককেই তিনি লক্ষ করেছেন। ধর্মের সব দিকটাই তিনি লক্ষ করে গেছেন।

মহারাজ : অনেক কিছু করেছেন।

—আরেকটা কথা বলা হয় তাঁর সম্বন্ধে যে, সে সময় থেকেই প্রচলিত পাঁচটি মত, সেই পাঁচটি পুজো আগে করতে হবে—এটা তিনি বলে গেলেন। বিশেষ পুজো করবার আগে পঞ্চ-দেবতার পুজো—উনি সেটা নাকি বলে গেলেন।

মহারাজ : তা, কাজেই তাঁর কীর্তি অনেক।

—সব সম্প্রদায়ের মানুষকে একতাবদ্ধ করা—এটা একটা পরিষ্কার দৃষ্টান্ত। পাঁচটি মতের পঞ্চদেবতার পুজো করা। বিশেষ পুজো করার আগে পঞ্চদেবতার পুজো করতে হবে। এইভাবে একটা সমন্বয় তিনি এনেছিলেন।

মহারাজ : খুব systematize করবার চেষ্টা করেছিলেন। আর বৌদ্ধদের সঙ্গেও তো লড়াই করেছেন। বৌদ্ধ প্রভাব খুব ছিল। সাংখ্যদেরও খুব প্রভাব ছিল। ওটা বড় theoretical।

—মীমাংসকদের প্রভাব তখন ছিল মহারাজ।

মহারাজ : মীমাংসকদের প্রভাব এত ছিল যে, আনুষ্ঠানিক ধর্মই মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করত।

—সন্ন্যাসের ওপর জোর দিলেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে একটা সমালোচনা হয় যে, সেজন্যে মানুষ অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল। মানে কর্মের প্রতি তাদের একটা অশ্রদ্ধা—একটা অনীহা এল।

মহারাজ : কর্মের প্রতি অনীহা—তিনি নিজে যে কত কর্ম করলেন। সমস্ত জীবনটা কর্ম করে গেলেন। আর তিনি বলছেন—'বসন্তবল্লোকহিতং চরন্ত।'

—জ্ঞানীকেও কর্ম করতে বলেছেন। পরহিত কর্ম। আর ঠিক তেমনই ভাবে তিনি যেমন বলছেন—জ্ঞানীর কর্ম থাকবে না। ঠিক তেমন সুরে আবার বারবার বলে যাচ্ছেন—অজ্ঞানীর কর্ম করতেই হবে।

মহারাজ : আর তা ছাড়া তাঁর কাছে কর্ম বলতে সকাম কর্ম। তাঁর ভাষ্যতে আছে যে, একজন যাগ-যজ্ঞ আরম্ভ করলে—সকাম। করতে করতে তার কামনা চলে গেল। তারপরও সে যজ্ঞটাকে পূর্ণ করল। কিন্তু সে-যজ্ঞটা আর এখন সকাম হবে না। নিষ্কাম হবে।

—মানে সে-কর্মের ফল ভোগ আর তাকে করতে হবে না?

মহারাজ : না। তারপর মুশকিল হচ্ছে—কর্ম তো ত্যাগ হয়ে গেল সেখানে। এখন যারা মীমাংসার দৃষ্টিতে কর্মকে বোঝে, তাদের মতে—তার ফল তো কাউকে ভোগ করতে হবে। তা বলছেন, যারা এসব আচার্যকে শ্রদ্ধা করে তারা তাঁদের শুভ কর্মগুলি ভোগ করে। আর যারা অশ্রদ্ধা করে, তাঁদের অশুভ কর্মগুলো ভোগ করতে হয়। অনিবার্য ফল ভোগ করতে হবে। কে করবে? তার ভেতরে গোলমাল আছে যে, একজন আরেকজনের ফল কী করে ভোগ করে? রামের ঘাড়ে শ্যামের বোঝা চাপিয়ে দিলে!

—তা কালকে এক জায়গায় পড়ছিলাম—একটা মত খণ্ডন করছেন যে, যোগীরা বলেন—জ্ঞান হয়ে গেলে পরে তার প্রারব্ধের জন্যে বসে থাকতে হয়। এখন প্রারব্ধটা খুব তাড়াতাড়ি ক্ষয় করে দেওয়া যায়। যদি কিছু কায়ব্যূহ তৈরি করে। নতুন করে কিছু শরীর তৈরি করে নেয়, অন্য

কোন শরীরের মধ্য দিয়ে প্রারব্ধটা তাড়াতাড়ি করে ক্ষয় হয়ে যাবে। তাহলে সে তাড়াতাড়ি মুক্ত হয়ে যাবে। মানে বিদেহমুক্ত হয়ে যাবে। একে খণ্ডন করা হচ্ছে; বলে—না, ওরকম কথা তো নয়। কারণ, কর্ম ক্ষয় হওয়া—কর্ম ফল দেওয়ার কতগুলো নিয়ম আছে যে, কাল নিমিত্তের ওপর অপেক্ষা করে কর্ম ফল দেয়।

মহারাজ : যার কর্তৃত্ববোধ চলে গেল, তার আবার কর্মফল কী হবে? প্রারব্ধ সিদ্ধ কী করে হবে? প্রারব্ধ সিদ্ধ কী করে হল?

প্রারব্ধ সিদ্ধ্যতে তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতি।
দেহাত্মভানৈবে স্যাৎ প্রারব্ধ কুতঃ?।।

—দেহাত্মনা বলি যেখানে অন্বেষ্টব্য—

মহারাজ : যখন দেহাত্মভাব থাকবে না, তখন কর্মভোগ কী করে হবে? প্রারব্ধ বলে কিছু থাকে না তখন।

—শঙ্করাচার্য এক জায়গায় পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন, প্রারব্ধ কর্ম জ্ঞানীর থাকে না।

মহারাজ : প্রারব্ধ থাকে না, কারণ তার জ্ঞান হয়ে গেল। সে তো কর্তা নয়। তা ভোক্তা কেমন করে হবে?

—সেই। ওটা দার্শনিক দৃষ্টিতে দাঁড়ায়?

মহারাজ : শ্লোকটা ঐজন্যে বলছে—

প্রারব্ধ সিদ্ধ্যতে তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতি।
দেহাত্মভানৈবে স্যাৎ প্রারব্ধ কুতঃ?।।

—আজকে এই পর্যন্ত থাক মহারাজ।

মহারাজ : আর বেশি হলে গোলমাল হবে। (হাসি)

—প্রারব্ধের পক্ষে কালকে অনেক কথা হবে।

মহারাজ : কালকে হবে। তাই হোক। আজকে অ— একেবারে মেতে গেল।

—না মহারাজ। প্রশ্ন আসতে আসতে সময় হয়ে গেল। কালকে হবে।

মহারাজ : এখন কথা হচ্ছে, জগদীশ কথার মানে কী? জগতের নিয়ন্তা। এখন কলিকাল তো। কাজেই জগদীশ হচ্ছে ট্রেনিং সেন্টারের নিয়ন্তা। (সকলের হাসি)

—কলিকালের নিয়ন্তা আমি।

মহারাজ : কলির জীব ছোট হয়ে গেল।

॥ ১৩৭ ॥

মহারাজ : এক সাধু ছিল—খালি হাসত।

—গঙ্গার ওপরেই নাকি থাকতেন, তাই না মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ। তার নাম 'হেসো বাবা'।

—খালি হাসতেন। আর জপ করতেন গঙ্গার ওপর বসে। আর ঐ গঙ্গার ওপরে হল গঙ্গোত্রী? হেসো বাবা! সাধুদের নাম দিয়ে রাখে এক একটা।

মহারাজ : আরেকজন দেখেছি—যারা যেত স্নান করতে, পা তাদের মাথায় থাকত। মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রাখত। তাদের মাথায় পা রাখত। খবরের কাগজ পড় না, নাকি? কত interesting খবর সব।

—হ্যাঁ। সেই। এইরকম সব বাবাদের আমদানী হয়। আবার তিরোভাব ঘটে যায়।

মহারাজ : হেসো বাবা। কালী বাবা।

—তারপর ঐ কমলী বাবা ছিল। কালী কমলী—যাঁর নামে ছত্র আছে।

মহারাজ : কালী বাবা। কালো কম্বল একটা গায়ে দিয়ে থাকত। বড় বাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভিক্ষে করত। করে করে ঐ ছত্র প্রতিষ্ঠা করল।

—স্বামীজী lecture-এর মধ্যে তাঁর কথা বলেছেন। স্বামীজী কি তাঁকে দেখেছিলেন? যা বর্ণনা পাচ্ছি, তাতে মনে হয় যেন দেখেছেন।

মহারাজ : স্বামীজীকে জিজ্ঞেস করতে হবে।

—এখন তো জিজ্ঞেস করা মুশকিল। এখন তো দূরে আছেন। কোথায় আছেন, খুঁজে বের করতে হবে।

মহারাজ : ধ্যানেতে। কালী কমলী বাবার ছত্রেতে আমি ভিক্ষে করতাম।

—মহারাজ, ছত্র তো অনেক জায়গাতে। আপনি কোথায় করতেন?

মহারাজ : উত্তর কাশীতে। আর কালী কমলী বাবার ছত্র ঐ গঙ্গোত্রী, কেদার-বদরীর পথে পথে ছিল। সাধুদের ভিক্ষা দিত।

—এখনো আছে শুনি। কেদারের পথে আছে।

মহারাজ : তা টিকিট নিয়ে যেতে হতো।

—সব টিকিট দিয়ে দিত আগে আর কী। সেই টিকিটটা নিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে গেলে দিত। সাধুদের ভিক্ষা তখনকার দিনে এইরকম ছত্র থেকেই দিত।

মহারাজ : কারণ, সাধুদের ঐরকম ছত্র ছাড়া উপায় নেই। একসঙ্গে অত লোক গৃহস্থ বাড়িতে গেলে তারা কী করে দেবে? তবুও কোন কোন সাধু গৃহস্থ বাড়িতে ভিক্ষা করতে যেত। আমরা করতাম না। তাতে ওদের কষ্ট হবে।

—ছত্র ছাড়াও সাধুরা এমনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে, গ্রামে গিয়ে ভিক্ষে করে।

মহারাজ : রুটি খাওয়ায়। যখন ছত্রে দিত না তখন সাধুরা গৃহস্থ বাড়িতে ভিক্ষেয় যেত।

—ছত্রে শুধু খাওয়া-দাওয়াই দেয়, মানে রুটি ডাল—এইরকমই? না, অন্য কোন জিনিস যেমন শীতের জামা কাপড়—?

মহারাজ : সিধেও দেয়।

—শীতের জামা কাপড়? শীতবস্ত্র দেয় কিনা?

মহারাজ : শীতবস্ত্র বিশেষ নয়। তবে কেউ কেউ দেয়। ভক্তেরা ওখানে দিয়ে যায়। তারপর দেয়।

—কম্বল—এগুলোর দরকার আছে তো! শীতে দরকার আছে তো?

মহারাজ : উত্তর কাশীতে যারা, তারা দিত না। তবে কৈলাস মঠ থেকে দিত। কৈলাস মঠ থেকে আমি ভিক্ষা করেছি। আমি কৈলাস মঠ থেকে একটা কম্বল চেয়ে নিয়েছি। শীত শেষ হয়ে গেলে তখন আবার ফেরত দিয়েছি।

—ও আচ্ছা। শীতের পর আবার ফেরত দিতে হয়? তবে আরেকটা শুনেছি মহারাজ, ঐ হৃষীকেশে কৈলাস মঠে সাধুরা গিয়ে উঠতে পারে, ওখানে থাকতে পারে। ওদের ক্লাশ-টাশ হয়। তারা খুব খুশি হয় যদি আমাদের সাধুরা ঐ ক্লাশে যায়।

মহারাজ : ওরা খুশি হয় কিন্তু ওরা এলে আমরা কী করি? (সকলের হাসি) ঐরকম সাধুনিবাস হলো। আমি বলি—তোমাদের সাধুনিবাসে কারা থাকবে? তা বলে, সাধুরা থাকবে। ওদের থাকবার মতো আমাদের ব্যবস্থা আছে? ঐ যে আসবে সব নাগা সাধু। গাঁজা খাবে সব। সহ্য করবে? আর গাঁজা চলবে না। তারপরে কথা হল, অপরিচিত সাধু কে

কেমন? তা বলে, পরিচয় না থাকলে হবে না। বললাম, তাহলে খুব সাধুনিবাস হল!

—সেই। মানে বাইরের লোক, ওদের যেমন দরজা খোলা আছে, কেউ এল। ঐ খালি খাট আছে। তারপরে থাকল।

মহারাজ : এই এই। সাধুদের কেউ পরিচয় দিতে চাইবে না।

—এক রাত্রি ছিলাম যোশী মঠে। বলে যে, থাকব। তা একটা করে খালি খাট পড়ে আছে। তক্তপোশ। আর রাত্রিবেলা রুটিটুটি দিল, মুড়ি দিল। ব্যাস।

মহারাজ : কিন্তু সেখানে কোন পরিচয়ের দরকার হয় না।

—না মহারাজ। ওদের পরিচয়ের কোন বালাই নেই। যেমন আসছে, যাচ্ছে। আর সাধুদের যা ব্যবস্থা, খাবার-দাবার তাই খেতে হবে। এই রকমই ওদের থাকার ব্যবস্থা।

মহারাজ : রাজগীরে একটা মঠে উঠেছিলাম যেখানে ভিক্ষে দেয়। সাধুরা যারা যায় সেখানে—একসঙ্গে বসে খেত। আমাদেরও দিত তাই। এতটুকু তরকারি দিয়েছে। আমাদের এক গ্রাসের মতো। আমি আর বিমান মহারাজ ছিলাম। তা মনে করেছি, আবার দেবে। মনে করে খেয়ে ফেলেছি, তা মহন্ত—সে বলে—আরে, বাঙালী সাধু হ্যায়। দে ভাই কিছু। দে কিছু। (সকলের হাসি)

—সত্যিই তো। এক এক জায়গায় এক এক রকম খাওয়া-দাওয়ার style। একবারে মুশকিল হয়।

মহারাজ : তা আমি হালচাল জানতাম না। তারপরে আর তাদের ওখানে খেতাম না।

—রাজগীরে কি মহারাজ দশনামী সাধু সম্প্রদায়ের আশ্রমে উঠেছিলেন?

মহারাজ : হয়তো তারা উদাসী হবে।

—ওখানে এখনো জৈন সাধুদের আখড়া আছে।

মহারাজ : জৈন সাধুরা ওরকম করে ভিক্ষে করে না। তাদের ভক্তেরা যা দেয়। তারা ভিক্ষে করে না। তারা ছত্রে যায় না।

—নিজেদের ওখানে রান্না-বান্নার সব ব্যবস্থা রয়েছে।

মহারাজ : আরে সর্বনাশ! রান্না কী! পোকা মরে যাবে।

—মানে রান্না করা জিনিস ওদের দেওয়া হয়।

মহারাজ : রান্না করা জিনিস ওদের দেওয়া হয়, তাতে পোকা মারার পাপ তাদের লাগে না। স্নান করবে, তা গরম জল করে স্নান করতে পারবে না। অপরে গরম করে দিলে তখন স্নান করতে পারবে। আরেকজন সাধু বলছে যে, একদল ভক্ত সঙ্গে যাচ্ছে—তা বলছে, এ-ভক্তেরা আমাকে এত ভালবাসে, এত শ্রদ্ধা করে, সব জায়গায় গিয়ে আমাকে জিজ্ঞেস না করে রান্না করে না। রান্না করবে আমাকে জিজ্ঞেস করে। তখন আমি দাঁড়িয়ে শুনছি, একজন বলছে—তুমি তো বোকা, জান না! এই যে রান্না করে জিজ্ঞেস করে, পাপ তো তোমার ঘাড়ে পড়ে। (সকলের হাসি)

—বলে, ওরা তো ভক্ত লোক। আপনাকে না জানিয়ে কিচ্ছু করে না। রহস্যটা তো ঐখানে। সুতরাং পাপটা তো তোমার ঘাড়ে।

মহারাজ : সাধু নিয়ে গেছে তো ঐ জন্যে। পাপটা কারও ঘাড়ে দিতে হবে তো!

—সাধুর ঘাড়ে পাপটা যায়। জৈনরা তেমনি। বৌদ্ধরাও এখন ঐরকমই। মাছটা মেরেছে অন্য একজন, মানে বাজারে পেল মাছ। সেটা ওরা খেতে পারে বা ভিক্ষাতে খেতে পারে।

মহারাজ : বৌদ্ধরা বার্মাতে ছিল। তারা কারও কাছে যেত না। কারও বাড়িতে চাইত না। Line ধরে procession করে রাস্তায় যায়। ভক্তরা সব দিত। খাদ্যবস্তু দিত। ব্যবহারী অন্য প্রয়োজনীয় জিনিস দিত। ছাতা-পাতা সব দিত বৌদ্ধ সাধুদের।

—এখন অনেক আছে। বৌদ্ধ সাধু অনেক—সংখ্যা অনেক।

মহারাজ : জাপানে কিন্তু নেই।

—বৌদ্ধ সাধু—

মহারাজ : ঐ ভিক্ষে করে যারা ওদের—আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম Bachelor আছে কিনা? বলে Bachelor সাধু আছে বলে জানি না।

—মানে, বিয়ে করে আবার সব সাধু হয় নাকি?

মহারাজ : কী করে তা জানি না। ঐ শুনেই আমার আক্কেল গুড়ুম!

—ঐরকম আমরা শুনেছি যে, তিনবছর, পাঁচবছর একটা monastery-তে থাকে।

মহারাজ : বার্মাতে?

—বার্মাতে। হ্যাঁ। তারপরে আবার ঘর-সংসার করছে। কিন্তু Buddhist monk বলে তার নাম আছে।

মহারাজ : বার্মাতে ঐরকম গৃহস্থদের কিছুদিন করে সাধু হতে হয়।

—ঐরকম—

মহারাজ : আর স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়, তারা চাষবাস করে। চাষবাস শেষ হল, সব মঠে আসে।

—মঠে এসে গেল মানে, তারা আবার গেরুয়া পরতে শুরু করল নাকি?

মহারাজ : তারা খাওয়া-দাওয়া পাবে।

—ও, মানে সাধু হয়নি?

মহারাজ : সাধু?

—ওরা বিয়ে থা করে না হয় তো। বাড়িতে যায়।

মহারাজ : না না। বিয়ে থা করে। ছেলেপুলে থাকে। ঘর-সংসার সব আছে।

—স্বামী নারায়ণ তো ভীষণ কট্টর। খুব strict ওরা।

মহারাজ : Strict মানে, সাধুদের কোন মঠ নেই। মঠ আছে যেগুলো, সেগুলো lead করে গৃহস্থরা। স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের যিনি প্রবর্তক—সহজানন্দ স্বামী—তিনি মঠ করে তাঁর ভাইপোকে এনে সেখানে charge দিয়েছেন। কাজেই মঠে এখন সব গৃহস্থরা charge-এ। তারাই সাধুদের বলে—যাও, ঐ মঠে যাও। ঐ মঠে গিয়ে থাক।

—মানে গৃহস্থরাই trustee আর কী!

মহারাজ : গৃহস্থরাই charge-এ।

—কিন্তু ওদের সাধুরা তো মহারাজ plane-এ যখন travel করে, special plane। কোন air hostess থাকবে না।

মহারাজ : তাই নাকি?

—হ্যাঁ। Special plane থাকে। Plane-এ করে ওরা যখন travel করে, তখন ওরা বলে যে, air hostess পর্যন্ত থাকবে না। কোন মেয়েছেলে থাকবে না। এইসব বলছেন। কট্টর খুব।

মহারাজ : Plane-এ মেয়েছেলে থাকবে না—কে এইরকম ব্যবস্থা করবে?

—ওরা যখন travel করবে, তখন মহিলারা attend করতে পারবে না। ওরা দূরে থাকবে।

মহারাজ : আমি স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ের নাড়ীনক্ষত্র জানি।

—সেইজন্যই জিজ্ঞাসা করছি।

মহারাজ : মেয়েদের মঠ আছে সেখানে। মেয়েদের section আলাদা। তাদের section থাকে আলাদা।

—সহজানন্দ স্বামী এই ব্যাপারে খুব কড়া নিয়ম নাকি করে গেছেন। এইজন্য আমাদের জানার একটু ঔৎসুক্য।

মহারাজ : সংহিতা আছে। নাম হচ্ছে 'শিক্ষাপত্রী'।

—আমরা একটা কপি পেয়েছি।

মহারাজ : পেয়েছ?

—হ্যাঁ। সংস্কৃত থেকে আবার ইংরাজিতে অনুবাদ করে দিয়েছে। পেয়েছি মানে আমি ঐ খোঁজ করে একটা আনালাম আমাদের লাইব্রেরিতে রাখবার জন্যে।

মহারাজ : নিজে পড় নাকি?

—মঠে ওটা রাখা আছে মহারাজ।

॥ ১৩৮ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, বিরোধী পক্ষরা শঙ্করাচার্যকে প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ বলে কেন?

মহারাজ : প্রচ্ছন্ন বুদ্ধ এইজন্যে বলে যে, বৌদ্ধদের তত্ত্ব হল নাস্তিকতা। অর্থাৎ কিছুই থাকবে না জ্ঞান হলে। আর শঙ্করাচার্যের তত্ত্ব হল আস্তিক। অর্থাৎ জ্ঞানমাত্র থাকবে। জ্ঞানস্বরূপ থাকবে। তার নাশ হবে না। এই যে জ্ঞানস্বরূপে স্থিতি আর অস্থিতি—এই দুয়ের পার্থক্য তো আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

—Maharaj, attaining mukti if the knowledge does not increase further after four years...

Mj. : It has nothing to do with years. Mukti means going beyond time. It has nothing to do with years.

—ঠাকুর বলতেন না—রসে-বসে থাকব?

মহারাজ : ঠাকুরের কথা আলাদা। ঠাকুরের কথা আলাদা। তিনি রসে-বসে থাকুন, আর ভাল থাকুন তিনি। আমাদের তাতে লাভ এইটুকু যে, একজন এইরকম হতে পারেন—এই বোধটা আমাদের হবে। 'তদ্বিষ্ণুং পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ।' যারা সুহৃদ তারা সব এখানে থাকবেন।

—আমরা সুহৃদ না হলেও, সুহৃদ হলে যে অনুভব করতে পারব—এই ভরসা জাগায়। মহারাজ, 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'—এখানে জ্ঞান বলতে কী বোঝাচ্ছে?

মহারাজ : নির্বিশেষ জ্ঞান। আমরা যে জ্ঞান, জ্ঞান বলছি, সেগুলো বিশেষ জ্ঞান। বিশেষ জ্ঞানের উৎপত্তি এবং বিনাশ আছে। কিন্তু সেই জ্ঞানের উৎপত্তি-বিনাশ নেই। 'নোদেতি নাস্তমেতি সদ্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা।' তার উৎপত্তি নেই, বিনাশ নেই। তার উৎপত্তির কোন কারণ নেই। বিনাশের কোন কারণ নেই। এই। 'প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'—সেখানে নির্বিশেষ জ্ঞান। কোন বিশেষ নেই। সেখানে শুদ্ধ জ্ঞান মাত্র। সেখানে জ্ঞান মানে জ্ঞাতাও নয়।

—জ্ঞাতাও নেই। সমস্ত নিরোধ। বিষয়-বিষয়ীর জ্ঞান বলা হয় যেটাকে, সেটা নয়। এই বিষয়-বিষয়ী জ্ঞান নয়। মহারাজ, প্রশ্নটা হচ্ছিল যে, সময় বাড়লে পরে জ্ঞান বাড়বে কিনা? সেটা এখানে কালের সাথে সম্বন্ধ নেই।

মহারাজ : কালের দ্বারা তা সীমিত নয়। তার বৃদ্ধিও নেই, হ্রাসও নেই।

—আর কোন একটা বাহ্য জিনিসের রূপের সঙ্গে দেশের সম্বন্ধ আছে। লম্বা চওড়া এরকম সম্বন্ধ। সেসব তাতে নেই। এই জ্ঞানেতে—ব্রহ্মেতে দেশেরও কোন সম্বন্ধ নেই।

মহারাজ : দেশ বলছ?

—জ্ঞানের সঙ্গে দেশের কোন সম্বন্ধ নেই। আমাদের যে-জ্ঞান হচ্ছে তার সঙ্গে দেশের কোন relation নেই।

মহারাজ : তোমাদের জ্ঞানেতে আছে। তোমাদের যে-জ্ঞান হচ্ছে তাতে জ্ঞানের বিষয় আছে। প্রকৃত জ্ঞান—সেখানে নির্বিষয় জ্ঞান।

—বিষয় জ্ঞানেতে দেশের সম্বন্ধ আছে। কিন্তু জ্ঞানটা এত চওড়া, এতটা লম্বা—এইরকম আমরা কখনো ভাবিনি। আমাদের এই জ্ঞান।

মহারাজ : তুমি তো জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে বলছ, জ্ঞান সম্বন্ধে বলছ না।

—তাই। জ্ঞানের সঙ্গে দেশের কোন সম্বন্ধ হয় না।

মহারাজ : কালেরও কোন সম্বন্ধ নেই।

—না, আমাদের অজ্ঞান দূর হলে যে-জ্ঞান—সেটি কী?

মহারাজ : দেশ-কালের অতীত জ্ঞান।

—নির্বিশেষ জ্ঞান কি দেশ-কালের অতীত?

মহারাজ : নির্বিশেষ জ্ঞান দেশ-কালের অতীত। তার মানে কোন কালে জ্ঞান উৎপন্ন হল—তা নয়। অমুক অজ্ঞানী ছিল, জ্ঞানী হল—সে-জ্ঞান জ্ঞান নয়। ‘সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা। নোদেতি নাস্তমেতি সম্বিদেষা স্বয়ংপ্রভা।’ তার উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। তা স্বপ্রকাশ। অন্য জ্ঞানগুলো স্বপ্রকাশ নয়। আত্মজ্যোতির দ্বারা তারা প্রকাশিত। আত্মা কিসের দ্বারা প্রকাশিত? আত্মা স্বপ্রকাশ।

—সব জায়গায় বলা হচ্ছে একটা কথা—আমাদের কিছু ধরা-বোঝা যাচ্ছে না। আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। আমাদের ধরা-বোঝার বাইরে হয়ে যাচ্ছে।

মহারাজ : যতক্ষণ আমরা ধরব ততক্ষণ তো জ্ঞান নেই।

—সেই। আমরা বুঝতে চেষ্টা করছি জ্ঞানটা কিরকম।

মহারাজ : এই যে 'আমরা'-ই তো মুশকিল করলে। জ্ঞানে 'আমরা' নেই।

—আমরা নেই। তা আমরা আমাদেরকে ফেলতে পারছি না।

মহারাজ : আবার "আমরা' 'আমরা' বলছ!

—সেটাই বলছি যে, আমাদের 'আমরা'-টা থাকবে না, সেখানে গিয়ে জ্ঞান—

মহারাজ : তোমাদের 'আমরা' চিরকাল থাকবে। না হলে আমাদের কী করে হবে?

—আমরা কল্পনা করছি এরকম একটা অবস্থা।

মহারাজ : আমাদের সঙ্গে সম্বন্ধ নেই সে-জ্ঞানের। সে-জ্ঞান বৈষয়িক জ্ঞানকে প্রকাশ করে। তাকে কে প্রকাশ করে? কেউ না। সে নির্বিশেষ। নির্বিশেষ জ্ঞান।

—আসছি মহারাজ।

মহারাজ : আর, না এসে উপায় কী!

—দেশ-কালের অতীতের কথা হচ্ছে। আর সেখানে আমরা কী করব? কিছুই বলতে পারছি না। বলা কওয়া তো বন্ধ।

॥ ১৩৯ ॥

প্রশ্ন : ঠাকুর স্বামীজীকে বলছেন—যে রাম, যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ। রাম যে এবং কৃষ্ণ যে সে-ই রামকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছেন। আর স্বামীজী বলছেন রামকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ অবতার। তিনি নিজে যত অবতার আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ভাগবতে আছে—‘কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ম্।’ এবং বলরাম হল অংশাবতার। এইটা একটু বুঝিয়ে দিন।

মহারাজ : এ তো বৈষ্ণবদের জিজ্ঞেস করতে হবে।

—বৈষ্ণবদের জিজ্ঞেস করতে হবে?

মহারাজ : ভগবানের আবার অংশ হয় নাকি?

—না, ভগবানের অংশ হয় না। কিন্তু অবতারের অংশ হয়। বলরাম অংশাবতার। কৃষ্ণ হল পূর্ণাবতার।

মহারাজ : আরে অবতার, ভগবানের অংশ বলছি। ভগবান যিনি সর্বভূতে আছেন, তাঁর আবার অংশ হয় নাকি?

—না।

মহারাজ : তবে?

—আসি মহারাজ। (সকলের হাসি) শ্রী— মহারাজ বলছেন পরিষ্কার হয়নি।

মহারাজ : পরিষ্কার করতে হলে ঝাঁটা দরকার। (হাসি) এককথায় বলছি যে, যিনি সর্বভূতে আছেন, বিশ্বব্যাপী—তাঁর আবার অংশ হয় নাকি?

—এগুলো বৈষ্ণবরা একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে।

মহারাজ : বাড়াবাড়ি পুরাণেতে আছে। কাজেই তাদের অপরাধ কী?

—পুরাণেই আছে—অংশাবতার, কলাবতার।

মহারাজ : অংশাবতার, কলাবতার। কলা তো দর্শন কর। আর কী হবে?

—বলছেন, বলরাম হলেন শেষনাগের অবতার।

মহারাজ : শেষনাগ কি ভগবান নাকি?

—না, না। মহারাজ, উনি আরেকটা বলছেন যে—ভগবান না, ভগবানের দাদা। (সকলের হাসি)

মহারাজ : ঠাকুরকে স্বামীজী বলছেন—ভগবানের বাবা।

—তাহলে রামকৃষ্ণ ভগবান, আর অবতার দুই-ই?

মহারাজ : অবতার আর ভগবান—অবতার বললে কী বোঝায়? অবতার মানে ভগবান যখন দেহধারণ করেন, ভক্তদের কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ হন—তাঁকে বলে অবতার। ভগবান যখন অবতীর্ণ হন, তখন খানিকটা অবতীর্ণ হলেন, আর খানিকটা বাকি রইল—এইরকম হয় নাকি? পরিচ্ছিন্ন বস্তুর অংশ হয়, অপরিচ্ছিন্ন বস্তুর অংশ হয় না।

—রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।' আর বেদান্ত বলছেন, 'ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।' (মহানারায়ণোপনিষদ্, ১২।১৪) একমাত্র ত্যাগের দ্বারাই অমৃতত্ব লাভ হয়, ভোগের দ্বারা নয়।

মহারাজ : আবার অন্য কথায় চলে গেলে যে!

—রবীন্দ্রনাথের কথায় আছে, ভোগের দ্বারা অমৃতত্ব পাওয়া যায়। 'অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।'

মহারাজ : রবীন্দ্রনাথ তো ঋষি নন। আর ভগবৎ অনুভূতি তাঁর হয়েছে কিনা—এসম্বন্ধে আমরা কিছু জানি না। কাজেই রবীন্দ্রনাথের কথা নিয়ে বিচার করবার প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথের কথা—সত্যতা-অসত্যতা,

এগুলো শাস্ত্রের দৃষ্টিতে বিচার করতে হয়। শাস্ত্রই প্রমাণ। 'তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে।' শাস্ত্রই প্রমাণ। রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্র নয়, কবি।

—তিনি বলেছেন, 'অসংখ্য বন্ধন-মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ।'

মহারাজ : মানে বন্ধনেতে এত প্রীতি যে, আর মুক্তিকেও চায় না। কাজেই বন্ধনের ভিতরে থেকে মুক্তি চায়। বন্ধনকে না হলে চলবে না। ছেলেপুলে, নাতি—এগুলোকে নিয়ে মুক্তি চাই। এগুলিকে ছেড়ে মুক্তি আমি চাই না।

—উনি হয়তো ক্রমমুক্তি চাইছেন।

মহারাজ : ক্রমমুক্তি? ক্রমমুক্তি—তাহলে সে তো বলতেন, আমি ক্রমশ মুক্তি চাই। তা তো বলেননি।

—বন্ধনের মধ্যে মুক্তি—এটা কিরকম self-contradictory!

মহারাজ : এ যে সোনার পাথরবাটির মতো।

—উনি আর তর্কে যাচ্ছেন না। আপনার দৃষ্টিতেই ওনার সংশয় ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে।

মহারাজ : বাবা! বা বা বা! (সকলের উচ্চ হাসি) এই দেহের দৃষ্টিতে, না আত্মার দৃষ্টিতে?

—জ্ঞান হয়েছে, এমন যে বৃদ্ধপুরুষ তাঁর দৃষ্টিতে। সেই দৃষ্টিতে।

মহারাজ : অ্যাঁ? কী বলছে, বল তো।

—আপনি ইচ্ছে করে শুনতে চাইছেন না। (সকলের উচ্চ হাসি) জ্ঞান হয়েছে এমন যে বৃদ্ধপুরুষ, তাঁর দৃষ্টিতে। আপনি যে হেসেছেন, এতেই আমরা ফেঁসেছি। (সকলের হাসি)

মহারাজ : এই আরেকজন এসেছে।

—আপনার অনুমতি পেলে যেতে পারি।

মহারাজ : আচ্ছা এস। প্র— মাঝে মাঝে খুব সুন্দর প্রশ্ন করে। কিন্তু এখানে সকলের মাঝে মুখ খোলে না।

॥ ১৪০ ॥

প্রশ্ন : আমাদের এক প্রশ্ন আছে। হিন্দুরা কর্মবাদে বিশ্বাস করে। তাতে তো বলা হচ্ছে—যেমন কর্ম করবে তেমন ফল পাবে। শুভ কর্মে শুভ ফল পাবে, আর অশুভ কর্মে অশুভ ফল পাবে। এখন আমাদের অতীত, বর্তমান নির্ধারণ করেছে—

মহারাজ : কী গলা বাবা!

—অতীত পাপের কথা বলছে। সে বর্তমানকে নির্ধারণ করেছে। আবার বর্তমানটাও নির্ধারণ করবে ভবিষ্যৎকে। তাহলে আমাদের আর কী করণীয় রইল?

মহারাজ : এই, ভূত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ—এগুলি হচ্ছে পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টির দ্বারা দেখা। কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়। ত্রিকাল অবাধিতকে কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করে বিচার করা যায় না। তা তুমি কী বলতে চাইছ এখন?

—এই কর্মবাদের মধ্যে আমাদের কোন স্বাধীনতা আছে কি?

মহারাজ : কী বলছ?

—আমাদের ভবিষ্যৎ কি আমাদের ওপর নির্ভর করে না? নাকি আমার বর্তমানের ওপরে নির্ভর করছে? বর্তমানে আমার যা পরিস্থিতি—

মহারাজ : আমরা কারা?

—আমরা যারা নিজেদের সাধারণ মানুষ বলে মনে করছি।

মহারাজ : দেহ ইন্দ্রিয়ের ভেতরে সীমিত যে? তার কি কর্তৃত্ব আছে?

—হ্যাঁ, কর্তৃত্ব আছে। আমাদের আছে বলে বোধ করছি।

মহারাজ : বোধ কর বলেই সেটা সত্যি হবে?

—আমরা সত্যি বলে বলছি না মহারাজ, আমাদের যেটা মনে হচ্ছে, সেটা বলছি। আমি নিজেকে কর্তা বলে বোধ করছি, এখন আমার ভবিষ্যৎ যে-জীবন, সেটা আমার ওপর নির্ভর করে? নাকি?

মহারাজ : হ্যাঁ, তোমার ওপর। বর্তমানটা কার ওপর নির্ভর করে?

—বর্তমানটা নির্ভর করে অতীতের ওপর।

মহারাজ : তাহলে ভবিষ্যৎও তার ওপর নির্ভর করবে।

—সেইজন্যে। কর্মবাদ—হিন্দুদের যে-কর্মবাদ সেটা অদৃষ্টবাদের মতো হয়ে গেল। আমার নিজের কিছু করা প্রয়োজন।

মহারাজ : তোমার নিজের কিছু করা—তুমি কে?

—আমি কর্তা, ভোক্তা।

মহারাজ : কে বলছ হে?

—কর্তা, ভোক্তা।

মহারাজ : কর্তা, ভোক্তা তো পরিবর্তনশীল। তুমি কি নিজেকে পরিবর্তনশীল মনে করছ?

—এখনো তো আমি বোধ করি পরিবর্তনশীল।

মহারাজ : তুমি তাহলে জানলে কী করে? পরিবর্তনকে জানলে কী করে? একজন যদি অপরিবর্তনশীল থাকে, সে-ই পরিবর্তনকে জানতে পারে। পরিবর্তনকে পরিবর্তনের দ্বারা জানা যায় না।

—হ্যাঁ। অধিকতর পরিবর্তনশীল, আর অধিক পরিবর্তনশীল। তার মধ্যেও তো জানা বোঝা যায়।

মহারাজ : তাহলে এমন একজন হতে হবে যে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমানের অতীত। সে-ই পরিবর্তনকে দেখতে পারবে, বুঝতে পারবে। আর তুমি যদি পরিচ্ছিন্ন হও, তাহলে তুমি জানবে না।

—সেই তো। কিন্তু প্রশ্নটা হল তা না। আমরা অপরিবর্তনশীল বস্তুটি, মানে—আত্মার কথা বলছি না। আমরা বলছি যে, কর্মবাদের মধ্যে এই ধরনের একটা আপত্তি ওঠে। কর্মবাদে আপত্তি ওঠে যে, এখানে মানুষের নিজস্ব কোন ভূমিকা আছে কিনা।

মহারাজ : কর্মবাদ বলছ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

মহারাজ : কর্মবাদ মানে কী? বাদ মানে সত্যের অন্বেষণ—এই তো? তা সত্যের অন্বেষণ করলে তোমার ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এগুলোর ভেতরে থেকে সত্যটা পাবে কি?

—মহারাজ, একটু পরিষ্কার করে বলি। বলছেন, কর্ম যে আমাদের বর্তমানকে নির্ধারণ করছে, অতীতের কর্মফল আমরা বর্তমানে ভোগ করছি, আবার বর্তমানের কর্ম ভবিষ্যৎকে নির্ধারণ করবে। তাহলে আমাদের নিজস্ব পুরুষকার বা নিজেদের কিছু করার আছে? নাকি, শুধু কর্মই আমাদের পরিচালিত করবে?

মহারাজ : না না। অতীত মানে কার অতীত? বর্তমান মানে কার বর্তমান?

—আমাদের। জীবের।

মহারাজ : তোমার। যে-জীব সে ভোগ করবে তার কর্ম।

—তাহলে আমাদের যেটা পুরুষকার—

মহারাজ : জীব মানেই হচ্ছে—যে কর্তা, ভোক্তা। কর্তা ভোক্তা জীব। কর্তা—যে করেছে, আবার সে কর্ম করবে পরে।

—এই যে করার সময়, সেটা যদি আমার অতীতই আমাকে prompt করে তাহলে আমার নিজস্ব কিছু করার আছে কি?

মহারাজ : তুমি নিজস্ব কে আবার? এই হচ্ছে মুশকিল। তুমি নিজস্ব বলতে কাকে বলছ? যে-বস্তু কালের দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন? স্বাধীন মানে কার অধীনে?

—জীবের। যেটুকু নিজস্ব ইচ্ছে।

মহারাজ : স্ব মানে কে?

—জীব। এখন তো আমরা জীব হিসেবে নিজেকে বুঝছি—ভোক্তৃত্ব যতক্ষণ আছে, কর্তৃত্বও আছে।

মহারাজ : ভোক্তৃত্ব-কর্তৃত্ব যদি থাকে, তাহলে বর্তমানের কর্তৃত্ব ভবিষ্যতের কর্তৃত্বকে নিয়ন্ত্রিত করবে। আর বর্তমান কর্তৃত্ব অতীতের কর্তৃত্বের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পূর্ণ যে নিয়ন্ত্রিত হয় তার কর্তৃত্ব কোথায়?

—সেইটাই প্রশ্ন।

মহারাজ : পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ তো নয়। পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ হলে আর কর্তৃত্ব থাকে না।

—কিন্তু মহারাজ, গীতাতে যে ভগবান বলছেন—সবই আমি মেরে রেখেছি, অর্জুন, নিমিত্তমাত্র হও। এই যে ভবিষ্যৎটি তিনি নির্ধারণ করে রেখেছেন, তাহলে তো আমার কর্তৃত্ব কিছু রইল না।

মহারাজ : আমি মেরে রেখেছি মানে, তোমার কিছু করবার নেই। তুমি অকর্তা। বক্তব্য এই যে, আমরা মনে করছি যে, আমরা করছি। সত্যি সত্যি আমরা কর্তা নই।

—আচ্ছা। এটার তাৎপর্য এভাবে বুঝতে হবে। ভগবান অর্জুনকে শেখাচ্ছেন, তোমার কর্তৃত্ব নেই, তুমি অকর্তা। কিন্তু যাদের তিনি মেরে রেখেছেন, সেটা কী—মানে ভগবান তাদের ভবিষ্যৎটা নিজে নির্ধারণ—

মহারাজ : মড়াগুলোকে খাঁড়া দিয়ে মারা?

—না।

মহারাজ : আমি মেরে রেখেছি মানে, যিনি ভগবান তাঁর কাছে কালের পরিচ্ছেদ নেই তো। সুতরাং যারা মরবে, তিনি তাদের মেরে রেখেছেন। সেখানে কালের পরিচ্ছেদ নেই।

—কিন্তু আমাদের একটা প্রশ্ন দাঁড়ায়, যাদের তিনি মেরে রেখেছেন বলেছেন—তাদের তো নিজস্ব একটা স্বাধীনতা আছে। তারা তো change করতে পারত।

মহারাজ : না। এখানে ভগবানের দৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন ঘটছে না। কারণ তিনি অপরিচ্ছিন্ন। কালের দ্বারা তাঁর দৃষ্টি পরিচ্ছিন্ন নয়।

—আজকে থাক।

মহারাজ : স্বীকৃত হল না। স্বীকৃত তো হল না।

—পরে আবার হবে। সময় লাগবে।

মহারাজ : উনি বলেছেন তো মেনে নিন না। (সকলের হাসি)

—ধামাচাপা রইল, মানে ধামা একটা চাপা রইল।

॥ ১৪১ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, বদরীনারায়ণ ঘুরে এলাম।

মহারাজ : ঘুরে এসেছ বদরীনারায়ণ? কেদার গেছিলে?

—না। বদরীনাথ যেতে এখন সুবিধে হয়ে গেছে তো। একেবারে গাড়ি মন্দিরের কাছে চলে যায়।

মহারাজ : না। মন্দিরের কাছে যায় না।

—না, এপারে থাকে। প্রথম মন্দির যেদিন খুলেছে, সেদিন গিয়ে দর্শন করেছি।

মহারাজ : বাবা! বরফের ভেতরে?

—এখন খুব বরফ আছে।

মহারাজ : বরফ দেখতে গুলমার্গে যেতাম।

—এটা কোন জায়গায় মহারাজ?

মহারাজ : কাশ্মীরে। গুলমার্গ আছে, আবার আর একটু দূরে খিলেনমার্গ। সেখানে সব স্কি করতে যায়। আইস স্কি। করতে দফারফা শেষ করে দিলে। সেসময় যোশীমঠ-টোশীমঠও সব জায়গায় famine হতো। সেটা লোকালয়ে হতো। এক জায়গায় famine হল তো সমস্ত দেশ জুড়ে হতো।

—এখন কম হয়।

মহারাজ : কম হয় বলছ? কম হয় না। কত জায়গায় তো আমাদের সময় রিলিফ হল।

—তা আপনার সময় তো বেশ কয়েক বছর আগে।

মহারাজ : ও, তা-ও বটে। আমাদের বড় রিলিফ হল প্রথমে বাঁকুড়ায়। তারপরে মেদিনীপুরে রিলিফ তো লেগেই থাকত। মেদিনীপুরটাকে বলতাম আমাদের রিলিফ ট্রেনিং সেন্টার।

—এটা ভাল বলেছেন। রিলিফ ট্রেনিং সেন্টার। ওখানে ঝড় বন্যা লেগেই আছে। মহারাজ, গত famine-এর কিছু মনে আছে?

মহারাজ : বড় famine-relief হয়েছিল বাঁকুড়ায়।

—আপনারা করেছেন মহারাজ?

মহারাজ : না। আমাদের আগে হয়েছিল। তুলসী মহারাজ, তাঁরা রিলিফ করেছিলেন। আমার হাতে-খড়ি হল মেদিনীপুরে।

—ওটা famine-relief ছিল মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ, famine-relief।

—কোথায় মহারাজ?

মহারাজ : আমাদের centre ছিল চণ্ডীপুরে। কয়েকটা centre ছিল। চণ্ডীপুরের ভগবানগোলায়।

—বলছি, নামগুলো মনে আছে?

মহারাজ : হাতেখড়ি, মনে থাকবে না?

—চণ্ডীপুর centre হয়ে গেছে তখন?

মহারাজ : চণ্ডীপুর আশ্রম হয়েছে। তা, থাকব কোথায়? জায়গা নেই। আশ্রমের একটা বাড়ি ছিল। সেটা পড়ে গেল flood-এ। পুকুর-পাড়ে একটা ঘর ছিল। দুটো ঘর একসঙ্গো। তার একটা ঘরে চালের গুদাম হল। আরেকটা ঘরে জায়গা নেই। তা বারান্দায় মাচা করে আমরা শুতাম।

—মহারাজ, আপনাদের রেঙ্গুনের যে রিলিফ ওটা দারুন ভয়াবহ!

মহারাজ : সেখানে সব বার্মার লোক। রেঙ্গুন তো বড় শহর। সবাই এসে পড়েছিল। আর রাস্তা নেই, কিছু না। কলেরা হল রাস্তায়। মিলিটারিরা—গ্রামের খাবার জলের সোর্স আছে, সেখানে মিলিটারী পুলিশ পাহারা দিত। সেখানে কাউকে যেতে দিত না। লোকে জল খেতে পায় না। যারা পয়সা কিছু সঙ্গো এনেছিল, এক গ্লাস জলের দাম দশ টাকা। রিলিফ সেন্টারে পৌঁছে, তা বলে—জল আন। জল দিলাম। তা বলছে, কত লাগবে? বললুম—লাগবে না।—সে কী! লাগবে না? আমি বললুম—জল আমরা বিক্রি করি না। তা বলে—বলেন কী! আমরা তো এক গ্লাসের দাম দশ টাকা অবধি দিয়েছি। রেঙ্গুন-রিলিফ দারুণ ভয়াবহ।

—মহারাজ, তখন কি ভারতীয় যারা ছিল ওখানে, সব চলে এসেছিল?

মহারাজ : ভারতীয়রা চলে এল। কিছু কিছু বার্মিজও এসেছে। তা বেশির ভাগই হল ভারতীয়। আর রাস্তায় কলেরা। এরপর ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া। অনেক লোক মারা গেছে।

—মহারাজ, পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে-উদ্বাস্তুরা এসেছিল, তাদের ওখানেও রিলিফ হয়েছিল আমাদের?

মহারাজ : পিলভিতে রিলিফ হয়েছিল। তারপর গেছিলাম মেডিক্যাল রিলিফ করতে। তখন জওহরলাল নেহরু এলেন। বললেন, কজন আপনাদের ডাক্তার আছে? তখন একজনও ডাক্তার ছিল না—qualified ডাক্তার একজনও না। তখন বলেন, তাহলে কী করে রিলিফ হবে? আমি বললাম, experienced medical work হবে। বলেন, তাতে হবে না। Medical Relief করতে দেয়নি।

—মহারাজ, যাদের কারণে এত মানুষ কষ্ট পেল, তাদের কী হল?

মহারাজ : কিছু টাকা শুষে নিল, আর কী করবে! তারাও evacuate হয়েছিল। রেঙ্গুন থেকে সাহেবরাও evacuate করেছিল। দুটো রাস্তা ছিল—black road আর white road। কালা আদমীদের white road-এ যেতে দিত না, কলেরা-ফলেরা ছড়াবে বলে। তারপর black road দিয়ে আসতে হতো। পুণ্যানন্দ স্বামীও তখন রেঙ্গুন সেবাশ্রমের চার্জে ছিল। সে দলবল নিয়ে এল। তবে তাকে white road দিয়ে আসতে দিয়েছিল।

—ওঁরাও কি পায়ে হেঁটেই এসেছিলেন?

মহারাজ : তাছাড়া কোন উপায় ছিল না। আর সব মেডিক্যাল যন্ত্রপাতি যত, একটা ঘরের ভেতরে রেখে এক জায়গায় দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। ঢোকবার পথ নেই। আর আশা ছিল না যে, কিছু পাওয়া যাবে। কিন্তু তারপরে গিয়ে দেখা গেল সেখানটা কেউ কিছু করেনি।

মানে কল্পনা করেনি এর ভেতরে কিছু আছে। অন্য জায়গায় লুটপাট করেছে।

—কত দিন পরে গিয়ে আবার হাসপাতালে possession নেওয়া হয়েছিল?

মহারাজ : কত দিন পরে তা আমার মনে নেই। War শেষ হয়েছে, তারপর।

—তারপরে তো একবারে চলে আসতে হল।

মহারাজ : সে অনেক পরে। রহড়ায় orphan-দের নিয়ে আশ্রম করা হল।

—পুণ্যানন্দ স্বামীই করলেন ওদের নিয়ে?

মহারাজ : হ্যাঁ, পুণ্যানন্দ স্বামী। Government টাকা দিয়েছিল।

—আমরা একটা ছবি দেখেছিলাম। আপনি আর পুণ্যানন্দ স্বামী হাঁটছেন রহড়াতে।

মহারাজ : দুজনেরই তো পা ছিল। (সকলের হাসি)

—যেটা ঐ ছবিতে বোঝা যাচ্ছিল, দুজনেরই পা ছিল তবে, যেন walking competition-এ participate করার ছবির মতো।

মহারাজ : রহড়াতে স্কুল দেখতে গিয়েছিলুম। আমি তাদের committee member ছিলুম।

প্রশ্ন : মহারাজ, যখন শরৎ মহারাজ Secretary ছিলেন উনি তখন রিলিফ দেখাশুনা করতেন? মঠ থেকে যে রিলিফ হতো?

মহারাজ : দেখাশুনা উনি নিজে করতেন না। মঠ থেকে হতো।

—মহারাজ তখন এইরকম রিলিফ সেক্রেটারি টেক্রেটারি ছিল?

মহারাজ : আরে না। এসব তোমাদের নতুন কীর্তি।

॥ ১৪২ ॥

প্রশ্ন : জড় আর চেতনের তফাৎ কী?

মহারাজ : বলছি, শোন। That which grows from within is চেতন and which does not, is জড়। এই হল জড় আর চেতনের বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা। আর বৈদিক ব্যাখ্যা হতে পারে যে, যা স্বপ্রকাশ তাই চেতন। আর যা পরপ্রকাশ তাই জড়।

—একবার এইরকম বলেছিলেন, যে নিজেকে জানতে পারে এবং অপরকেও জানতে পারে, সেই চেতন।

মহারাজ : আর যে শুধু নিজেকে জানতে পারে? সে কী হবে?

—জড় তো নিজেকেও জানতে পারে না।

মহারাজ : কাজেই জড় চেতন নয়।

—সে নিজেকেও জানতে পারে না, অপরকেও জানতে পারে না।

মহারাজ : তাহলে তোমাদের যে দুটো বললে, যে নিজেকেও জানতে পারে, অপরকেও জানতে পারে—

—সব জানতে পারে, তাহলে।

মহারাজ : আমি বলেছি প্রকাশধর্মী হল চেতন। যা স্বপ্রকাশ তাই চেতন। যারা পরপ্রকাশ তারা অচেতন।

—কিন্তু মহারাজ, সব কিছুই যখন চৈতন্য-আশ্রয়, তাহলে জড় কী করে ভেদ করা যাবে? এইটে বোঝা যায় না।

মহারাজ : সব কিছুই যখন— ?

—সব কিছুর আশ্রয় যখন চৈতন্য, তাহলে জড় এবং চেতনের মধ্যে তফাত কী?

মহারাজ : তফাত আশ্রয়ী আর আশ্রয়। এই তো—তোমার ভাষাতেই বোঝা যাচ্ছে।

—না, আশ্রয়ী হলেও তার তো আলাদা সত্তা নেই বলে সিদ্ধান্ত হচ্ছে।

মহারাজ : তা নাই হল। তার যে প্রকাশ হচ্ছে, সে তো তার নিজের প্রকাশ নয়—পরপ্রকাশ।

—পরপ্রকাশ বলে তার তো নিজস্ব কোন সত্তা নেই। চৈতন্যই তার সত্তা।

মহারাজ : সত্তা, চৈতন্য—এগুলি একই বস্তুর বিভিন্ন প্রকাশ। যা স্বপ্রকাশ, তা-ই স্বয়ংসিদ্ধ। আর যে জড় সে পরতঃসিদ্ধ।

—ঠিক আছে মহারাজ। যেমন একটা মৃতদেহ আর একটা জীবন্ত মানুষ। দুটোর ক্ষেত্রেই আমরা বলছি, চৈতন্যই তার আশ্রয়। তাহলে মৃতদেহের সঙ্গে জীবন্ত দেহের তফাত কী?

মহারাজ : চৈতন্যের আশ্রয় মানে, আমরা যে জড়কে দেখছি তা চৈতন্যের সাহায্যে দেখছি তো।

—চৈতন্যের সাহায্যে দেখছি। তাহলে মৃতদেহের আশ্রয় চৈতন্য যেটা বলছি—

মহারাজ : আচ্ছা। আশ্রয় হল চৈতন্য। আর আশ্রয়ী হল জড়। এ তো তোমার ব্যাখ্যাতেই হয়ে গেল।

—না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা সেই সত্তাকে মানছি না। জড়ের পৃথক সত্তাকে তো মানছি না। আশ্রয়ী যে তার তো পৃথক সত্তা নেই—

মহারাজ : প্রকৃত সত্তা মানে প্রাকৃতিক সত্তা আছে তো?

—এই ব্যাবহারিক সত্তা যেটাকে বলি, দেখা যাচ্ছে যখন—

মহারাজ : প্রাকৃতিক—প্রকৃতির সত্তা যাকে সত্তা বলছি।

—তা আছে।

মহারাজ : তাহলেই হল।

—তাহলে এই জড় এবং চেতনের পার্থক্য এই প্রকৃতি পর্যন্ত?

মহারাজ : আমি বলেছিলুম, স্বপ্রকাশ আর পরপ্রকাশ। এই তো পরিষ্কার কথা। এইজন্য মনও জড়।

—মনও জড়?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—মহারাজ, যেটা বলছিলেন যে, জীবন্ত মানুষ আর মৃতদেহ—দুটোরই তো আশ্রয় চৈতন্য?

মহারাজ : না। দুটোরই প্রকাশ হচ্ছে চৈতন্য।

—আচ্ছা। যদি দুটোই চৈতন্যের দ্বারা প্রকাশিত হয় তাহলে দুটোর মধ্যে তফাত তো আমরা করি। একটাকে বলি চেতন আর একটাকে বলি মৃত।

মহারাজ : এইজন্য বলি যে, একটা নড়ে না চড়ে না। আরেকটা নড়ে চড়ে। এই বলি। আমাদের বিচারে এইখানেতে দাঁড়াচ্ছে। এরই দার্শনিক ব্যাখ্যা হল স্বপ্রকাশ আর পরপ্রকাশ।

—মহারাজ, জড় তো চৈতন্যের প্রকাশে প্রকাশিত হচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে তার মধ্যে চৈতন্যের ঘাটতি বা অভাব আছে আমরা বলতে পারব?

মহারাজ : চৈতন্যের অভাব তার ভেতরে, নাকি চৈতন্যের ভেতরে? তফাতটা কী হল? তার প্রকাশটা নিজের প্রকাশ নয়, চৈতন্যের প্রকাশ।

—তা হোক, কিন্তু চৈতন্যের তো কখনো ঘাটতি হচ্ছে না।

মহারাজ : তাহলে?

—তাহলে জড় কেন বলছি? চৈতন্য তো রয়েছেই। তার সঙ্গে সঙ্গে—

মহারাজ : আমরা বলছি যে—সে চেতন, জড় নয়। যখন তার প্রকাশটাকে

বলছি, তখন সে পরপ্রকাশ। সে নিজে প্রকাশিত নয়। নিজেকে নিজে প্রকাশ করে না। এইটাই তো খুব বিজ্ঞানসম্মত অর্থ। আমরা জড়-চেতন বলি। পাথরটা নড়ে না, পাথরটা জড়। মড়াটা নড়ে না মড়াটা জড়। তাহলে যে ক্রিয়াশীল নয়, সে হল জড়। কাজেই যদি চুপ করে পড়ে থাকে, তাহলেও তার ভেতরে ক্রিয়া হচ্ছে। বাহ্য ক্রিয়া হচ্ছে না, ভেতরে ক্রিয়া হচ্ছে। এই হচ্ছে তফাত।

—তাহলে তো মহারাজ, দেহ-মন—জীবন্ত মানুষের দেহ-মনও তো জড়। আর মৃত মানুষের দেহও জড়। তাহলে একটা চৈতন্যে প্রকাশিত হচ্ছে, আরেকটা প্রকাশিত হচ্ছে না কেন?

মহারাজ : কেন হচ্ছে না—প্রশ্ন নয়। এটা প্রাকৃতিক, আমরা দেখতে পাচ্ছি। একটা প্রকাশ—এই জগতের ভেতর একটাই প্রকাশ। তার দ্বারা সমস্ত প্রকাশিত হচ্ছে। সুতরাং এক প্রকাশের স্বরূপে সব আরোপিত হচ্ছে। 'তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি।' সংস্কৃতে বললে বেশ সুন্দর হয়।

—এই যে আমরা কথা বলছি, আমরা ক্রিয়াশীল, এটাও তো জড়। এটা তো—

মহারাজ : তুমি জড়?

—এই তো, মন বা আমাদের দেহ জড় তো।

মহারাজ : তুমি কি দেহ, নাকি ঘোড়ার ডিম—বল না। মরে গেলে তোমার দেহটা থাকবে তো? তুমি কিন্তু এখনই মরবে না। (সকলের হাসি)

—না, এখন মরা যাবে না।

মহারাজ : না, বলা যায় না। অনুমান করা যায়।

—হ্যাঁ, জীবন্ত মানুষের দেহ-মনও তো জড়।

মহারাজ : জড় বৈকি।

-তাহলে সেইটেই প্রকাশিত হচ্ছে বা ক্রিয়াশীল হচ্ছে চৈতন্যের দ্বারা। তাহলে সেই চৈতন্যের দ্বারা মৃতদেহটা কেন প্রকাশিত হবে না?

মহারাজ : মৃতদেহটা প্রকাশিত হচ্ছে অপরের কাছে। মৃত ব্যক্তির কাছে মৃতদেহ প্রকাশিত হচ্ছে না।

—ঠিক। আমাদের কাছেও তো হচ্ছে না। মৃত বলেই তো।

মহারাজ : এইজন্যেই তো মৃত বলছি তাকে। যার ভেতরে সৎ-চিৎ-আনন্দ স্বরূপের উপলব্ধি হচ্ছে না, তাকে আমরা মৃত বলছি। সচ্চিদানন্দ সব জায়গায় আছে। কিন্তু কোন জায়গায় প্রকাশিত, কোন জায়গায় অপ্রকাশিত। এই তো তফাত।

—এখানে প্রকাশের বাধাটা কী হল? মৃতদেহে প্রকাশটা হচ্ছে না কেন?

মহারাজ : মৃতদেহ মৃতের কাছে প্রকাশ হচ্ছে না। অপরের কাছে তার প্রকাশ হচ্ছে।

—আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পড়ে আছে।

মহারাজ : ঐ তো বলছি, তার প্রকাশ হচ্ছে। কিন্তু মড়া জানে না যে সে মরে গেছে।

—ও যেটা বলতে চাইছিল মহারাজ, যে-সত্তার প্রকাশ হচ্ছে আমাদের কাছে। যে আছে, সত্যি আছে, মৃত শরীরটি আছে। সত্তা আছে। কিন্তু ক্রিয়ার কোন প্রকাশ হচ্ছে না।

মহারাজ : কার ক্রিয়ার প্রকাশ হচ্ছে? ক্রিয়া কিন্তু সত্তার ধর্ম নয়।

—সত্তার ধর্ম নয়?

মহারাজ : না। একটা পাথর সে গড়িয়ে পড়ে। তুমি বলছ, পাথর গড়াচ্ছে বলেই তো—সেটা কার ক্রিয়া, পাথরের ক্রিয়া?

—না। তার পেছনে—চেতন আছে। যন্ত্রে ক্রিয়া চলছে, কিন্তু তার পেছনে—

মহারাজ : আরে, তার বৈচিত্রের পেছনে যে প্রকাশধর্মী, তাকে বলি চেতন। আর যে প্রকাশধর্মী নয়, তাকে বলি অচেতন বা জড়। এ তো সোজা কথা। প্র— হাসপাতালে থাকলেও প্র—, এখানে থাকলেও প্র—।

—সে তো হাসপাতালে থাকতে মায়ের মন্দিরে পুজো করতে পারত না।

মহারাজ : তা পারত না।

—সেইরকম আমাদের—

মহারাজ : মনে মনে করতে পারে।

—না, আমরা পূজা অর্থে যেটা বলে থাকি, সেটা হতো না।

মহারাজ : মনে মনে করতে পারে, বাইরেও করতে পারে।

—আমাদের কাছে এইরকম প্রশ্ন করে সাধারণ লোকেরা আর কী যে, চৈতন্য তো সর্বব্যাপী। সব জায়গাতেই রয়েছে। তাহলে এই মড়ার ভেতরেও রয়েছে। জীবন্ত মানুষের ভেতরেও রয়েছে।

মহারাজ : তাহলে সব জায়গায় চৈতন্য রয়েছে, নাকি চৈতন্যতে সব জিনিস রয়েছে?

—না, সাধারণ লোকের ভাষাতে বলছি আমি। দার্শনিক ভাষায় বলছি না। আমি তাদেরই ভাষায় বলছি। লোকে বলে চৈতন্য সব জায়গায় রয়েছে। তাহলে মরা মানুষের মধ্যে—

মহারাজ : সেটা কে অনুভব করে বলে? শোনা কথা বলে।

—শোনা কথা। এটা হল মানুষের প্রশ্ন যে, তাহলে মরা মানুষের মধ্যে তারা কেন জীবন দেখতে পায় না, সেইটা বলে।

মহারাজ : তার কারণ কোন জায়গায়, তোমার ভাষাতে, কোন জায়গায় চৈতন্যের প্রকাশ আছে, কোন জায়গায় নেই।

—চৈতন্য তো সর্বব্যাপী বলা হচ্ছে।

মহারাজ : ঐ তো বললুম। প্রকাশের দিক দিয়ে পার্থক্য আছে। কোন জায়গায় স্বয়ংপ্রকাশ, কোন জায়গায় পরপ্রকাশ। এটা খুব স্পষ্ট হল। চৈতন্য নিজে স্বপ্রকাশ। তা যদি না হতো তাকে আবার কে প্রকাশ করছে? তাহলে আরেক চৈতন্য স্বীকার করতে হয়। তাকে আবার প্রকাশ করবে কে?

—প্রশ্নটা ঐখানটায় বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে—আমরা যখন জীবন্ত মানুষ, কথাবার্তা বলছি, আমরা ক্রিয়াশীল। এক্ষেত্রেও তো আমাদের চৈতন্যই প্রকাশিত করছে আমাদেরকে।

মহারাজ : করছেই তো।

—আবার মৃতদেহকে কেন করছে না?

মহারাজ : করছে তো।

—সে তো করছে। কিন্তু ক্রিয়াশীল নয় তো।

মহারাজ : তুমি দেখতে পাচ্ছ?

—দেখতে পাচ্ছি তো। আমি যেহেতু আমার ওপর চৈতন্যের প্রকাশ ঘটছে বুঝি, সেরকম তার ওপর ঘটছে কি? সেইটা হচ্ছে জিজ্ঞাসা।

মহারাজ : সে অনুভব করছে কিনা জানি না। মরে দেখতে হয়। তবে তাকে আমি দেখতে পাচ্ছি তো। আমার কাছে তার প্রকাশ হয়েছে।

—কিন্তু তাতে বোঝা যাচ্ছে, আমাদের ওপর চৈতন্যের প্রকাশ ঘটছে। কিন্তু মৃতদেহটার ওপর ঘটছে, সেটা তো বোঝা যাচ্ছে না। ওখানে কেন

ঘটছে না? এটা কি প্রাণের ক্রিয়া বন্ধ হয়েছে বলে? আমরা সাধারণত এরকম বলি। তবে সেটা তো আর চৈতন্যের অবলুপ্তি নয়।

মহারাজ : তমপ্রদামসত্তানাং স্ব চিদাত্মনা।
পরঃকামেতি ভাবনা জ্ঞানকর্মভিঃ।

এই আছে। আরেকটা হচ্ছে—

অস্তি-ভাতি-প্রিয়ং নামরূপঞ্চ তত্ত্বপঞ্চকম্।
আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রূপং ততদ্বয়ম্।।

—ঠাকুরের কথার মধ্যে আছে যে, চৈতন্য সব জায়গাতেই আছে, কিন্তু প্রকাশের কম বেশি—কোথাও কম কোথাও বেশি।

মহারাজ : চৈতন্যের প্রকাশ মানে কী?

—চৈতন্যের প্রকাশ বলতে—আমার তো মনে হয় ঈশ্বরের প্রকাশ।

মহারাজ : চৈতন্যই প্রকাশস্বরূপ—ঠিক কথা। কিন্তু আমরা যারা অজ্ঞানী, আমরা এখনো জানি না তো, চৈতন্য বস্তুটা আমরা জানি না। আমরা তাদের বলছি—চৈতন্য এখানে বেশি প্রকাশ, এখানে কম প্রকাশ।

মহারাজ : তা ভালই তো।

—কিন্তু এখানে কম আর বেশি হচ্ছে কেন?

মহারাজ : হচ্ছে কেন? তোমাদের দৃষ্টিতে। কারণ, চৈতন্যকে তোমরা দেখছ না বলে।

—জানি না। আমাদের তো এইজন্য সংশয় হচ্ছে।

মহারাজ : জানি না, দেখছি না—একই কথা তো।

—হ্যাঁ, একই কথা। সেইটেই ঠাকুর যে বলেছেন—কোথাও কম, কোথাও বেশি। এগুলোর কি এই ব্যাখ্যা যে, কোথাও কম হচ্ছে, কোথাও বেশি হচ্ছে?

মহারাজ : এগুলো তো প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ।

—প্রত্যক্ষ—?

মহারাজ : প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ এইগুলি।

—কিন্তু আমাদের কাছে বোঝা যায় না যে, কেন এখানে কম হল, কেন ওখানে বেশি হল। আবরণটা কী এখানে?

মহারাজ : জড়ত্ব আবরণ।

—বা গুণের দিক থেকে অনেকে বলে যে, তমোগুণ বেশি। সেইজন্যে এখানে প্রকাশ কম।

মহারাজ : আমরা বলি সৎ-চিৎ-আনন্দ। ওরা সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ বলে। সত্ত্ব দ্বারা অস্তিত্ব, রজঃ দ্বারা ক্রিয়া, তমঃ দ্বারা জড়। এই তিন গুণের ফলে বলে।

—আজ এই পর্যন্ত থাক মহারাজ।

॥ ১৪৩ ॥

মহারাজ : বল, আমার জন্য কী এনেছ—

—মনে পড়ল মহারাজ—ঠাকুরের এরকম অভ্যাস ছিল, গোপালের মাকে দেখলেই বলতেন—কী এনেছ ভাল জিনিস?

মহারাজ : তা আমি তো এমন কিছু ভাল জিনিস চাই না। ভাল কথা চাই।

—সেটা আরো কঠিন জিনিস। আমাদের একটা কথা হচ্ছিল, সেটা আমরা পাচ্ছি না কোথাও যে, সরোবর কয়টি আছে।

মহারাজ : কখানা আছে, তা জানি না।

—যেমন পাঁচটি নদ-নদী—

মহারাজ : মানস সরোবর আছে।

—নারায়ণ সরোবর আছে। তারপরে পম্পা সরোবর আছে। বলছে, ওটা কোথায়? আমি বলছি, রামায়ণে আছে।

মহারাজ : আর ওটা কী ঐ আজমীরের কাছে?

—পুষ্কর।

মহারাজ : 'পুষ্কর দুষ্করং বারি।'

—আর বিন্দু সরোবর ভুবনেশ্বরে আছে।

মহারাজ : তা আছে।

—তারপরে নরেন্দ্র সরোবর।

মহারাজ : নরেন্দ্র সরোবর?

—নরেন্দ্র সরোবর বলে ঐ পুরীতে।

মহারাজ : ও হ্যাঁ। চন্দনযাত্রা হয় সেখানে।

—বৃন্দাবনে ঐ কুসুম সরোবর। ঐ দেখুন মহারাজ, বলছে এইরকম করে তো বাড়ানো যায়। রবীন্দ্র সরোবরও আছে।

মহারাজ : একটা ডোবা খুঁড়ে সেটাকে সরোবর বলা যায়। সরোবরের অপভ্রংশ হল সায়র। তা, আমাদের জামতাড়ায় আছে ভাবসায়র। ভাব মহারাজ যখন মোহন্ত ছিল তখন একটা পুকুর খুঁড়েছিল। সেইজন্য তার নাম ভাবসায়র।

—এইরকম কোন নির্দিষ্ট আছে কিনা—পাঁচটা, সাতটা?

মহারাজ : গোনা যায়। গুনলেই হল। ও একটা কী? ভাল কথা বল।

—আমি তো আগেই বললাম মহারাজ, আজ ভাল কথা পড়িনি। ভাল কথা কি যখন তখন হয়, মহারাজ?

মহারাজ : ভাল কথা যখন তখন হয় না? (সকলের হাসি)

প্রশ্ন : মহারাজ, স্বামীজী এক জায়গায় বলছেন, 'আমি এক প্রকারের জড়বাদী। কারণ, আমি একটিমাত্র সত্তায় বিশ্বাস করি। আধুনিক জড়বাদীও এইরূপ বিশ্বাস করিতে বলেন। তবে তিনি শুধু উহাকে জড় আখ্যা দেন। আর আমি উহাকে ব্রহ্ম বলি।' এটার কী তাৎপর্য? একটা সত্তাকে মানলেই—

মহারাজ : বিজ্ঞানী—সে জগতের আদি সত্তাকে জড় মনে করে। স্বামীজী বলছেন, আমি ব্রহ্মবাদী। আমি আদিসত্তা ব্রহ্ম মনে করি। তারা আদিসত্তা জড় মনে করে। তারা মনে করে চৈতন্য একটা by-product। একটা stage-এ এসে সেটা by-product হয়ে গেছে।

—জড় থেকে চৈতন্যের উদ্ভব হচ্ছে by-product হিসাবে? জড় থেকে—

মহারাজ : চেতন।

—চেতন by-product হিসাবে তৈরি হচ্ছে, এটা বলছে?

মহারাজ : হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—কিন্তু মহারাজ, স্বামীজী একটিমাত্র সত্তাতে বিশ্বাস করি বলে বলছেন যে, আমিও জড়বাদী। জড় কথাটা এখানে কী বলছেন?

মহারাজ : তার মানে জড়বাদী যারা, তারা একটি সত্তায় বিশ্বাস করে। আর স্বামীজীও বলছেন, আমিও একটা সত্তায় বিশ্বাস করি। তফাত হচ্ছে এই, তারা যে-সত্তাকে জড় বলে, আমি ব্রহ্ম বলি।

—কিন্তু যুক্তিটা আমাদের ক্ষেত্রে ঠিক গ্রাহ্য হচ্ছে না। যুক্তিটা যেহেতু এক জিনিসকেই সত্তা বলে স্বীকার করে, আর স্বামীজীও এক জিনিসকেই সত্তা বলে স্বীকার করেন, সেইজন্য আমিও এক প্রকারের জড়বাদী—এটা কিরকম হয়ে গেল।

মহারাজ : জগৎটার আদি কারণ যা, সেটাকে এক বলে বিজ্ঞানীরা মনে করে। তারপর স্বামীজী বলছেন যে, সেই একেকে আমিও এক বলি। তবে আমি ব্রহ্ম বলি।

—ঐ অ্যাকত্ব জিনিসটাকে তিনি—

মহারাজ : অ্যাকত্ব নয় বাপু, একত্ব। (হাসি)

—তা যাই হোক, কিন্তু ওটা দিয়ে তিনি এত বড় একটা শব্দ ব্যবহার করলেন যে, আমি এক প্রকারের জড়বাদী।

মহারাজ : ঐজন্য জড়বাদীও মনে করে, এজগতের আদি একটা। এই জগৎটা একত্ববিশিষ্ট বস্তু। স্বামীজী বোঝাতে চাইলেন, আমিও মনে করি তাই। তবে জড়বাদী যেটাকে জড় বলে, আমি ব্রহ্ম বলি। জড়বাদীরা—বিজ্ঞানীরা বলে এই যে মন—consciousness, এটা একটা by-product। একটা stage-এ এসে এটি develop করেছে। এই যে evolution—evolution-এর একটা ধারায় বলছে jump করে emergent evolution বলে এসব হয়েছে। একটা নতুন বস্তু তৈরি হয় এইভাবে করতে করতে। এই রকম বুদ্ধি, মন—এক একটা নতুন বস্তু তৈরি হল—জড়ের evolution থেকে। Emergent evolution সকলে মানে না।

—না, সেই। এগুলোর তো কোন concrete proof নেই। এগুলি তো hypothetical।

মহারাজ : না, 'Emergent evolution'-এর একটা theory আছে। Loyd Magan-এর Theory of Evolution। Emergent evolution হতে পারে। কেননা, যে-বস্তু হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল, তার আগে আবিষ্কার ছিল না। যখন সে emerge করেছে, প্রকাশ পেল। ঐ রকম মন, বুদ্ধি—জড়ের নতুন প্রকাশ।

—তাহলে আমরা যাকে জড় বলি, স্বামীজীর দৃষ্টিতে সেই জড় বলে কিছু নেই?

মহারাজ : স্বামীজী যা বললেন, তা তুমি বল না। স্বামীজী তাঁকে ব্রহ্ম বলেন।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমাদের তো—

মহারাজ : আবার 'আমাদের' 'আমাদের'!

—যতক্ষণ আমরা—

মহারাজ : তোমরা কিছু চিন্তাই কর না, তোমাদের কী হবে?

—চিন্তা করলে তখন কি সেই জড়কে ব্রহ্ম দেখা যাবে, ব্রহ্ম বোঝা যাবে?

মহারাজ : বোঝা যাবে—ব্রহ্মবিজ্ঞানীরা তাই তো বলেছেন। জড় থেকে বুদ্ধির উৎপত্তি। আর ব্রহ্ম থেকে জগতের উৎপত্তি।

—তাহলে ব্রহ্ম-বিজ্ঞানীরা—ব্রহ্মজ্ঞানীরা একটা মৃতদেহকে কী দৃষ্টিতে দেখবেন?

মহারাজ : আবার মৃতদেহ নিয়ে টানাটানি কেন?

—আমাদের যে-ধারণা জড় সম্পর্কে, সেইটা সম্পর্কে তাঁদের কী ধারণা হবে?

মহারাজ : জড় যেমন পাথর, ওটা জড়।

—হ্যাঁ। তা, সেটাকে তাঁরা কী দৃষ্টিতে দেখবেন? যেহেতু বলছেন যে—

মহারাজ : চেতনের একটা সংজ্ঞা বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন—that which increases from within আর অন্যগুলোর সব্বাইয়ের incrustration। বাইরের পাথরটা বড় হয়। ভেতর থেকে বড় হয় না। বাইরের থেকে বড় হয়। এই হল। আমরা তা বলি না। আমরা বলি, অন্তরের থেকে যে-শক্তি প্রকাশিত হতে চেষ্টা করছে, সেই কখনো জড়বিশিষ্টরূপে প্রকাশিত হচ্ছে।

—অন্তর থেকে—

মহারাজ : জড় আর চেতন। এরা একই সত্তা, একই বস্তু। একদিকে চেতন, আরেকদিকে জড়।

—একদিকে জড়, একদিকে চেতন—তাহলে তো মনে হয় দুটো বস্তু আছে বা দুটো বস্তুকে পেতে হবে।

মহারাজ : বিভিন্ন mentality হয়। যেমন একই বস্তু develop করতে করতে সে একদিকে চেতন হয়, আরেকদিকে জড় হয়। ব্রহ্ম জড়রূপে প্রতিভাত হচ্ছে। জগৎটা ব্রহ্ম। কিন্তু সেটা জগৎ-রূপে, জড়-রূপে প্রতিভাত হচ্ছে।

—চৈতন্য থেকে, মহারাজ, জড় কী করে হবে? এসব বিপরীত জিনিস না?

মহারাজ : চৈতন্যের অনুভব থেকে জড়ের অনুভব। চৈতন্য যদি না থাকত, জড় কার কাছে থাকত? জড়ের অনুভবকর্তা কে হতো?

—জড়ের অনুভবকর্তা যে একজন চেতন—এটা আমরা বুঝি। কিন্তু জড় যে ব্রহ্ম থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলা হচ্ছে—এটা কী করে স্বীকার করে নিচ্ছি? কারণ, কার্য-কারণের সঙ্গে একটা সম্বন্ধ থাকবে। চৈতন্য আর জড় তো একেবারে বিপরীত।

মহারাজ : চৈতন্য নিজেকে আবৃত করতে করতে জড় হয়েছে। তাই জড় রূপেতে প্রতীতি হচ্ছে। যাকে জগৎ-রূপে দেখছি, সেটা আসলে ব্রহ্ম।

—আসছি মহারাজ।

মহারাজ : আর উপায় কী? এছাড়া আর উপায় কী? ‘যঃ পলায়তে স জীবতি।’

॥ ১৪৪ ॥

মহারাজ : করিমগঞ্জে—অনেকদিন আগের কথা। সেখানে গেছি একটা উৎসবে। একসঙ্গো সব বেড়াতে বেরিয়েছি। আটজন—আমরা সব। সকলের চোখে তখন চশমা। দেখা গেল, একজন বলছে— মহারাজ, এ যো হ্যায়, আতা হ্যায়, ওতো হিন্দিমে আতা হ্যায়। এসব পরেছেন। এমনি পরেছেন না চোখের অসুবিধার জন্য? কারণ, সবারই চোখে চশমা। যা আমরা খেয়াল করিনি।

—মহারাজ, অনেকদিন পরে গোবিন্দ মহারাজ এসেছেন।

মহারাজ : গোবিন্দ-মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারে।
চন্দ্র কোটি, ভানু কোটি, কোটি মদন হারে।।

—কিন্তু ওঁর গায়ে গরম জল পড়ে পুড়ে যাওয়ায় পরে খুব কালো হয়েছেন।

মহারাজ : কালো হয়ে গেছে। তাহলে কী হবে! কালো মানুষ কি? ‘কালো? তা সে যতই কালো হোক, দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।’ (সকলের হাসি) হরিণ বললে সবাই ছিঁড়ে খাবে।

—Worker-দের উনি খুব freedom দেন।

মহারাজ : হ্যাঁ?

—খুব স্বাধীনতা দেন।

মহারাজ : স্বাধীনতা? হ্যাঁ। তাহলে তো হয়েছে! আশ্রম চলবে ঐভাবে। পাঁচ-পাঁচটা ঘোড়া যদি পাঁচদিকে টানে, তাহলে গাড়ি কি চলবে?

—লাগাম ধরে থাকেন উনি। লাগাম ওঁর হাতে।

মহারাজ : ছেলেবেলায় শুনেছিলুম—একটি গোয়ালা তার কয়েকটি গরু নিয়ে যাচ্ছে। তা সেই গরুগুলোর দড়ি জড়ো করে নিজের কোমরে

বেঁধেছে। গরুগুলো সব ভয় পেয়ে এদিক-ওদিক ছুটছে। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, আপনি বললে আবার বিপদ। ব্রহ্মচারীরা একটু সুখে আছে। শেষকালে লাগাম টানতে শুরু করবেন।

অন্যজন : হ্যাঁ। দড়িটা যেন উনি কোমরে বেঁধে না রাখেন। এইটাই মহারাজ বলছেন।

মহারাজ : তবু তো কোমরে বেঁধেছে, গলায় বাঁধেনি। (সকলের হাসি)

—গোবিন্দ মহারাজ কোন কথাই বলছেন না। মৌনবাদী।

মহারাজ : মৌনং সম্মতি লক্ষণম্। (সকলের হাসি)

—Worker-রা এমন টেনেছে যে আর কথাই বলতে পারছেন না? কথা বন্ধ হয়ে গেছে! না না, worker-রা ভাল।

মহারাজ : 'স্মারং স্মারং সদ্বিচরিতং দারুভূতো মুরারি।' জগন্নাথদেব কাঠ হয়ে গেছেন।

একা ভার্যা প্রকৃতিমুখরা চঞ্চলা তু দ্বিতীয়া।
একো পুত্র ভুবনবিজয়ী মন্মথদুর্নিবারি।।
শেষ শয্যাবসানুদধৌ বাহনং পন্নগারি।
স্মারং স্মারং সদ্বিচরিতং দারুভূতো মুরারি।।

—কী হল মহারাজ, ঐ জিনিসটা একটুখানি বললেন।

মহারাজ : তাঁর একটি পত্নী স্বভাবতই মুখরা—সরস্বতী। আর চঞ্চলা অর্থাৎ দ্বিতীয়া—লক্ষ্মী চঞ্চলা। আর এক পুত্র ভুবনবিজয়ী মন্মথ—দুর্নিবারি। মদন ভুবনবিজয়ী। তারপর শেষশয্যা। শুয়ে আছেন কোথায়? না, সাপের ওপর। 'শয্যাবসান উদধৌ।' তারপরে আবার সেই বিছানা হল সাপ, আছে সমুদ্রের ওপরে। আর তারপরে বাহন হল গরুড়। গরুড়

এসেছে, দেখে—সেই সাপগুলো পালিয়েছে। (মহারাজের হাসি) একথা ভেবে ভেবে 'স্মারং স্মারং সদ্বিচরিতং দারুভূতো মুরারি।'

—এই অবস্থা। আমাদের সব মহন্ত মহারাজদের এত চিন্তা।

মহারাজ : আচার্যদেরও তাই। (সকলের হাসি)

—আচার্যদের কথা বললে ব্রহ্মচারীরা কাঠ হয়ে যায়! (সকলের হাসি)

অন্যজন : না, মহন্তদের মতো নয়।

মহারাজ : আমাদের সব ব্রহ্মচারীরা কিন্তু শুনছে। (সকলের হাসি) শুনছে মানে এখন শুনছে, এর পরে টের পাবে। তারাও তো বড় হবে, তখন টের পাবে।

—আপনি বলেন, দুদিন পরে এরাই তো বড় হবে।

মহারাজ : সেই।

—কিন্তু গোবিন্দ মহারাজ এক সময় Deputy ছিলেন। এখন President হয়ে গেছেন।

মহারাজ : না না। Deputy Sub-Assistant Mohanta। (সকলের হাসি)

—Deputy Sub-Assistant Manager।

মহারাজ : Deputy Sub-Assistant Manager।

—এখন President।

মহারাজ : Proceed on, proceed on. এ কি ভাল কথা হল?

—এ বলছে, এইরে! দাদা! অঙ্ক শেখাচ্ছে!

মহারাজ : অ— আছে? কাগজখানা কোথায়?

—আপনি কী একটা গল্প বলেন যে, দাদা অঙ্ক শেখাচ্ছে!

মহারাজ : ও, অঙ্ক শেখাচ্ছে নয়। ঐ যে একটা ফল দেখাচ্ছে। এটা কী বল তো?—কমলালেবু। তা, ছোট ভাই বলছে—বলিসনি, বলিসনি। ‘ক’ শেখাচ্ছে। (সকলের হাসি)

—সেই আরেকভাবে বলেছিলেন। বলে—বাবাকে মেরে দাও।

মহারাজ : না, বলছে যে, মাস্টারটা মরলে বাঁচি। তা বলে, মাস্টার মরলে বাবা আরেকটা মাস্টার রাখবে। বাবাটা মরলে বাঁচি। (সকলের হাসি) এস আর দরকার নেই। আজ আর ভাল কথা হবে না।

—এগুলিই তো ভাল কথা।

মহারাজ : হ্যাঁ। তা তো বটেই!

॥ ১৪৫ ॥

মহারাজ : রাজা অশোকের কত ছিল হাতি। এইসব করিল বাহির। বড়ই তা করিছে জাহির। আর মোসাহেব বলে—কয়েকজন বসে, হ্যাঁ তা বটে, তা বটে। (সকলের উচ্চ হাসি)

—মহারাজ, আপনি আগে ছাত্রজীবনে নাটক করেছেন?

মহারাজ : আগে নাটক করিনি কখনো। তবে হ্যাঁ, করেছি—এই মঠেই তো করেছি। পাঁচবার যাজ্ঞবল্ক্যের অভিনয় করেছি।

—মহারাজ, আপনি যে কী একটা বলেন যে, যাত্রাদলে কী সাজিস?

মহারাজ : তুই কী কাজ করিস রে? —যাত্রাদলে আছি। —কী সাজিস? —তামাক সাজি। (সকলের হাসি)

—খুব গরম পড়েছে।

মহারাজ : সেই তো। বলে কিছু ঠান্ডাজলের ব্যবস্থা করলে হয়।

—ঠাণ্ডাজলের ব্যবস্থা হবে না। আচ্ছা মহারাজ, মঠে কখন electricity এল?

মহারাজ: সম্ভবত মহাপুরুষ মহারাজ তখন আছেন। একজন ভক্ত বললে—আমি খরচ দেব। আমরা—younger group বললুম, আমাদের চাই না। আমরা electricity চাই না। কেষ্টলাল মহারাজ তখন কলকাতায় থাকতেন। তিনি বললেন, দুর! আজকাল কি electricity ছাড়া চলে? মহাপুরুষ মহারাজের কাছে মধ্যস্থতা করবার জন্যে গেছেন। তা, মহাপুরুষ মহারাজ বললেন যে, এদিক ওদিক দুদিক থাকবে। কোথাও কোথাও electricity হবে। আর বেশির ভাগ জায়গাতেই হবে না। যারা electricity wiring করছিল, তারা তখন হাসছে। বলে—এখন তো নিচ্ছেন না, এর পরে অলিতে গলিতে, আনাচে কানাচে electricity হবে।

—শুধু light আর fan-এর জন্য নয়। কত কিছুর জন্যে আমাদের training centre-এ দরকার হচ্ছে। তা প্রথম electricity দেওয়া হল মন্দিরের জন্য? নাকি?

মহারাজ: মন্দির নয়। ঠাকুরঘরটাতে আর মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে। আর ঐরকম কোথায় হল, জানি না।

—মায়ের মন্দিরে, স্বামীজীর মন্দিরে?

মহারাজ: মায়ের মন্দির তখন হয়েছে, electricity হয়েছে, আমাদের ঘরে হয়নি।

—তখন আপনারা থাকতেন কি এইখানে? প্রেমানন্দ মেমোরিয়ালে?

মহারাজ: নানান জায়গায় থাকতুম। মেমোরিয়ালে থেকেছি, এখানেও থেকেছি। আর ভরত মহারাজ যেখানে বসতেন, ওখানেও থেকেছি।

তখন তো থাকবার জায়গা বেশি ছিল না। ঐ ঘরে পাঁচটা খাট ছিল। স্বামীজী বলেছিলেন, খাটে শুতে হবে।

—মশারি কয়টা ছিল, পাঁচটাই মশারি?

মহারাজ : না, ওখানে পাঁচটাই ছিল। তবে visitors' room-এ একটা বড় মশারি ছিল।

—একজন বেরলে মশাগুলো ঢুকলে।

মহারাজ : মশাগুলোর বেরনোর পথ রইল না।

—মহারাজ, তখন তো আপনাদের ঘরে electricity যায়নি। আপনারা পড়াশুনা করতেন কি হ্যারিকেনের আলোতে?

মহারাজ : হ্যারিকেন কোথায়?

—কেন হ্যারিকেন ছিল না?

মহারাজ : মহাপুরুষ মহারাজের ঘরে উঠবার যে-সিঁড়িটা, ঐ কোনায় একটা হ্যারিকেন জ্বলত। সেইখানে বসে পড়তুম।

—আরেকটা জ্বলত ঐ বারান্দার পুবদিকে।

মহারাজ : সেটা পায়খানায় গেলে নিয়ে যেত। তার কাঁচটা ছিল নীলবর্ণ। (সকলের হাসি)

—আপনার মনে সব ছবির মতো গাঁথা আছে।

মহারাজ : তা আছে বৈকি। তবে কখন জন্মেছি তা মনে নেই। (সকলের হাসি) খুব ছেলেবেলায় ন্যাংটো থাকতুম সেটা মনে আছে।

—তা খাওয়া-দাওয়া যখন হতো, মহারাজ, তখন ঐ হ্যারিকেন নিয়েই খেতেন?

মহারাজ : একটা হ্যারিকেন থাকত। হাতের নিচে ভাত ছিল। (সকলের হাসি) মানে হাতটা তুলে নিজের মুখেই দিতুম।

—ভাতটা অন্য জায়গায় দিতেন না তো?

মহারাজ : না। (সকলের হাসি)

—আপনি বলেছিলেন, রামনাম হতো visitors' room-এ, সেখানে day-light ছিল।

মহারাজ : Day-light পরে এল। তখনো day-light হয়নি। তার আগে sun's light ছিল।

—Sun's light-টা কী জিনিস?

মহারাজ : এই তো মুশকিলের কথা। গামলার মতো একটা ঝুলত—কাঁচের গামলা। তার সঙ্গে একটা cylinder বাইরে থাকত। নিচে থাকত। তাতে pipe দিয়ে ওপরে তেল—sun's light!

—গ্যাসে জ্বলত?

মহারাজ : গ্যাস মানে, arrangement ওখানেই ছিল।

—মহারাজ, ঐ কেরোসিন তেলের সেইরকম বলছেন নাকি?

মহারাজ : গ্যাস আমরা তখন কোথায় পাব? তারপরে আমরা থাকতে থাকতে day-light এল। এত তীব্র আলো যে, আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে যায়। তখন ঐ হ্যারিকেনের জায়গায় day-light। আর visitors' room-এ একটা day-light জ্বেলে রামনাম হতো। একসময় রামনাম হয়েছিল। মেয়েরাও কেউ কেউ এসেছিল। তবে কোথায় বসেছিল মনে নেই। তা আমাদের অচিন্ত্যানন্দ—ব্রহ্মচারী তখন, বেরিয়েছে। ঐ light থেকে বেরিয়েছে। দেখতে পাচ্ছে না কিছু। ভুল পথে গিয়ে গঙ্গায় পড়ে গেছে। (মহারাজের ও সকলের হাসি) আজ ভাল কথা হল না।

—এখন সমস্যা নেই। বিকালে রামনাম হয়।

মহারাজ : ভাল কথা আর হবে না। এইসব কথায় চলে গেলে আর ভাল কথা হয় না।

—মহারাজ, একটু হোক না—এগুলি পরে আর শুনতে পাব না।

মহারাজ : বাব্বা!

—মহারাজ, সেসময় বাগবাজার থেকে বেলুড় মঠ আসতেন কিভাবে?

মহারাজ : হেঁটে আসতে হতো আহিরীটোলা। ওখান থেকে এক পয়সা দিয়ে পার হতে হতো শালকে। তারপর ওখান থেকে আবার হেঁটে বেলুড় মঠ। তা, ঐ যাতায়াতের খরচ ছিল দু-পয়সা।

—হেঁটে আসতে হতো তো? অনেক সময় লাগত।

মহারাজ : তখন সময়ের অত দাম ছিল না। অত কাজকর্মও ছিল না। আমাদের আড্ডা দেওয়ারও সময় থাকত, পড়বারও সময় থাকত। কাজ করবারও সময় থাকত। আর এখন তো মুশকিল তোমাদের। কাজের লোক। তোমাদের তো অবকাশ নেই।

—তবে বেলুড় মঠে আসা মহারাজ, এখনো সময়সাপেক্ষ। এখনো কলকাতা থেকে বেলুড় মঠে আসতে দুঘণ্টা সময় লাগে।

মহারাজ : এখন যত সময় লাগে তখন অত লাগত না। এখন তিন ঘণ্টা—অনেকে বলে লাগে।

—ওর কোন ঠিক নেই মহারাজ। কতক্ষণ লাগবে কিছু বলা যায় না। তারপর এখন হাঁটার রাস্তাও ভাল নেই। ফুটপাতও নেই।

মহারাজ : ফুটপাত? এমনি পথই ছিল না। তা আবার ফুটপাত!

—তবু মহারাজ, রাস্তা থাকত। গাড়ি-ঘোড়া ছিল না তো।

মহারাজ : গাড়ি-ঘোড়া ছিল না, কাদা ছিল। বৃষ্টির সময় ছুটতে ছুটতে এক গাছের নিচে দাঁড়ালুম। আবার একটু পরে ছুটে আরেকটা গাছের নিচে। এইরকম করে আসতুম।

—পা slip করে একবারও পড়েননি কাদায়?

মহারাজ : তা হয়তো পড়েছি, মনে নেই। বানিয়ে বলতে হয় তাহলে। পড়েছি। তবে যখন শিলং-এ ছিলুম, শেলায় যেতুম হেঁটে। তা অগুনতি বার পড়েছি।

—কত মাইল মহারাজ?

মহারাজ : ও তো মাইলে বেশি নয়। সাত মাইল। চড়াই-উতরাই সাত মাইল। চড়াই সাত মাইল, উতরাই সাত মাইল। কিন্তু এত পিচ্ছিল—বৃষ্টি হয় তো! কাজেই শেওলা হয় খুব। পদে পদে পড়তুম। আমাদের রামময় ছিল আমার কাছে। সে আগের রামময় মহারাজ। তা সে বলে যে, আমি গুণে গুণে যাচ্ছি কবার পড়লুম। তারপর যখন দুশ হয়ে গেল, আর গোনেনি। (সকলের হাসি)

—মানে খুব খাড়াই। এমনিতেই slip করে।

মহারাজ : একেবারে খাড়া পাহাড়। আর সব পাথরের ওপর শেওলা পড়ে যায়। আশ্চর্যি! ওর ভেতর দিয়ে খাসিয়া যারা, তারা চলাফেরা করে। তা, পড়ে না তারা। মাতাল অবস্থাতেও চলে। সেও পড়ে না। (হাসি) পড়তে পারে, অল্প-স্বল্প পড়ে। আমরা পড়তে দেখিনি।

—আসি মহারাজ।

মহারাজ : আবার রাস্তাঘাট খারাপ। এস। (সকলের হাসি)

—এখন যদি কেউ পড়ে, man-hole-এ ঢুকে যাবে।

মহারাজ : আর তা যদি না ঢোকে, তো সেবাপ্রতিষ্ঠানে পাঠিয়ে দেবে।

॥ ১৪৬ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আমার একটা ছোট্ট প্রশ্ন আছে। স্বামীজী বলেছিলেন যে, বিদ্যার অভাবে সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় নীচদশা প্রাপ্ত হয়। সর্বদা বিদ্যার চর্চা থাকবে। বিদ্যা বলতে কী বোঝাচ্ছেন স্বামীজী?

মহারাজ : বিদ্যা বলতে শাস্ত্রপাঠ ইত্যাদি।

—শাস্ত্রপাঠ। আমরা তো মহারাজ, শাস্ত্র বলতে বেদ-উপনিষদ্—এইগুলি বুঝি।

মহারাজ : তা যা বল সবই বিদ্যার মধ্যে।

—সবই বিদ্যার মধ্যে?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—তারপরে আবার ইতিহাস, পুরাণ তাও পড়তে হবে।

মহারাজ : বেদেরই অঙ্গ।

—আর বেদাঙ্গ, ষড়ঙ্গ—তাও পড়তে হবে?

মহারাজ : হ্যাঁ। অত না পার অল্প-স্বল্প পড়। ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা। (সকলের হাসি)

—মানে অল্প—কিঞ্চিৎ পড়তে হবে গীতা।

মহারাজ : আর কী! 'ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা, গঙ্গাজললবকণিকা পীতা।'

—ভাল বলেছেন মহারাজ। এখন আমরা পুরোটাই গঙ্গাজল খাচ্ছি।

মহারাজ : তাই তো।

—লবকণিকা পীতা নয়, অনেকটা খাই।

মহারাজ : এইজন্যে গঙ্গায় চুবিয়ে ধরলে কী হবে কে জানে! (সকলের হাসি)

—আর মহারাজ, আমাদের হিন্দুধর্মের শাস্ত্রের সাথে কি অন্য ধর্মের শাস্ত্র—সেগুলোও পড়তে হবে আমাদের?

মহারাজ : শাস্ত্র বলতে যা আমাদের শাসন করে, নিয়ন্ত্রিত করে। এর কত রকম আছে।

—অন্য ধর্মও পড়তে হবে?

মহারাজ : পড়লে ভাল, বিচার হবে।

—তারপরে বেদ হল সংস্কৃত সাহিত্য। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিক অন্য সাহিত্য পড়তে হবে—এরকম কথা। এগুলো তো ভাল। সাহিত্য, ইতিহাস।

মহারাজ : পুরাণ।

—পুরাণ তো আছেই। তাছাড়া অন্য subject যেমন—History, Literature, Science, Philosophy—এসব পড়তে হবে?

মহারাজ : সব পড়তে হবে না। যতটুকু না পড়লে নয়, ততটুকু পড়তে হবে। Cultured হতে হলে যা করতে হয়।

—এইগুলো যিনি জানেন, তিনি cultured?

মহারাজ : Cultured বৈকি!

—ঠাকুর কিন্তু এগুলো পড়েননি। এগুলো তো পড়েনইনি, বরং বলছেন—এগুলো অবিদ্যা।

মহারাজ : ঠাকুরের কথা আলাদা। লেখাপড়া তো তাঁর ঐ পাঠশালা অবধি।

—সেই তো! এইটি তো ঠাকুরও বলছেন, স্বামীজীও বলছেন—এই বিদ্যা ভগবানলাভের পরিপন্থী।

মহারাজ : ভগবানলাভের জন্য কে ব্যস্ত হচ্ছে? (সকলের হাসি) ঠাকুরের কথা আছে—নিজেকে মারতে হলে একটা নরুনই যথেষ্ট, অপরের সঙ্গে

লড়তে হলে ঢাল-তলোয়ার দরকার হয়। এই। স্বামীজী বিদ্যা বলতেন এই ঢাল-তলোয়ারকে।

—মহারাজ, এই যে সংঘ—সংঘের জন্যে, সংঘকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে সব ধরনের বিদ্যার চর্চা থাকার দরকার।

মহারাজ : শুধু সংঘ নয়, ব্যক্তিবিশেষের প্রতিষ্ঠালাভ করতে হলেও এগুলি দরকার হয়।

—ব্যক্তির প্রতিষ্ঠালাভ করতে দরকার; ব্যক্তি—সাধারণত ব্যক্তি বলতে তো সাধু বোঝাচ্ছে মহারাজ। সাধুরা প্রতিষ্ঠালাভ করবে—সেটা কিরকম?

মহারাজ : এখানে সংঘের কথাও বলেছেন। সংঘের প্রতিষ্ঠা মানে, ব্যক্তির ability। এগুলিও দরকার। ভিখ্ মাঙনেওয়ালা সাধু হলে তো শুধু হবে না। একবার দীনেশ মহারাজ—নিখিলানন্দ স্বামী মায়াবতীর জন্যে collection করতে বেরিয়েছেন। তারপর রাজস্থানেতে রাজাদের কারো কারো সাথে meet করেছেন। তা এক রাজার কাছে গেছেন। তা রাজা—সন্ন্যাসী দেখে বলছে—উঁহা বৈঠ। নিচে একটা জায়গা দেখিয়ে বলেছে—উঁহা বৈঠ। তা উনি তো মুশকিলে পড়ে গেলেন। Prestige আছে তো ওঁর। তা বললেন—Your Honour! I am born in a family where English is much spoken. তখন রাজা বলছে—আরে এ আদমি তো ইংলিশ জানতে হো! আরে কুর্সি লাও, কুর্সি লাও। (সকলের হাসি)

—যদি ইংরেজিতে না বলতেন, তাহলে উনি ওখানে দাঁড়াতেই পারতেন না।

মহারাজ : পাত্তাই পেতেন না। নিচের একটা জায়গায় সাধুরা যেখানে বসত, মেঝেতে বসতে বলেছে, আর রাজা সিংহাসনে সমাসীন। নিখিলানন্দ

স্বামীর উপস্থিত বুদ্ধি খুব ছিল। কী বলবে! তা বলে—তোমার ভাষা বুঝতে পারছি না। ইংরেজিতে বল। আরে ইংরেজি বলতা হ্যায়? তা খাতির হয়ে গেল। আমি জামশেদপুর থেকে যাচ্ছি। ট্রেনে যাব দেওঘর। স্টেশনে গিয়ে টিকেট করতে গেছি। আমলই দিচ্ছে না। কথাই বলে না। তা আমি ইংরেজি চালিয়ে দিলুম একটু। তখন সে একেবারে খুব খাতির। (সকলের হাসি) তারপরে শেষকালে বলছে আস্তে আস্তে—এ্যয়ভি হো সকতা! (সকলের হাসি) আসলে ভয় পেয়ে গেছে।

—সেই। বাইরের জগতে চলাফেরা করতে—লোকের সঙ্গে কথা বলতে পড়াশুনার তো দরকার আছে। না থাকলে কত ধরনের পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়। তবে আগে আমাদের এই অধ্যাত্মশাস্ত্র যেগুলি, সেগুলি ভাল করে পড়া। তারপরে যতটা যে যেমন পারে সেগুলো পড়া—তাই না মহারাজ?

মহারাজ : ইন্ডিয়াকে ভাল করে জানতে হবে বৈকি! তারপরে পরিধি বাড়িয়ে আর যতটা পারা যায়। স্বামীজী ইংরেজি না জানলে তাঁর প্রতিষ্ঠা হতো কিনা সন্দেহ আছে।

—মহারাজ, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে বলেছেন, তোমরা ইংরেজিতে তর্ক কর। গিরিশবাবু, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও মাস্টারমশায়ের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথকে তর্কে লাগিয়ে দিচ্ছেন—

মহারাজ : তর্ক কর নয়, তক্ক কর। উনি মজা দেখবেন।

—কিন্তু দেখা যাচ্ছে মহারাজ, ভবিষ্যতে সেটা কাজে লেগেছে। ইংরেজিতে বলেই তো তিনি ঠাকুরকে জগতে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

মহারাজ : নিজেই তো আবার French শিখেছিলেন।

—ফারসিও জানতেন। তখন কলকাতায় ফারসির চল ছিল।

মহারাজ : এখানে মুসলমান নবাব-টবাব ছিল, তাদের ওখানে ফারসি চলত।

—ওঁর বাবা তো ভাল ফারসি জানতেন। কালকে পড়ছিলাম একটা ভাল খবর যে, স্বামীজীর শরীর যাবার পরে মঠে স্বামীজীর যে-উৎসব হতো—জন্মোৎসব—তাতে স্বামীজীর মা ১০ টাকা করে চাঁদা দিতেন।

মহারাজ : বাঃ।

—রাজা মহারাজ বা বাবুরাম মহারাজ এরকম কেউ যেতেন, নিয়ে আসতেন এবং তারপরে বলছেন যে, ভূপেন দত্তের বইতে তার উল্লেখ রয়েছে। তারপরে আরো বলছেন, ভুবনেশ্বরী দেবী মারা যাওয়ার পর ওঁদের দিদি স্বর্ণময়ী দেবী—তিনিও দিতেন। যতদিন ঠাকুরের সাক্ষাৎ শিষ্যরা ছিলেন ততদিন দিয়েছেন তিনি। ১০ টাকা তখনকার দিনে কম না!

মহারাজ : ১০ টাকা দিলে তো অনেক দেওয়া। আমরা ঢাকায় চাঁদা তুলতে যেতুম। আর মুষ্টিভিক্ষা তো আছেই। তাছাড়া চাঁদা—যারা আর্থিক চাঁদা দিত, চার আনা অবধিও ছিল। আর সবচেয়ে বড় দাতা ছিলেন জমিদার যোগেশ দাস। আমাদের কমিটির প্রেসিডেন্ট—তিনি ৫ টাকা চাঁদা দিতেন। তিনি ঘোড়ায় চড়ে চলতেন। তা, আমি গেছি। তার কাছে দাঁড়ালুম। তা তিনি ঘোড়া থেকেই দিয়ে দিলেন। যদিও ঘোড়াটা চাট মারেনি।

—আসছি মহারাজ।

মহারাজ : এস।

॥ ১৪৭ ॥

মহারাজ : কী খবর, বল।

—খুব গরম মহারাজ।

মহারাজ : তা শরীর তো এখনো আছে। একবার শরীর যাবার মতো হয়েছিল। শরীর যাবে—এইরকম সকলে ভেবেছিল। এখন ৯৮ হল। টোয়েনটি এইটে—

—কী হয়েছিল তখন?

মহারাজ : Dysentery—Bacillery Dysentery. অ্যালোপ্যাথ ডাক্তাররা বলে দিলে—আমাদের আর কিছু করবার নেই। আপনারা এখন treatment-এর system বদলান।

—তারপর কী চিকিৎসা হল, মহারাজ?

মহারাজ : হোমিওপ্যাথি। যার নেই কোন গতি, তার আছে হোমিওপ্যাথি। (হাসি)

—তাই করা হল। তাতে কাজ হল। হোমিওপ্যাথি খুব ভাল জিনিস, না মহারাজ?

মহারাজ : তা বলতে পারি না।

—কারণ, খুব অল্প ওষুধ খেতে হয়। বেশি ওষুধ খেতে নেই।

মহারাজ : এত ওষুধ খাইয়েছে ডাক্তাররা যে, পেট ভরে যায়!

—তখন আপনি মঠেই তো মহারাজ?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—মহাপুরুষ মহারাজ কী বললেন?

মহারাজ : গঙ্গোশানন্দজী মহাপুরুষ মহারাজকে বললেন—ও তো চলল। যখন তিনি বলছেন, তাঁর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। মহাপুরুষ মহারাজ বললেন—দেখ, ঠাকুরের কী ইচ্ছে দেখ।

—ঠাকুরের ইচ্ছায় ভালই হল। ঠাকুরের শুভ ইচ্ছা ছিল।

মহারাজ : ঠাকুরের ইচ্ছায় আরও সত্তর বছর। তখন আমাদের মঠের যা অবস্থা! বাবুরাম মহারাজের কলেরা হয়েছিল। ডাক্তার কে আসবে? কাঞ্জিলাল ডাক্তার ভক্ত। তাকে বলা হল। সে এল। তারপর তার সঙ্গে শুদ্ধানন্দ স্বামী বলরাম মন্দিরে থাকতেন—তিনি এলেন দেখবার জন্য। তিনি অসুস্থ। ঐ কাঞ্জিলালের গাড়িতে চলে এলেন।

—আগে চিকিৎসার সুযোগ তেমন ছিল না। আর আমাদের মঠে তো তা-ও ছিল না।

মহারাজ : পয়সাই ছিল না। মহাপুরুষ মহারাজের জন্যে ভক্তদের গাড়ি পাওয়া যেত। আমি একবার বউবাজার থেকে এক ডাক্তারকে নিয়ে এলুম ট্যাক্সি করে। এই অবস্থা। তখন বাড়ি নেই, গাড়ি নেই।

—কালকে যে বিরাট ব্যাপার হয়ে গেল, শুনেছেন? মায়ের বাড়ি। মায়ের শুভ পদার্পণ। সেখানে বিরাট ব্যাপার হয়েছে। অনেক কিছু দিয়েছেন তাঁরা।

মহারাজ : ছাতা দিয়েছেন।

—ছাতা দিয়েছেন। পকেটে দিয়েছেন। হাতে, পকেটে, পেটে।

মহারাজ : পেট ফাটেনি তো!

প্রশ্ন : মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজকে কোন ডাক্তার দেখতেন?

মহারাজ : একজন ডাক্তার নয়। বারে বারে বদলানো হয়েছে। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার—এন মুখার্জি।

—নীলরতন সরকার?

মহারাজ : নীলরতন সরকারও দেখেছেন। এন মুখার্জি হোমিওপ্যাথি। নীলরতন অ্যালোপ্যাথি।

—যখন stroke হল, তখন নীলরতন সরকার—এঁরা সব এসেছিলেন?

মহারাজ : এর আগেই।

—যখন stroke হল, মহারাজ, তখন একটা side নাকি paralised হয়েছিল? ডানদিক বা বাঁদিক অবশ হয়েছিল।

—সবকিছু বুঝতেন, কিন্তু বলতে পারতেন না।

মহারাজ : তখন patient-এর চিকিৎসা করা খুব কঠিন।

—সেবকদের খুব অসুবিধা হতো। কী বলতে চাচ্ছেন, বুঝতে পারতেন না। সেই অবস্থায় প্রায় দেড়বছর না দুবছর ছিলেন, আমরা বইতে যা পাই।

মহারাজ : একবছর তো পুরো।

—মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজের জন্যে ওষুধ আনতে গিয়েছিলেন কোন ডাক্তারের কাছে?

মহারাজ : বিডন স্ট্রিটের ডাক্তার এন মুখার্জি। অনেক রাত হয়ে গেল ফিরতে। মহাপুরুষ মহারাজ খুব চিন্তিত হয়ে গেলেন।

—কী বলেছিলেন?

মহারাজ : বললেন—ওর ওষুধ আর খাব না। সাধুদের কষ্ট দিচ্ছে, ওর ওষুধ আর খাব না। ডাক্তারকে খবর দেওয়া হল। তিনি এসে হাতজোড় করে বললেন—মহারাজ, আমার অপরাধ হয়েছে।—হ্যাঁ। তোমার অপরাধ হয়েছে, তুমি এমনি করে সাধুদের কষ্ট দাও! তোমার ওষুধ কি আর বাইরে পাওয়া যায় না? কী ওষুধ দেবে বল, বাইরের থেকে আনিয়ে দিচ্ছি। তা, ডাক্তার আবার হাত জোড় করে বললেন—মহারাজ, জানি আপনি পারবেন। কিন্তু আমাকে একটু আপনার সেবা করতে দিন। আর ওরকম হবে না। একেবারে সোজা কথা।

—আর ডাক্তারবাবুও খুব ভক্ত। এরকম করে যে বললেন।

মহারাজ : ঐকথা শুনে মহাপুরুষ মহারাজের রাগ একেবারে গলে জল। বললেন—তোমার ওষুধ খাব।

॥ ১৪৮ ॥

মহারাজ : বুঝলে জ— ব্যাকরণের কিছু কথা মনে হচ্ছিল—স্বার্থে ষষ্ঠী—ষষ্ঠী স্বার্থে। দৃষ্টান্ত হচ্ছে—রাহুর শির। রাহুই শির। তা রাহুর শির বললে কী বোঝাবে? তা স্ব-অর্থ বিরোধ।

—মাথাটাই আছে।

মহারাজ : অ্যাঁ?

—ওর তো শুধু মাথাটাই আছে।

মহারাজ : হ্যাঁ। তা রাহুর শির মানে রাহুই শির। এই ষষ্ঠীটা স্বার্থে ষষ্ঠী। এখন পড়াও তো?

—হ্যাঁ, পড়াই।

মহারাজ : স্বামীজীর চেলা ছিলেন নির্ভয়ানন্দ স্বামী। তিনি বলতেন—ব্যাকরণ কি সব অকারণ হল? (সকলের হাসি)

—আমরা শুনেছি যে, মহাপুরুষ মহারাজ স্বামীজীর ঘরের উলটোদিকে থাকতেন। আজ একটা বইতে পড়লাম—শিবানন্দ স্মৃতি-সংগ্রহে যে, এই বাড়িতে ছিলেন মহাপুরুষ মহারাজ। ১৯২০-২১ সালের দিকে।

মহারাজ : এই বাড়িতে আমরা মহাপুরুষ মহারাজকে দেখিনি।

—মহারাজ, লেগেট হাউস নাম হয়েছে—লেগেটরা কি এই বাড়িতে থাকতেন? না, ওঁদের টাকায় কেনা হয়েছে বলে লেগেট হাউস?

মহারাজ : লেগেট টাকা দিয়েছিলেন।

—থাকতেন না?

মহারাজ : না।

—সোনার বাগান কেন বলত আগে?

মহারাজ : ঐ বাগানের মালির নাম সোনা। তার থেকে সোনার বাগান। বাগানটা সোনা দিয়ে তৈরি নয়। (হাসি)

—আরেকটা জিনিস পড়লাম শিবানন্দ স্মৃতি-সংগ্রহে যে, মঠে ক্লাশ হতো। পরীক্ষাও হতো নাকি? (সকলের হাসি)

মহারাজ : কী হতো?

—মঠে যে ক্লাশ হতো, মাঝে মাঝে পরীক্ষা হতো?

মহারাজ : পরীক্ষা-টরীক্ষা হতো না। ক্লাশ হতো, পরীক্ষা হতো না।

—পরীক্ষা না হওয়ার tradition-টা ভেঙে গেল! (হাসি)

মহারাজ : কেন বল তো?

—এখন তো খুব পরীক্ষা হয়।

মহারাজ : এ তো মুশকিলের ব্যাপার! আমি Training Centre-এ পড়াতুম। বলতুম—পরীক্ষা আমি নিতে পারব না। পরীক্ষা করলে আমিই ফেল করব। (হাসি) কাজেই কী করে পরীক্ষা নেব? তা, একবার খালি পরীক্ষা নিয়েছিলুম। তাতে একজনকে ১০০-এর ভেতরে ৪ দিয়েছিলুম। (সকলের হাসি)

—কিছুই লেখেনি নাকি মহারাজ?

মহারাজ : লেখেনি। তবুও তো কাগজটা নাড়াচাড়া করেছে। (সকলের হাসি)

—মহারাজ, আরেকজনকে ১০০-এর মধ্যে ১০০ দিয়েছিলেন?

মহারাজ : ১০০ কাকেও দিইনি। কাছাকাছি দিয়েছিলুম।

—পুরো সংস্কৃত ভাষ্যটা লিখে দিয়েছিল।

মহারাজ : সে আলাদা। তাকে কম নম্বর দিয়েছি। তার চেয়ে বেশি আর একজনকে দিয়েছিলুম। সে জিনিসটা বুঝে লিখেছিল।

প্রশ্ন : জ্ঞানের প্রসঙ্গো আপনি একজায়গায় বলেছেন, আমরা অনেক সময় মনে করি যে, ভক্তের জ্ঞানে অধিকার নেই। সে নিম্নাধিকারী। এ অত্যন্ত হীনবুদ্ধির কথা। ঠাকুর বলছেন যে, এতে উঁচু-নীচু বলে কিছুই নেই।

মহারাজ : না।

—যখন ভক্ত তাঁকে বিচিত্রভাবে আস্বাদন করছে সেটা যেমন সত্য, আবার জ্ঞানী যখন তাঁকে নির্বিশেষভাবে আস্বাদন করছে—সেও তেমনই সত্য। সত্যের তর, তম নেই। এইটা একটু বলুন মহারাজ।

মহারাজ : আমরা মনে করি, যে জ্ঞানী সেই শ্রেষ্ঠ। তা এমন কিছু নয়। যে যার ভাবেতে উন্নত হতে পারবে। জ্ঞানী জ্ঞানীর ভাবেতে উন্নত। ভক্ত ভক্তের ভাবেতে উন্নত। তাদেরকে বিচার ঐভাবে করা যায় না। নিজের ভাবেতে কে কতটা দৃঢ় হয়েছে, তার দ্বারা নির্ণীত হবে।

—সত্যের তর-তম নেই। কিন্তু স্বামীজী যখন বলছেন যে, আমরা মিথ্যা থেকে সত্যে যাই না, নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে যাই।

মহারাজ : সে হল আপেক্ষিক ভাবেতে। সত্যের আপেক্ষিকতাও হয় না।

—নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্য তো আপেক্ষিকতা—

মহারাজ : এটা আপেক্ষিক সত্য হল। আপেক্ষিক সত্য কি সত্য হয়?

—তার মানে, সত্য নয়। নিম্নতর সত্য—

মহারাজ : সত্য নয়। আপেক্ষিক হলে আর সত্য হল না।

—তা ভক্তের যেটা আস্বাদন, সেটা তো আপেক্ষিক।

মহারাজ : আপেক্ষিক কেন হবে? সে পূর্ণভাবে তন্ময় হয়ে থাকতে পারে। পূর্ণ তন্ময়তা তার থাকবে। আপেক্ষিক কেন হবে?

—আস্বাদন যখন করছে, তখন আস্বাদনকারী তো একজন থাকবে।

মহারাজ : আছেই তো। কে বলেছে যে, আস্বাদনকারী থাকবে না?

—ওখানে যে তিন থাকছে না।

মহারাজ : সে তো জ্ঞানের দিক দিয়ে বলছ। ভক্তের দিক দিয়ে নয়। ভক্ত বলবে ভক্তির রহস্য—সে জ্ঞানী কী বুঝবে? হ্যাঁ? একটা জায়গায় চৈতন্যচরিতামৃতের ভিতর আছে যে, সূর্যকে আমরা একটা জ্যোতিঃপিণ্ড দেখছি। কিন্তু সূর্যলোকবাসীরা ওর ভেতরেতে নানা বৈচিত্র দেখছে। তেমনই সত্য। যে যেমন আস্বাদন করে। আমাদের মুশকিল হচ্ছে—একটু উন্নাসিক দৃষ্টি আমাদের। অদ্বৈত না হলে হল না। অদ্বৈতে আস্বাদনই হয় না।

—তা তাকে কী বলা যেতে পারে? অনুভব বলা যায়?

মহারাজ : অনুভব একটা শব্দ বললে তো? তা তার তাৎপর্য কী হল? এই অনুভব শব্দটা খুব ব্যবহার হয়। অনুভব মানে কী জিজ্ঞাসা করলে হাঁ করে থাকে। অনুভব আর জানার তফাতটা কী?

—জানা—বিষয়রূপে তাঁকে জানা। আর অনুভবের বিষয় নেই—

মহারাজ : তাহলে অনুভব আছে কী করে? কার অনুভব?

—যা তত্ত্ব, তাই। আর কী।

মহারাজ : তাহলে কার অনুভব?

—আর তো বলা যাচ্ছে না সেভাবে। বিষয় বলে তো আর বলা যাচ্ছে না।

মহারাজ : তাহলে অনুভব নেই।

—তা কেন?

মহারাজ : যা বলা যায় না, তার অনুভব কী করে হবে?

—সেইজন্য জ্ঞান বলা হচ্ছে।

মহারাজ : জ্ঞান বলা হচ্ছে সেও শব্দ মাত্র। (হাসি) তার তাৎপর্য কী?

—এটা তো শব্দই হবে।

মহারাজ : শব্দের অতীত বস্তুকে শব্দ দিয়ে বোঝানো যায়?

—বোঝা না যাক, সেই চেষ্টাটা তো শব্দ দিয়েই হবে।

মহারাজ : তা, শব্দ দিয়ে হলে তা আর সত্যের বর্ণনা হল না।

—সেইজন্যেই তো বলছি, আভাস মাত্র। শাস্ত্র যে অনুভবের কথা বলছে, তাকে তো আর প্রকাশ করা যাচ্ছে না—

মহারাজ : তার মানে হচ্ছে, আমরা অনুভব করতে পারি না। (সকলের হাসি)

—তা কেন? অনুভব করতে পারি না? যা প্রকাশ করতে পারি না তা অনুভব করতে পারি না—তা বলা যাবে না।

মহারাজ : অনুভব যা করছি, সেটা যে আছে তার প্রমাণ হবে কী করে?

—সে তো নিজেই বুঝবে। আর তো কাউকে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

মহারাজ : সে তো পাগলেও মনে করে যে, সে ঠিক বলছে।

—তখন শাস্ত্রের সঙ্গো তার অনুভব মেলাতে হবে। শাস্ত্রবাক্যের সঙ্গো মেলাতে হবে।

মহারাজ : তা শাস্ত্রবাক্যকে কী করে বুঝবে?

—অনুভব যখন শাস্ত্রকে অনুসরণ করবে।

মহারাজ : শাস্ত্র বলছেন—তিনি শব্দের অতীত। অশব্দম্। এখন অশব্দ তো বস্তুর বর্ণনা হতে পারে না।

—তা শাস্ত্র কী করছে?

মহারাজ : শাস্ত্র কেবল মিথ্যার নিবৃত্তি করবে। এ-ই-ই। (সকলের উচ্চ হাসি)

—সে তো জ্ঞানীর দিক থেকে। বেদান্তের দিক থেকে বলা হল। অদ্বৈত।

মহারাজ : সে তো বটেই। সে তো জ্ঞানীর দিক। তুমি জ্ঞানের পথ ধরে প্রশ্ন করছ। কাজেই তার উত্তর হচ্ছে এই—শাস্ত্র কোন সত্যকে প্রকাশ করে না। অজ্ঞানের নিবৃত্তি করে শাস্ত্র। এ নয় ব্রহ্ম। 'অতদ্‌ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।' শ্রুতিও বলছে যে—তিনি এ নয়, তিনি এ নয়। এই বলে। তিনি কী তা বলতে পারে না। 'অতদ্‌ব্যাবৃত্ত্যা যং চকিতমভিধত্তে শ্রুতিরপি।' শ্রুতি 'এই নয়', 'এই নয়' বলে তাঁকে বলে। তাঁর স্বরূপকে কেউ বলতে পারে না।

—তবে প্রমাণ বলে কেন মহারাজ? শাস্ত্রকে প্রমাণ বলে কেন?

মহারাজ : এটাও প্রমা জ্ঞান। এজন্যে প্রমাণ বলে।

—কিসের জ্ঞান হচ্ছে, কী বিষয়ের জ্ঞান হচ্ছে, বিষয়টা কী?

মহারাজ : বিষয় নেই। নির্বিষয় জ্ঞান। অত সহজে ধরতে পারবে না। (সকলের হাসি)

—না, বিষয়েতেই প্রমা হচ্ছে। প্রমার বিষয় থাকবে তো, মহারাজ?

মহারাজ : তুমি বিষয়ের মধ্যে রয়েছ বলে মনে করছ প্রমার বিষয় থাকবে। প্রমাস্বরূপ যদি হয় তাহলে তার বিষয় কি থাকবে?

—না, তা থাকবে না। তা শাস্ত্রকে প্রমাণ বলে কেন তাহলে?

মহারাজ : প্রমাজ্ঞানের জনক বলে তাকে প্রমাণ বলে। এখন জনক বলে প্রমাণ বলল, কিন্তু শব্দের দ্বারা তাকে প্রকাশ করা যাচ্ছে না। শব্দের দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হতে পারে। জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। প্রকাশ যার হয় সে তো জন্যজ্ঞান হবে। উৎপাদ্য হবে।

—অজ্ঞানের নিবৃত্তি—এই হল কথা।

মহারাজ : এই।

॥ ১৪৯ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আজ বিজ্ঞান মহারাজের তিথিপুজো। তাঁর কথা কিছু বলুন—

মহারাজ : শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানরা সকলেই মৌলিক ছিলেন। এই মৌলিকত্ব খুব নজরে পড়ে—এরকম একটি জীবন হল স্বামী বিজ্ঞানানন্দজীর। তাঁর গভীর অন্তর্মুখিন আধ্যাত্মিক জীবন ও তারই সঙ্গে অদ্ভুত বালকসুলভ ব্যবহার ও আচরণ বোঝা খুব সহজ নয়। তাই এধরনের জীবন সাধারণের কাছে প্রায় দুর্বোধ্য ও দুর্জ্ঞেয়। তাঁকে দর্শন করেছি, স্পর্শন করেছি—আর কী বলব?

—মঠে তো তাঁকে দেখেছেন—

মহারাজ : হ্যাঁ, বিরাট ভারী চেহারা। স্বামীজীর বারান্দায় একটা ইজিচেয়ারে চেয়ারটা ভর্তি করে আধশোয়া অবস্থায় বসে থাকতেন। তাঁকে দেখে মনে হতো যেন অন্য রাজ্যের মানুষ! এজগতের নয়। সর্বদাই গম্ভীর, রাশভারী। আবার খুব আনন্দও করতেন। গুরুভাইদের সঙ্গে ব্যবহারে একেবারে মজাদার এক বালক যেন। খুব দর্শনাদি হতো। শুনেছি—দেবদেবী, ঠাকুর, মা ও স্বামীজীর দর্শন তাঁর লেগেই থাকত। মুখে বিড়বিড় করতেন। কিছু বোঝা যেত না। ঠাকুরের দর্শনাদি ও ভাবের ঘোরে অপ্রকৃতিস্থ হওয়ার কিছুটা ছোঁয়া বিজ্ঞানানন্দজীর জীবনে প্রবেশ করেছিল। আমাদের সাধারণ চোখে দেখা এসব বিষয় ব্যাখ্যার ঊর্ধ্বে।

—এলাহাবাদেও তো দর্শন করেছেন—

মহারাজ : তা বটে। এলাহাবাদে তাঁর অন্য রূপ। সেখানে কাউকে থাকতে দিতেন না। মনে পড়ে, আমরা একবার গেছি কুম্ভমেলায়। ক্যাম্প থেকে মঠে গেছি, মহারাজকে দর্শন করব। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। দরজাটা ভরে গেছে। আমাদের সঙ্গে ঐ দাঁড়িয়েই কথা শেষ করলেন। আমরা প্রণাম করে ক্যাম্পে ফিরে এলাম। পাছে ঢুকে পড়ি, তাই দরজাটা ছাড়লেন না!

—ও বাবা! তাই নাকি?

মহারাজ : একবার বিজ্ঞান মহারাজ অসুস্থ। মঠ থেকে ভাস্করানন্দজী গেছেন মহারাজকে দেখতে, সম্ভব হলে মঠে নিয়ে আসবেন। সকালে পৌঁছাতেই বিজ্ঞান মহারাজ বলছেন : 'কখন যাবে?' অনঙ্গ মহারাজ (স্বামী ওঙ্কারানন্দ) সঙ্গে ছিলেন। বললেন : 'মহারাজ, এই তো সবে এলাম। এখনি যাওয়ার কথা কী বলছেন?'—'না, মানে বিকেলে ট্রেন আছে।' অনঙ্গ মহারাজ বলছেন : 'আজ তো সবে এলাম, বিকেলেই যাওয়ার কথা কী বলছেন?' মহারাজ বললেন : 'ঠিক আছে, তবে কালই যেও।' যেন খুব consider করেছেন!

—বেশভূষাও ছিল অদ্ভুত—

মহারাজ : তা তো বটেই! শীতকালে জামা পরতেন বেশ কয়েকটি একসঙ্গে। নিচে পাতলা কাপড়ের, তারপর সিল্কের—এরকমভাবে পরপর বেশ কয়েকটা। একদম ওপরে তুলোর কম্বলের একটা বিরাট আলখাল্লা। নস্যি নিতেন। তা একবার নস্যির কৌটোটা কোন পকেটে রেখেছেন খুঁজে পাচ্ছেন না। পাবেন কী করে? অতগুলো জামার পকেট! বলছেন : 'কোন ব্যাটা মেরে দিয়েছে।'

—বকাবকি করতেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, তা তো করতেনই। দেবতা মহারাজ ওঁর একজন সেবক ছিলেন। খুব ভাল সাধু। মহারাজ বকতেন, দেবতা মহারাজ উচ্চবাচ্য করতেন না। চুপচাপ সব শুনে যেতেন। একবার মহারাজ ওঁকে খুব বকেছেন। অন্য একজন সেবক এসে বলছেন : 'মহারাজ, দেবতাকে এত বকেছেন যে, ও কাঁদছে।' শুনে মহারাজ বলছেন : 'ও, তাই নাকি? তাহলে আজ আমি successful!' আবার বলছেন : 'সত্যিই ও দেবতা।'

স্বামী বিজ্ঞানানন্দের সবই ছিল অদ্ভুত। তিনটে বিছানা ছিল—একটা ঘরে, একটা বারান্দায়, আরেকটা উঠানে। এলাহাবাদে খুব ধুলো। বিছানায় খুব ধুলো পড়েছে দেখে একবার একজন ঝেড়েঝুড়ে রেখেছে। তিনি এসেই বিছানা দেখে বলছেন : 'আমার বিছানাটা নষ্ট করলে কে?' 'মহারাজ আমি'—একজন উত্তর দিল : 'ধুলো পড়েছিল, একটু ঝেড়ে রেখেছি।' 'না, আমি ওরকম ধুলো পড়াই চাই, তুমি কেন আমার বিছানা নষ্ট করলে?'

—খুব বেশি দীক্ষা দিতেন না—

মহারাজ : হ্যাঁ, মহারাজ সাধারণত দীক্ষা দিতে চাইতেন না, খুব জোরাজুরি করলেও দিতে চাইতেন না। স্বামী জপানন্দের মুখে শুনেছি, একবার বোম্বেতে সকলে খুব ধরেছেন : 'মহারাজ দীক্ষা দিন। আপনি দীক্ষা দেবেন শুনলে অনেকে আগ্রহভরে নেবে।' মহারাজ তো কিছুতেই রাজি হন না। শেষে রাজি হলেন। বললেন : 'কে কে দীক্ষা নেবে?' পাওয়া গেল একজন। তিনি আবার মহিলা। তা রাজি হলেন। দীক্ষা দিলেন। মহিলাটি দীক্ষার পর বললেন : 'মহারাজ, মালায় জপ করব। আমায় একটা মালা দিন।' মহারাজ বললেন : 'ও, মালায় জপ করবে?' এই

বলে নিজের মালাটিই তাঁকে দিয়ে দিলেন। পরে ভক্ত-মহিলাটি চলে গেলে বলছেন : 'আরে! আমার মালাটা যে দিয়ে দিলাম, আমি জপ করব কিসে?' সাধুদের বললেন : 'আমার জন্য একটা মালা আনিয়ে দাও।' একজন জিজ্ঞাসা করল : 'মহারাজ কিরকম মালা চাই?' মহারাজ বললেন : 'ঐ জৈনরা যে একরকম সুতোয় বাঁধা মালায় জপ করে, সেই মালা আমার চাই।' সকলে বিপদে পড়ল। জৈনধর্মে যারা দীক্ষিত নয়, তাদের তারা সে-মালা দেয় না। কী করা যায়? শেষে অনেক চেষ্টা করে একজন জৈন-ভক্ত মারফত সেরকম একটা মালা এনে তাঁকে দেওয়া হল। দেখ, দীক্ষাই দেবেন না, আবার দিলেন তো নিজের মালাটিই দিয়ে দিলেন!

—গুরুভাইদের সঙ্গে খুব মজা করতেন—

মহারাজ : একবার বিজ্ঞানানন্দজী মহারাজ ও অখণ্ডানন্দজী মহারাজ মঠে এসেছেন। দুজনেরই অনেক কলম। দুজনে ঠিক হল—দেখি, কার কটা কলম আছে। আমরা সব দাঁড়িয়ে। গুণে দেখা গেল, বিজ্ঞান মহারাজের কলমের সংখ্যা বেশি। তখন বিজ্ঞান মহারাজ বললেন : 'উনিই (অখণ্ডানন্দজী) তো অনেকগুলো আমাকে দিয়েছেন।'

মিস্টার সবুর বলে মহারাজের একজন South Indian ভক্ত ছিলেন। মহারাজকে তিনি খুব ভালবাসতেন। মহারাজ নস্যি নিতেন। নস্যি বুকে পড়ে জামাকাপড়ে ছড়িয়ে যেত। সবুর নস্যিগুলো বুকের কাছ থেকে ঝেড়ে ঝেড়ে ফেলে দিতেন।

—মহারাজ, আর কিছু ঘটনা মনে পড়ছে?

মহারাজ : আরেকটি ঘটনা। মহারাজ রয়েছেন বেলুড় মঠে। মিস ম্যাকলাউড এবং তাঁর সঙ্গীরা মঠে আসছেন। মঠ-কর্তৃপক্ষের প্রবীণ সন্ন্যাসীরা

বিজ্ঞান মহারাজকে ওঁদের অভ্যর্থনা করতে অনুরোধ করলেন। মহারাজ কিছুতেই রাজি হন না। শুধুই বলেন, কী বলতে কী বলবেন! একেবারেই রাজি হচ্ছেন না দেখে মহারাজরা বিজ্ঞান মহারাজকে বললেন যে, মহারাজ শুধু প্রথমে তাঁদের receive করুন এবং পরে তাঁরা তাঁদের মঠে নিয়ে গিয়ে আপ্যায়িত করবেন। মহারাজ তাতেও ভয় পাচ্ছেন আর কাকুতিমিনতি করছেন যাতে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়। এর পর মহারাজরা কেবল বললেন : 'মহারাজ, আপনি মঠের প্রেসিডেন্ট, ওঁরা শুধু একবার এসে আপনাকে প্রণাম করে চলে যাবে।' মহারাজ এবার রাজি। জিজ্ঞেস করলেন : 'কী কথা বলব?' ওঁরা বললেন : 'বিশেষ কিছু বলতে হবে না। শুধু ওঁরা এলে Come in Madam, come in বললেই হবে। বাকি কথাবার্তা আমরা বলব।' দিন যত এগোচ্ছে, মহারাজ তত উদ্বিগ্ন হচ্ছেন আর সবাইকে সেকথা বলছেন, কী বলতে কী বলবেন! বাচ্চা ছেলের মতো মুখে শুধু আউড়াচ্ছেন : 'Come in Madam, come in.' সকলে ব্যাপারটা দেখে অবাক হচ্ছে। নির্দিষ্ট দিনে প্রবীণ সন্ন্যাসীরা ওঁদের নিয়ে মহারাজের কাছে গেলেন। তাঁরা আসতেই তাঁদের অভ্যর্থনা করে মহারাজ বলছেন : 'Come in Sir, come in Sir!' তিনি যে ইংরেজি জানতেন না তা তো নয়। বিরাট মাপের ইঞ্জিনিয়ার। কত বড় পণ্ডিত! কিন্তু তখন নারী-পুরুষের পার্থক্য করতে পারছেন না। আসল কথা কী, এইধরনের মহাপুরুষদের উচ্চ ভাব থেকে মনটা নামিয়ে লৌকিক ব্যবহার করতে খুবই কষ্ট হয়।

প্রশ্ন : সমর মহারাজ ছিলেন বিজ্ঞান মহারাজের একজন সেবক—

মহারাজ : সমর (স্বামী বরিষ্ঠানন্দ) বলে একজন পালোয়ান-সাধু মহারাজের সেবক ছিলেন। খুব Strong body, মহারাজ ওকে মারতেন। সমর হাসত

আর বলত : 'মহারাজ আমার কিছুই হচ্ছে না, আপনার বরং লাগছে, হাতে ব্যথা হচ্ছে।'

—খুব ব্যস্ত-সমস্ত মানুষ ছিলেন—

মহারাজ : একবারের ঘটনা বলি শোন। মহারাজ এলাহাবাদ থেকে মাদ্রাজ যাবেন। সেজন্য এলাহাবাদ থেকে হাওড়ায় এসেছেন, সেখান থেকে মাদ্রাজ যাবেন। বেলুড় মঠ থেকে সাধুরা গেছেন, মহারাজকে হাওড়া থেকে মঠে নিয়ে আসবেন। মহারাজ বললেন : 'মঠে কেন যাব? আমি তো মাদ্রাজ যাব।' সাধুরা বললেন : 'মাদ্রাজ যাবার ট্রেন তো বিকেলে, ঢের পরে। এখনও অনেক দেরি।' মহারাজ বললেন : 'না না, চারটে এই এখনি বেজে যাবে।' 'তা এতক্ষণ কোথায় থাকবেন?' 'কেন, এই প্ল্যাটফর্মেই থাকব। ট্রেন এলেই চট করে উঠে পড়ব।' তারপর সকলে খুব বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাঁকে মঠে নিয়ে আসেন। সব বিষয়েই তাঁর এরকম ব্যস্ত ভাব ছিল। বিজ্ঞান মহারাজ একদিন নিজের ব্যস্ত-স্বভাবের কারণ বলতে গিয়ে বলছেন : 'কেন এত ব্যস্ত হই জান? ঠাকুরকে দেখেছি কিনা। কী ব্যস্ত! যখন যেটা মনে উঠেছে তখনি করা চাই, নতুবা শান্তি নেই।' এরপর ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর থেকে গাড়ি করে কলকাতা যাওয়ার ব্যস্ততার ঘটনাটি বললেন। একদিন অত্যন্ত serious mood-এ মহারাজ ঠাকুরের এরকম ব্যস্ত-স্বভাবের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে বলছেন : 'এর কারণ কী জান? ঠাকুরের মন এত শুদ্ধ ছিল, এত concentrated ছিল যে, সেই শুদ্ধ মনে যা উঠত সঙ্গে সঙ্গে তা না করলে বা সে-কাজটা না হওয়া পর্যন্ত শান্তি হতো না।' শরৎ মহারাজও ঠাকুরের এই ব্যস্ত-ভাবের ঘটনাটা ও তার কারণ 'লীলাপ্রসঙ্গ'-এ ব্যক্ত করেছেন। বিজ্ঞান মহারাজ ও শরৎ মহারাজ—দুজনেই ঠাকুরের ব্যস্ত-স্বভাবের

কারণ বলেছেন—তাঁর গভীর একাগ্র মন। সাধারণ লোকের ঠিক এরকম ব্যস্ততা হয় না।

—সেবক বেণীকে মহারাজ খুব ভালবাসতেন—

মহারাজ : বেণীকে কেমন ভালবাসতেন, শোন তাহলে—একবার বিজ্ঞান মহারাজের সঙ্গে আমরা কলকাতায় ঠাকুরের একজন ভক্তের বাড়ি নিমন্ত্রণে গিয়েছি। সেই ভক্ত খুব সাদরে মহারাজকে নিয়ে গিয়েছেন। মহারাজের পরিচারক বেণীও আমাদের সঙ্গে ছিল। পৌঁছানোর পরেই মহারাজ গৃহস্বামীকে ডেকে বেণীকে দেখিয়ে বললেন : 'একে কিছু খেতে দিও না। ওর পেট খুব খারাপ। কিন্তু ও খুব লোভী। যা পাবে তাই খাবে, সাবধান।' গৃহস্বামী তো হাতজোড় করে বললেন : 'ঠিক আছে মহারাজ, আপনি যখন বলছেন, তখন তাই হবে।' যাই হোক, আমরা এদিক সেদিক রয়েছি। আবার একটু পর মহারাজ বলছেন : 'ওকে কিছু খেতে দিও না। ওর পেট খুব খারাপ, কিন্তু ও বড্ড লোভী—যা পাবে তাই খাবে, সাবধান।' এরপর গৃহস্বামী বললেন : 'মহারাজ, ওর পেটে যা সয় সেরকম একটু কিছু দেখেশুনে দেব'খন। কিন্তু খাবে না, সে কিরকম কথা!' মহারাজ ততোধিক জোরের সঙ্গে বললেন : 'না না, কিছু না, কিছু দিও না। ওর সয়টয় না। ও যা দেখবে তাই চাইবে। আর তাই খাবে।' বেণী তো অপ্রস্তুত, নিশ্চুপ। যাহোক, একটু পরে পাতা হয়েছে। আমরা বসেছি। মহারাজ বলছেন : 'বেণী কোথায়?' 'ঐ তো, ওখানে বসেছে মহারাজ।' 'ওখানে কেন? না না, ওকে আমার চোখের সামনে বসাও, আমি দেখব, ও কী খায়। দূরে বসলে যা পাবে তাই খাবে, ও বড্ড লোভী।' 'ঠিক আছে মহারাজ'—বলে বেণীকে মহারাজের সামনে পাতা করে দেওয়া হল। যারা পরিবেশন করছিল তারা কোন

item এনেই মহারাজকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করছে : 'এটা একটু ওকে দেব?' কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে মহারাজ বলছেন : 'না না, দিও না বাবা, ওর পেট খুব খারাপ, ও বড্ড লোভী, দিলেই সব খেয়ে ফেলবে।' তারা না দিয়েই এগিয়ে যাচ্ছে। মহারাজ ডেকে বললেন : 'আচ্ছা একটু দাও।' আবার বলছেন : 'আরো কিছু দাও।' এরকমভাবে যত ভাল item এল—সব মহারাজ 'ওখানে একটু দাও', পরে 'আরো একটু দাও', 'আরো একটু দাও' বলে বলে বেণীকে খুব খাওয়ালেন। শেষে বেণী আর পারে না! বেণী বলছে : 'মহারাজ, আর পারছি না।' আসল কথা কী, বেণীকে সামনে বসিয়ে ভাল ভাল খাওয়াবেন কিনা, তাই এই কৃত্রিম নাটকের অবতারণা! মহাপুরুষদের ভালবাসা বোঝা ভার!

॥ ১৫০ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি ও পুণ্যানন্দজী একসঙ্গে হাঁটছেন, খুব দ্রুত—এরকম একটা ছবি আছে। কে এগিয়ে বোঝা যাচ্ছে না—

মহারাজ : হ্যাঁ, ওটা রহড়ায় তোলা। ছেলেবেলা থেকে আমার হাঁটার খুব অভ্যাস। কলকাতা থেকে যখন দেশে যেতুম তখন আঠারো মাইল হাঁটতুম। বাঁকুড়া পর্যন্ত ট্রেনে। তারপর আঠারো মাইল হেঁটে। হাঁটা মানে কী, ছুটেই যেতুম। মায়ের (গর্ভধারিণী) কাছে যেতুম কিনা তাই কত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় তার চেষ্টা করতুম। তাই, ছুটেই যেতুম। তা বাড়ি থেকে স্টেশনে গোরুর গাড়ি পাঠাত। আমি বলতুম, গোরুর গাড়ি পাঠাতে হবে না, আমি হেঁটেই যাব।

একবার গোরুর গাড়ি নদীতে নেমে গেল। গোরু দুটো সাঁতার দিচ্ছে। আমি গোরুর গাড়ির ওপর বসে! গোরুর গাড়ি চালাচ্ছি।

যাতে রাতের অন্ধকারে হাঁটতে না হয় তাই সময় বুঝে বেরতুম। যে-ট্রেন ভোরে বাঁকুড়া পৌঁছত সে-ট্রেনেই কলকাতা থেকে যেতুম। তারপর দিনের বেলা হাঁটতুম।

এরপরেও বাগবাজার থেকে হেঁটে ফুল তুলতে দমদম (কেষ্টপুর) পর্যন্ত গেছি। শুধু দমদম কেন? বাগবাজার থেকে হেঁটে কতবার দক্ষিণেশ্বর গেছি। মঠেও তখন আসতুম হেঁটেই। মঠে আসতে খরচ হতো দু-পয়সা। হেঁটে বাগবাজার থেকে আহিরীটোলা ঘাট। আহিরীটোলা ঘাটে এক পয়সা দিয়ে পেরিয়ে সালকে (সালকিয়া)। তারপর আবার হেঁটে। যেতে আসতে গঙ্গা পেরোতে এক পয়সা এক পয়সা দু-পয়সা। কুঠিঘাটে এসে উঠলে চার পয়সা খরচ হতো। এঘাটে ভাড়া ছিল দু-পয়সা করে। তাই উজিয়ে গিয়ে আহিরীটোলায় গঙ্গা পেরোতুম।

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি সর্বদা বিচারের কথা বলেন। অন্যান্য মহারাজরাও আপনার সম্পর্কে বলেন, আপনি যুক্তিপূর্ণ কথা বলতে অভ্যস্ত। এটা কি আপনার দর্শন পড়ার ফল?

মহারাজ : তাহলে বলি শোন। শুধু দর্শনের দোষ দিয়ে কী হবে? ছেলেবেলা থেকেই আমার স্বভাবটা এরকম। দেশে গেলে বাবা মাঝে মাঝে জমি-জমা দেখাতেন। জমি সব তো একজায়গায় ছিল না, বিভিন্ন দিকে ছড়ানো ছিল। বাবা আমাকে নিয়ে ওসব দেখাতেন। আমি বলতুম, ওসব দেখে আমি কী করব? কেন যে করতেন কে জানে! বাবা একবার আমায় বলেছিলেন, 'তুই যদি সাধুই হবি তবে আমি এসব (জমি-জমা) করলাম কার জন্য?' আমি বলেছিলুম, আমি কি তোমায় করতে বলেছি? দুই কাকা ছিলেন। একজনের ছেলেপুলে ছিল, আরেকজনের ছিল না। যাঁর ছেলেপুলে ছিল না তিনি আমায় বললেন, 'দ্যাখ, তুই

যখন এসব সম্পত্তি নিবি না, আমার তো কোন ছেলেপুলে নেই, কে আমায় দেখবে, তুই ওগুলো আমায় দিয়ে দে।' আর যে-কাকার ছেলেপুলে ছিল তিনি বললেন, 'ওকে দিয়ে কী হবে? ওর তো কোন ছেলেপুলে নেই, কে ভোগ করবে? আমার ছেলেপুলে রয়েছে। আমায় দিয়ে দে।' দুজনেরই যুক্তি খুব প্রবল। আমি বললাম, ওগুলো তো কোনকালেই আমার না, আমি কী করে দেব? কাউকেই দিতে হল না। (হাসি)

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি তো বলেন ভাল কথা বলতে। কিন্তু অনেকে মুখ খোলে না—ভয়ে। পাছে ভুল কিছু বলে ফেলে—

মহারাজ : না, না। সে-ভয় তোমাদের নেই। আমি তো তোমাদের প্রশ্ন করতে বলি। ভুল হলে ক্ষতি কী? আমাদের সময় প্রবীণরা কথাবার্তার ছলে আমাদের ভুল ধরিয়ে দিতেন। আমি বড়দের সাথে কথা বলতে ভয় করতুম না।

আমাদের স্কুলের পণ্ডিতমশায় কিছুতেই ক্লাস নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারতেন না। ছেলেরা খুব চেঁচামেচি করত। আর তিনি তখন ক্লাস ছেড়ে চলে যেতেন। একদিন এরকম অবস্থায় পণ্ডিতমশায় ক্লাস ছেড়ে চলে যেতেই সেখান দিয়ে হেড মাস্টারমশায় যাচ্ছিলেন। হৈচৈ শুনে সামনে আমাকে পেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হয়েছে?' আমি চটপট উত্তর দিলাম, পণ্ডিতমশায় পালিয়েছেন। আমার এরকম উত্তর শুনে হেড মাস্টারমশায় বললেন, 'তোমার এরকম শব্দ ব্যবহার করাটা কি ঠিক হল?' আমার ভুল বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ আমি বললাম, না স্যার, ভুল হয়েছে। একবার সংস্কৃত পরীক্ষায় ধাতুরূপের উত্তর ঠিক জানা ছিল না। পাশের ছেলেটি সেটি লিখেছে। আমি ওর খাতার দিকে তাকিয়ে দেখেও ফেলেছি।

লিখতে যাব, এমন সময় মনে হল—এ কী করছি? এটা তো চুরি করা হবে। লিখলাম না।

প্রশ্ন : দোকান-বাজার করেছেন?

মহারাজ : কেনাকাটা আমি খুব একটা করিনি। তবে ছেলেবেলায় মাঝে মধ্যে বাজারে যেতুম। যদিও আমরা খুব ধনী ছিলুম না, তাহলেও বাজারে গেলে বাজারের সেরা বাছাই জিনিস তা যতই দাম হোক না কেন কিনতুম। বাড়িতে বলত—'ছেলের নজর খুব উঁচুতে।'

প্রশ্ন : খেলাধূলা?

মহারাজ : একবার ডাংগুলি খেলায় সময় গুলিটা খুব জোর এসে আমার চোখের ঠিক নিচে লাগে। দরদর করে রক্ত পড়তে থাকে। সাথীরা ধরাধরি করে নিয়ে যেতে চাইলে আমি বললুম, আমি হেঁটেই যাচ্ছি। বাড়িতে আসতেই বড়রা ডাক্তারখানায় নিয়ে গেলে এখনো মনে আছে, ডাক্তারবাবু খুব জোরে জোরে ও-জায়গাটা পরিষ্কার করে ওষুধ লাগিয়ে ব্যান্ডেজ করে দেন। প্রচণ্ড ব্যথা লাগছিল। এত মাথা ঝিমঝিম করছিল যে, মনে হচ্ছিল প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। মনে খুব রোখ এনেছিলাম যে, একটুও কান্নাকাটি বা চেঁচামেচি করব না। সত্যিই দাঁত কামড়ে সহ্য করেছিলাম। শুধু শেষে টসটস করে চোখের দুকোণ থেকে দু-ফোঁটা জল পড়েছিল।

প্রশ্ন : দুষ্টুমি?

মহারাজ : মেয়েরা যখন বলে, 'মহারাজ, আর পারি না। বাচ্চাটা এত দুষ্টুমি করে!' আমি বলি, আরো করুক। শুনে ওরা হাসে। প্রকৃতপক্ষে মায়েরা মনে মনে চায়, বাচ্চারা একটু দুষ্টুমি করুক। ছেলেবেলায় দুষ্টুমি যে আমি করিনি তা নয়, কিন্তু মার খেয়েছি মনে পড়ে না। মা-বাবা কক্ষনো আমায় মারেননি। শুধু একবার মনে আছে কোন দোষ না

করলেও স্কুলে একজন মাস্টারমশায় মেরেছিলেন। হাইস্কুলে তখন পড়ি। একদিন কেন জানি না কিছুতেই মাস্টারমশায় ক্লাসটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলেন না। ক্লাস থেকে বেরিয়ে একটা বেত নিয়ে এলেন। সামনে ছিলাম আমি। সপাং সপাং করে আমার ওপর বেত মারতে লাগলেন। আমি কিচ্ছু বললাম না। চুপ করে মার খেয়ে যাচ্ছি। ভাবছি—দেখি মারুন, কত মারতে পারেন! পরে মাস্টারমশায়ের খুব দুঃখ হয়েছিল। কারণ, তিনি আমায় খুব ভালবাসতেন। ভাল ছাত্র ছিলাম কিনা। আর কোনদিন আমায় মারেননি। ঐ একদিন। কত আদর করতেন। 'রতন', 'মানিক'—এইসব নামে আমায় ডাকতেন। অন্য ছেলেরা বলেছিল, 'যাক, তুই আমাদের বাঁচিয়ে দিলি।'

একবার কী একটা দুষ্টমি করেছি। মা আমাকে ধরবার জন্য পেছনে ছুটছেন। আমিও ছুটছি। শেষে একটা পাঁচিলের কাছে এসে গেছি। পালাবার আর পথ নেই। পাঁচিলে পিঠ ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছি। মা এসে ধরে বুকে জড়িয়ে নিলেন। মারা আর হল না।

আরেকবার একটা গরু আমায় তাড়া করে। আমি ছুটছি। ছুটতে ছুটতে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেছি। পিছনেই গরুটা এসে গেছে। ভাবছি, এই শিং দুটো দিলে আমার পিঠে বসিয়ে! কিন্তু আশ্চর্য, আমার কাছে এসেই সে থেমে গেল। আমার পিঠে আলতো করে মুখ লাগিয়ে চলে গেল।

এরকম আরেকবার একটা কুকুর আমায় তাড়া করেছে। খুব ছুটছি। কিন্তু কুকুরের সঙ্গে ছুটে পারব কেন? এই আমার পায়ে পায়ে কুকুরটা এসে গেছে। ভয়ে আমি চিৎকার করে উঠেছি। ভাবছি, এই বুঝি দিল আমায় কামড়ে। কিন্তু কী আশ্চর্য, ঠিক এই সময় আমায় এরকম তাড়া

করছে দেখে আরেকটা কুকুর এই কুকরটার দিকে তীব্র বেগে তেড়ে এল। আমি বেঁচে গেলাম। ঐ কুকরটা ওভাবে এটাকে আক্রমণ না করলে এটা নির্ঘাত আমায় কামড়াত। এরকম বেশ কিছু ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে। কিভাবে যেন এক অদৃশ্য হাত আমায় বাঁচিয়েছে!

অদৃশ্য হাত বলতেই আরেকটা ঘটনা মনে পড়ল। কলকাতার রাস্তায় হেঁটে যাচ্ছি, পেছনে তাকাতেই দেখি একটা ঘোড়ার গাড়ির ঘোড়া ঠিক আমার কাঁধের কাছে এসে গেছে। মানে, এক্ষুনি ঘোড়ার গাড়ির চাকা আমার শরীরের ওপর দিয়ে চলে গেল বলে। হঠাৎ কোথা থেকে যেন একটা অদৃশ্য হাত আমাকে ঠেলে রাস্তার একধারে সরিয়ে দিল। এখনো স্পষ্ট স্মৃতি আছে। একেবারে যেন মানুষের হাতের ঠেলা। আশেপাশে কোন লোকজন ছিল না। তাই তো বলছি, অদৃশ্য হাত! কিভাবে যে এরকম হল কে জানে! অনেকবার এরকম রক্ষা পেয়েছি। অদৃশ্য হাত তো রক্ষা করেছে, দৃশ্য হাতও করেছে।

দৃশ্য হাতের একটা ঘটনা বলছি। ছেলেবেলায় আমরা এক্কা গাড়ির পিছনের পাদানিতে ঝুলে পড়তাম। একবার ওরকম ঝুলে রয়েছি। হাত-দুটো পাদানিতে কিন্তু হাঁটু-দুটো মাটিতে লেগে রাস্তায় ঘসড়াচ্ছে এবং ছড়ে যাচ্ছে। নাবতেও পারছি না, চড়তেও পারছি না। এ অবস্থা দেখে একটা লোক কোথা থেকে এসে গাড়ি থামিয়ে আমাকে টেনে নিয়ে এল। সেবার এভাবে রক্ষা পাই।

প্রশ্ন : ঠাকুরের কথা কিভাবে জানলেন?

মহারাজ : ছেলেবেলায় কথামৃত পড়েই ঠাকুরের কথা জেনেছি। সম্ভবত সেসময় এক-দু খণ্ড বেরিয়েছে, আর একজন মাস্টারমশায়ের কাছ থেকে জেনেছি। তখন স্কুলে পড়ি। বিদ্যাসাগরমশায়ের স্কুল। শ্যামবাজারে।

বিকেলে একটু বেড়াতে বেরতুম। একদিন দেখি, একটু দূরে কতগুলো যুবক জমায়েত হয়ে কী করছে। কৌতূহল হল। কাছে গেলুম, দেখলুম আমাদের স্কুলের একজন মাস্টারমশায় ও কতগুলি ছেলে। ওরা ভজন গান করে, রামনাম করে। আমার তো বেশ লাগল। ধীরে ধীরে আমিও ওদের সাথে জুটে গেলুম। ওরাও দেখল, বেশ গো-বেচারী একটা ছেলে পাওয়া গেছে। কাছেই একটা শিবমন্দির ছিল। ধীরে ধীরে জমায়েতটা শিবমন্দিরেই হতে শুরু করল। ঐ যে মাস্টারমশায়ের কথা বললুম, যদিও তিনি আমাদের ক্লাস নিতেন না, আমাকে চিনতেন। শিবমন্দিরে সন্ধেয় আরতি হতো। তারপর দেখতুম, ছেলেরা জপ-ধ্যান করত। আমাদের (মামা) বাড়িতে নিয়ম ছিল—সূর্য ডোবার সঙ্গো সঙ্গো ঘরে ফিরতে হবে। সন্ধে উতরে ঘরে ঢুকলে বকুনি খেতে হবে। প্রথম প্রথম সন্ধেয় আরতি দেখে চলে আসতুম। কিছুদিন পর মনে হল, এরা সব সন্ধের পর জপ-ধ্যান করে। আমিই বা কম কিসে! আমিও সন্ধে-আরতির পর থাকতে শুরু করলুম। ধ্যান করতুম। ধ্যান মানে আর কী! চোখ বুজে চুপ করে সটান বসে থাকতুম। আর মনে হতো এই এক্ষুনি একটা কিছু হয়ে যাবে। কদিন পর মাস্টারমশায় আমায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি মন্দিরটা মুছতে পারবে?' নিশ্চয়ই পারব—বলে তখন থেকে রোজ মন্দির মোছার কাজটা শুরু করলুম। কদিন পর আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'সন্ধের আরতিটা তুমি করতে পারবে?' আরতি করতে পারার সুযোগ পাওয়া তো আমার কাছে তখন স্বর্গ পাবার মতো। তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেলুম। তখন থেকে আমিই আরতি করতুম। এপর্যন্ত তো বাড়িতে দিনে অন্তত দুবার খেতে যেতুম। এই ছিল বাড়ির সঙ্গো সম্পর্ক। দেখলুম, কয়েকজন ওখানে রাতেও থাকে। ভাবলুম, দুবার বাড়ি যাই—খেতে আর রাতে

শুতে। রাতে শোওয়াটাই বা এখানে হোক না কেন। রাতেও থাকতে শুরু করলুম।

রাতে কী দেখলুম শোন। তোমাদের বলছি শুনে রাখ। আমরা বাগবাজারের ছেলে। তাসের আড্ডা দেখেছি, গুলির আড্ডাও দেখেছি। এবার সম্পূর্ণ অন্য একধরনের আড্ডা দেখলাম। সাধারণত কলকাতার ছেলেদের সম্পর্কে সকলের কিরকম একটা ধারণা! কিন্তু এখানে দেখলাম তার বিপরীত। দেখতাম, গঙ্গার পাড়ে বেশ কিছু যুবক ছেলে ধ্যান-জপ করে। সকাল হলে বাড়ি ফেরে। আশ্চর্য হলাম। এ এক অন্য কলকাতা। দিনের পর দিন তাদের আমি সারারাত ধরে ধ্যান-জপ করতে দেখেছি।

যা হোক, এর মধ্যে শিবমন্দির থেকে আমাদের আস্তানা উঠে একটা ভাড়াটিয়া বাড়িতে এসেছে। জমায়েত ক্রমশ বাড়ছিল বলে একটা বাড়ি ভাড়া করা হল এবং আশ্রম ওখানেই উঠে এল। বাড়িতে মাঝে মাঝে যেতুম, মানে বোঝাতে চাইতুম—আমি তোমাদেরও আছি, সম্পূর্ণ আশ্রমের হয়ে যাইনি। বাড়িতে খুব একটা কিছু বলতে আর সাহস করত না—পাছে যেটুকু সম্পর্ক আছে সেটুকুও বন্ধ করে দিই। আর পড়াশুনার সময়ও এখন কম পেতুম। কিন্তু স্কুল থেকে কোন খারাপ কিছু, মানে পড়াশুনায় অবহেলা করছি—এরকম কিছু শুনতে পেত না। তাই আমায় কিছু বলতেও পারত না। করতুম কী, খুব ভোর ভোর উঠে স্কুলের পড়া তৈরি করে ফেলতুম। বাড়ির ওরা আশ্চর্য হতো। ভাবত, সর্বদাই আশ্রমে থাকে, পড়ে কখন! যাইহোক, ঐ আশ্রমে বেশ কিছু সাধু যাতায়াত করতেন। তাঁদের মধ্যে নির্বেদানন্দজী, তাঁর সহযোগী ভরত মহারাজ (স্বামী সন্তোষানন্দজী), জ্ঞান মহারাজ তো থাকতেনই। পরে শরৎ মহারাজও (স্বামী সারদানন্দজী) গেছেন। আরো অনেকে আসতেন।

ভাড়াবাড়ির ওপরের শিবমন্দিরের সরু এবং ঢাল সিঁড়ি দিয়ে শরৎ মহারাজকে ওরকম ভারি শরীর নিয়ে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে নামতে দেখেছি। ছেলেদের আন্তরিকতার কী মর্যাদাই না দিতেন, পরে আমাদের দুঃখ হতো। ভাবতুম, ওঁদের আমরা কী-ই না ছেলেমানুষি করে কষ্ট দিয়েছি। যা হোক, ওখান থেকেই তো জীবনের পরবর্তী যাকিছু। আর ওঁদের কৃপাদৃষ্টিতেই তো সব হল।

॥ ১৫১ ॥

একবছর গুরুপূর্ণিমা পড়েছিল ৯ জুলাই। ঠিক তার আগের দিন সাধু-ব্রহ্মচারীদের প্রণামের সময় মহারাজ বললেন, ‘বল কিছু ভাল কথা বল।’ কী বলব ভাবতে ভাবতে বললাম, ‘মহারাজ, আগামী কাল গুরু-পূর্ণিমা।’ বলে চুপ করে আছি। একটু পর মহারাজ বললেন, ‘হ্যাঁ গুরুবাদ মারাত্মক।’

—কেন, মহারাজ?

মহারাজ : কেন আর কী? প্রকৃত গুরুকে কজন ধরতে পারে? ঠাকুর যে বলেছেন, ‘সচ্চিদানন্দই গুরু’ সে-কথা কজন বুঝতে পারে? এই মানুষ-গুরুকে নিয়েই লোকে মাতামাতি করে।

—তাহলে মানুষ-গুরু কী?

মহারাজ : মানুষ-গুরু মাধ্যম মাত্র। সেটি বুঝতে না পেরে লোকে মানুষ-গুরুকেই সব ভাবে আর পরে হা-হুতাশ করে। দেখ না, এই শরীরটাকে (নিজের শরীর দেখিয়ে) তো আর কদিন পরে তোমরা টেনে হিঁচড়ে পুড়িয়ে ফেলবে। তার সঙ্গে সঙ্গেই কি গুরু অদৃশ্য হয়ে যাবেন? না, সচ্চিদানন্দ-গুরু আছেন, তিনি থাকবেনই।

একবারের কথা। ব্রহ্মচর্য দীক্ষার্থীরা এসেছে মহারাজকে প্রণাম করতে। প্রণাম করে তারা মহারাজের কাছে বসেছে। সকলের হয়ে একজন ব্রহ্মচারী মহারাজ হাতজোড় করে বলল, 'মহারাজ, আগামী কাল স্বামীজীর তিথিপূজা। এই উপলক্ষে পরদিন ভোররাতে আপনি কৃপা করে আমাদের ব্রহ্মচর্য ব্রতে দীক্ষিত করবেন, এই আমাদের প্রার্থনা।' মহারাজ একটু আনমনা। ব্রহ্মচারী মহারাজ পুনরাবৃত্তি করলে খুব গম্ভীর ও দৃঢ়স্বরে মহারাজ বললেন, 'কী! আমি ব্রহ্মচর্য দেব? না, ঠাকুর তোমাদের ব্রহ্মচর্য দেবেন।' মহারাজের কথার গাম্ভীর্য ও দৃঢ়তা মুহূর্তে উপস্থিত সকলের মনে একটা দৃঢ় ছাপ এঁকে দিল যে, ঠাকুরই সংঘগুরুর মধ্যে নিত্য বর্তমান ও ক্রিয়াশীল। আরেকদিন একটি ছেলের কথা হচ্ছে। সেবক মহারাজ মহারাজকে তাঁর প্রসঙ্গে বলল, 'ওকে আপনিই দীক্ষা দিয়েছেন। আপনিই ওকে দীক্ষা দিয়েছেন।' দুবার কথাটি বলতে মহারাজ যেন বাধা দিয়ে বললেন, 'না, আমি কাউকে দীক্ষা দিই না, ঠাকুর দীক্ষা দিয়েছেন।' দৈনন্দিন ব্যবহাররত অবস্থায়ও মহারাজের মন কত সজাগ ও সচেতন তা দেখে আমরা স্তম্ভিত হলাম।

আশ্রমের কাজেই তপস্যার কাজ হয়ে যায়—সে-কথা মহারাজ মানতেন না। বলতেন, 'মাঝে মাঝে তপস্যায় যাওয়া দরকার। কিছুদিনের জন্য পরিচিত পরিবেশ বা লোকজনের সংস্রব থেকে দূরে গিয়ে সাধন-ভজন করা প্রয়োজন। পরিচিত পরিবেশে আশ্রমের কাজ করতে করতে একটা easy going life style চলে আসে। সেটিকে ভাঙতে মাঝে মাঝে অন্যত্র তপস্যার প্রয়োজন।' তারপর একটু হেসে বলতেন, 'তবে ছুটি পেলে।' কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে ইচ্ছেমতো বেরিয়ে পড়া মহারাজ একেবারে পছন্দ করতেন না।

স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে মহারাজের ছিল আদর্শের প্রতি আপসহীন মনোভাব। প্রয়োজনে কঠোরও হতেন। কিন্তু কঠোর, রূঢ় বা তীক্ষ্ণ বাক্য ব্যবহার না করে সর্বদাই অত্যন্ত মিষ্টি ও নরম সুরে বলতেন। বলতেন, 'কঠোর আদেশ বা সিদ্ধান্তও ধীরে বলা যায়।' এপ্রসঙ্গে General Cariappa-এর একটি উদ্ধৃতি দিয়ে বলতেন, 'Command does not need high pitch.'

মহারাজ তখন রাজকোটে। মহারাজের কাছে যাতায়াত করতে করতে একটি গুজরাটি ছেলের সাধু হওয়ার ইচ্ছা হয়। এদিকে ছেলেটির বাবাও মহারাজের খুব পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ। তিনি চান না যে, ছেলে সাধু হয়। ছেলেকে বুঝিয়েও যখন বাগে আনতে পারছেন না তখন ভদ্রলোক একদিন ছেলেটিকে নিয়ে মহারাজের কাছে এলেন। ভাবটা এই যে, মহারাজ বারণ করলে ছেলে আর সাধু হবে না। আর উনি বললে মহারাজ তো ছেলেকে বারণ করে দেবেনই। মহারাজকে ভদ্রলোক বললেন, 'মহারাজজী, আপনি ওকে একটু বুঝিয়ে বলুন তো যে সংসার-জীবন অনেক ভাল। সাধু হবার দরকার নেই। আপনি বোঝালে ও নিশ্চয়ই বুঝবে।' ভদ্রলোক দুবার ওরকম বলার পরেও মহারাজ কিছুই বললেন না। বারবার অনুরোধ করলে মহারাজ বললেন, 'দেখুন, ওকে সন্ন্যাসজীবনের চেয়ে সাংসারিক জীবন ভাল ও শ্রেষ্ঠ—এটা বলতে হলে আগে আমাকে তো গেরুয়া ছেড়ে দিয়ে তবে সে-কথা বলতে হয়। তা তো আমি পারব না।' ভদ্রলোক একেবারে চুপ।

রিলিফের কথা হচ্ছে। অনেক সব মজার অদ্ভুত অভিজ্ঞতার কথা চলছে। দানের প্রসঙ্গে একটু হালকাভাবেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'মহারাজ, আমরা সাধুরা কি আর দান করতে পারি?' মহারাজের মুখ গম্ভীর হয়ে

গেল। নিজের হাত দিয়ে হৃদয় স্পর্শ করে দেখিয়ে বললেন, ‘আমরা এটা দান করতে পারি। হৃদয় মানে সহানুভূতি—sympathy, feeling; কারণ এটা আমাদের নিজস্ব। শোন, একবার কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী রিলিফ থেকে ফিরে পূজনীয় শরৎ মহারাজের কাছে এসেছে। মহারাজ জিজ্ঞেস করলেন, ‘তোমরা তোমাদের কী দিয়েছ victims-দের?’ তারা চাল, ডাল, আর যা যা দিয়েছিল তার উল্লেখ করল। মহারাজ আবার বললেন, ‘তোমাদের কী দিয়েছ?’ তারা তখন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। ‘জিনিস তো লোকেরা তোমাদের দিয়েছে, ওগুলো তো তোমাদের নয়। তোমরা দিয়েছ তোমাদের হৃদয়—যেটা তোমাদের নিজেদের।’

আরেকদিন sitting-এর পর সকলে একে একে প্রণাম করছে। মহারাজ বলছেন, ‘দেখ এই যে তোমরা আস, আলোচনা হয়—এতে আমারও একটা স্বার্থ আছে।’ আমরা উৎসুক দৃষ্টিতে মহারাজের দিকে তাকিয়ে আছি। মহারাজ বলছেন, ‘এই প্রশ্নাদি আলোচনায় শুধু যে তোমাদের লাভ হচ্ছে তা নয়, আমারও বুদ্ধি মার্জিত হচ্ছে। তোমাদের প্রশ্নের উত্তর যথাযথ ভেবে দিতে হয়, চিন্তা করতে হয়; এতে আমার বুদ্ধিও মার্জিত হচ্ছে।’

একদিন বলছেন, ‘দেখ এই যে তোমাদের প্রশ্ন করতে বলি তার মানে এই নয় যে, আমি সব জানি।’ কত সময় মহারাজ ছোট ছোট কথায় আমাদের মনে বৈরাগ্যের দীপশিখাকে উসকে দিতেন। একদিন রাতের sitting বসবার একটু পরেই ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলছেন, ‘বল, বল, ভাল কথা হোক। আর মাত্র দশ মিনিট সময় আমাদের। পরীক্ষিতের সাতদিন সময় ছিল আর আমাদের মাত্র দশ মিনিট।’

সু—মহারাজ ঘরে ঢুকলেন। পূজনীয় মহারাজ আলোচনার রেশ টেনে বলে চলেছেন, ‘বুঝলে জীবনে একটা ব্যস্ততা আনবার দরকার। ব্যস্ততা আসছে না। শরৎ মহারাজ খুব সুন্দরভাবে লীলাপ্রসঙ্গে ঠাকুরের জীবনের এই ব্যস্ত ভাবকে ফুটিয়েছেন— ঠাকুর কলকাতায় যাবেন ready হয়ে বসে আছেন। একে ওকে বারবার পাঠাচ্ছেন, দেখ গাড়ি এল কিনা। গাড়ি আসেনি শুনে আবার বসলেন। একটু পরেই আবার ডাকছেন, ওরে লেটো, ওরে বাবুরাম, ওরে রাখাল, দ্যাখ দ্যাখ গাড়ি এল কিনা। সবাইকে ব্যস্ত করে ফেলছেন। গাড়ি এসেছে শুনেই তাড়াতাড়ি সবাইকে ডেকে গাড়িতে গিয়ে বসেছেন। বসেই বলছেন, গাড়োয়ানকে বল। কেউ হয়তো বলল, মশায়, গাড়োয়ান একটু ওদিকে গেছে, এই এক্ষুনি আসছে। ঠাকুরের আর তর সইছে না! বলছেন, দুর! তোরাই চালিয়ে দে।

॥ ১৫২ ॥

(মহারাজের কাছে নানা প্রশ্ন নিয়ে গৃহীভক্তেরাও আসতেন। মহারাজ তাঁদের নানাভাবে ধর্মপথে চলতে উৎসাহ দিতেন।)

ভক্ত : বাবা, আপনি যে স্থিরতা, সহ্যগুণ, আরো যত গুণের কথা বলেন তার একটাও তো আমাদের মধ্যে নেই। সহ্যশক্তি তো একটুও নেই।

মহারাজ : কে বলেছে গুণ নেই? আমি তো দেখতে পাচ্ছি তোমাদের অনেক গুণ আছে। তোমরা এখানে এসে চুপ করে বসে থাক বলে কি গুণ নেই? কেউ ফেলনা নয়। তোমাদের মতো মেয়ে সংসারে কটা পাওয়া যায়?

—‘দিব্য প্রসঙ্গে’ পড়ছিলাম বিজ্ঞান মহারাজ বলছেন যে, এজন্মে যতটুকু সৎকাজ করে পরের জন্মে তারপর থেকে হয়।

মহারাজ : হয় তো! কিন্তু কেউ কি দেখতে পায়?

—আমাদেরও কি তাই?

মহারাজ : তুমি কি আগের জন্ম দেখতে পাচ্ছ? তবে কিছু নিশ্চয়ই আছে, নইলে এখানে কী আছে? তোমাদের আসতে ভাল লাগে কেন?

—সে তো আর আমরা জানি না।

মহারাজ : জানতে হবে না। আগের জন্ম কি দেখতে পাচ্ছ?

—না। তবে, এ-জন্মে যা দেখতে পাচ্ছি, যা করছি, পরের জন্মে তারপর থেকে হবে?

মহারাজ : পরের জন্মের দরকার কী? এজন্মেই হোক না।

প্রশ্ন : ঠাকুর যে বলেছেন, কেউ কেউ আম খেতে এসে আম খেয়ে মুখ মুছে চলে যায়, আবার কেউ কেউ সবাইকে ডেকে নিয়ে ভাগ করে আম খায়। এর মানে কী?

মহারাজ : (কৌতুক করে) তুমি কি ভাগ করে খাবে, না খেয়ে মুখ মুছে চলে যাবে?

—আমি আর কোথায় পাব? আপনি আমাকে যা দেবেন তাই তো খাব।

মহারাজ : আমার আর কিছু দেবার নেই। যা ছিল সব দিয়ে দিয়েছি।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন, একহাতে ভগবানকে ধরে থাকতে হয়, আরেক হাত দিয়ে সংসারকে ধরতে হয়। তারপর কর্ম শেষ হলে দুহাতে ভগবানকে ধরতে হয়।

মহারাজ : তুমি তো একহাতেই ভগবানকে ধরেছ শক্ত করে। না হলে আর এখানে আস কী করে? এত কষ্ট করে রোজ আস, সেটা টান না থাকলে কি আসতে পারতে? তোমার চারপাশে তো কত লোক রয়েছে,

তারা কি কেউ আসে? তোমরা সিনেমা যাও না, বেড়াতে যাও না, এখানে আসতে চাও—এটা কি ভগবানকে না ধরলে হয়?

প্রশ্ন : ঠাকুর কাশীতে গিয়ে সব শিবময় দেখেছিলেন, আমরা তো আর তা দেখতে পাব না। যদি ঠাকুরের এই কথাগুলি ভাবি তবে কি হয় না?

মহারাজ : সে কাশী গিয়ে কেন, ঠাকুরের কথা এখানে বসেও ভাবতে পার।

—স্বর্গ, নরক—এইসব কি সত্যিই আছে?

মহারাজ : কী দরকার স্বর্গ, নরক জেনে? এখানেই থাক না।

—হ্যাঁ, তাই থাকব, তবু জানতে ইচ্ছে করে।

মহারাজ : ওসব কিছু জানতে হবে না।

—দেবলোক, ইন্দ্রলোক এসব কী?

মহারাজ : তোমাদের কী দরকার? ওসব ভোগের জায়গা, গেলে আবার ফিরে আসতে হয়।

—মুক্তি চাই না মহারাজ। তবে তাঁকে যেন পাই।

মহারাজ : তাই তো।

—শরীর খারাপ থাকলে উঠতে দেরি হয়, ভোরে বেশি নাম করতে পারি না। কত অনিয়ম হয়ে যায়। তাতে দোষ হবে?

মহারাজ : শরীর খারাপ থাকলে কী করবে? উপায় নেই।

—সকালে কলেজ বলে জপ করতে পারি না, কলেজ থেকে এসে করি।

মহারাজ : বেশ তো, ঠাকুরকে বলবে, 'ঠাকুর জপ করতে পারলুম না, এসে করব।' কিছু খেয়ে কলেজ যাও তো?

—হ্যাঁ, বিছানায় বসে দশবার জপ করে তারপরে খাই।

মহারাজ : বেশ, এই তো। তাহলেই হল।

প্রশ্ন : আমাদের ঈশ্বরের পথে যাবার সময় প্রতিনিয়ত সংসারের যেসব কামনা-বাসনা বন্ধন সৃষ্টি করছে, সে-বন্ধন কি গুরুকৃপায় সরল হয়ে যাবে না?

মহারাজ : হবে, নিশ্চয়ই হবে। সব হবে।

প্রশ্ন : কোনদিন আসতে না পারলে মনে মনে প্রণাম জানালে গ্রহণ করবেন তো?

মহারাজ : প্রণাম করে তোমার মনে তৃপ্তি হয় তো? তাহলেই হল। আমি তো প্রণাম জানাবার আগেই গ্রহণ করে নিই।

—সংসারের নানা বাধার জন্য আপনার কাছে আসতে পারি না। অথচ আসবার জন্য মন ছটফট করতে থাকে, তখন খুব কষ্ট হয়। আপনি তো সব জানেন। আমি কী করব?

মহারাজ : আসতে পার না তো কী হয়েছে মা? ঘরে বসে জানিও। নিশ্চিত জেনো আমি সেসব শুনতে পাব।

প্রশ্ন : মহারাজ। জীবনে অনেক পাপ করেছি—

মহারাজ : যা করেছ আর করো না। ঠাকুরের কাছে বলবে, 'ঠাকুর যা করেছি, আর করব না।'

—তাহলে কোন দোষ হবে না তো?

মহারাজ : না। কোন দোষ হবে না।

প্রশ্ন : বাবা, পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ ঠাকুরকে বলেছিলেন, শাস্ত্র-টাস্ত্র যতই পড়ি, আপনার কাছে শুনলে সব জল হয়ে যায়। আমরা তো ঠাকুরকে দেখিনি, তাই আপনার কাছেই শুনতে চাই—

মহারাজ : (ঘাড় নেড়ে নেড়ে সম্মতি জানিয়ে) নিশ্চয়ই। অনেক জিজ্ঞাসা কর, আমিও বলি। নইলে আমি চুপ করে বসে থাকব, আর তোমরা চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবে।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুরের চারটি ছবির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমরা তিনটি ছবি দেখতে পাই—(১) ধ্যানস্থ, (২) থাম ধরে দাঁড়িয়ে, (৩) হাত তুলে।

মহারাজ : আরেকটি ছবি ছিল। সেটি ভাল হয়নি বলে গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হয়। আর ঠাকুরের দেহ যাবার পর একটি ছবি আছে, সন্তানেরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। সেটি শোকের ছবি বলে আমরা রাখি না।

—ঐ ছবিটি একজন প্রাচীন ভক্তের বাড়িতে দেখেছি। জানি না কোথা থেকে জোগাড় করেছেন।

মহারাজ : তা হয়তো হবে, ছাপা হয়েছিল, কোথাও পেয়েছে। ছবি ঐ তিনটিই আছে।

ভক্ত : মহারাজ, আজকাল কাজের খুব চাপ। বেশি আসতে পারি না—

মহারাজ : ধর, এখন ভগবান তোমাদের সামনে যদি আসেন, কী করবে? বলবে যে দাঁড়াও, রান্না সেরে তবে তোমায় দেখব?

—না, জড়িয়ে ধরব।

অন্য ভক্ত : বাবা, চিনতে কি পারব?

মহারাজ : অ্যাই, অ্যাই কথাটা যে বলেছে, এটা ঠিক।

—তিনি বোঝালে বুঝব।

মহারাজ : ভগবান এলেন, সবাই বলল, 'ও দশরথের ব্যাটা।'

—বারো জন তো চিনেছিলেন।

মহারাজ : ও! তুমি ঐ বারো জনের মধ্যে থাকতে চাও?

—তা জানি না। মহারাজ, এক জায়গায় পড়েছিলাম যিশু একদিন ভক্তদের নিয়ে বসে আছেন, তখন ভক্তরা বলল, 'প্রভু ল্যাজারাসকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন, পরকাল কেমন?' পরজন্ম কেমন? যিশু বললেন,

'ভগবানের সন্তানেরা এতকাল এসে বুঝিয়ে যাচ্ছে হল না, এখন ল্যাজারাসকে ডাকতে হবে?'

মহারাজ : হ্যাঁ, সে-গল্প খুব সুন্দর। একজন দরজি খুব ভক্ত। ভগবানের নাম করে। একদিন খুব বলছে, 'ভগবান, এত করে ডাকছি, তুমি কবে দেখা দেবে?' ভগবান, বললেন, 'আচ্ছা, কাল তোমার কাছে আসব।' সে সকাল থেকে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে কখন ভগবান আসবেন। এমন সময় দেখল একজন মেথর ঝাড়ু দিচ্ছে। দরজি বলল, 'এস ভাই, এই শীতে ঝাড়ু দিচ্ছ, একটু চা খেয়ে যাও।' সে চা খেয়ে খুব আনন্দ পেল। এবার সে দেখছে, ঐ ঠান্ডায় একজন মা তার বাচ্ছা ছেলেকে কোলে করে যাচ্ছে। দরজি বললে, 'এস, একটু চা খাও।' মহিলাটি এসে চা খেলেন, দরজি বাচ্চাটাকে কিছু খেতে দিল। তারা খুব আনন্দ করে চলে গেল। এবার দেখে, একজন ফলওয়ালা খুব গোলমাল করছে। সে গিয়ে ফলওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কী হয়েছে? কেন গোলমাল করছ?' ফলওয়ালা বলল, 'বাবু, এই বাচ্চারা ফল খেয়ে পয়সা দেয়-নি।' দরজি বলল, 'ঠিক আছে, আমি পয়সা দিয়ে দিচ্ছি।' পয়সা দেওয়ায় বাচ্চারা ফল নিয়ে খুশি হয়ে চলে গেল।

এবার সে ভাবছে, ভগবান তো এল না। রাতে আবার প্রার্থনা করছে, 'কই সারাদিন চলে গেল ভগবান তুমি তো এলে না?' ভগবান তখন বলছেন, 'আমি তোমার কাছে তিনরূপে তিনবার গেছি। ঐ মেথর—যাকে চা খাওয়ালে সে-ই আমি। ঐ মা, ছোট্ট ছেলে নিয়ে—সে-ও আমি। আর ঐ যে ছোট্ট ছেলেগুলি খুশি হয়ে চলে গেল—ওরাও হচ্ছি আমি। কাজেই আমি সর্বভূতে, কিন্তু কেউ আমায় চিনতে পারে না।'

স্বামীজী বলেছেন :

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

(ভক্তসঙ্গে প্রসঙ্গ করতে করতে নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ায় সেবক মহারাজ ভক্তদের উদ্দেশে হাত দেখিয়ে [আশীর্বাদসূচক] দিতে বলায় পূজনীয় মহারাজ একটি মন্তব্য করলেন—)

মহারাজ : (সমবেত ভক্তদের দেখিয়ে) এখনি হাত দেখালে এরা আমায় গালাগালি করবে। বলবে যে, 'আমরা কি বানের জলে ভেসে এসেছি?' তা তোমরা বানের জলে ভাসবে কেন? আমি গঙ্গাবারিতে তোমাদের ভাসিয়ে দেব—তোমরা ব্রহ্মসমুদ্রে মিশে যাবে।

॥ ১৫৩ ॥

(ভক্তরা সকলে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। পূজনীয় মহারাজ সব দিক ভাল করে দেখে নিলেন। এরপর সেবক স— মহারাজকে ইশারায় কাছে ডেকে চুপি চুপি কিছু বললেন। স— মহারাজ বললেন, 'বসুক।' এই উচ্চারণটি কানে যাওয়া মাত্র বাইরে অপেক্ষমান ভক্তবৃন্দ বন্যাবেগের মতো ঘরের ভিতর ঢুকে বসে পড়ল। শুরু হল কথোপকথন—)

মহারাজ : তোমরা কী করে বুঝলে যে, আমি তোমাদের বসবার কথা বলছি?

ভক্ত : আমরা বুঝেছি মহারাজ!

সে. ম : ঐ যে, আমি 'বসুক' কথাটা জোরে বলে ফেলেছি।

ভক্ত : মহারাজ, মায়া কেন যাচ্ছে না?

মহারাজ : কোন ভিখারিকে তুমি দয়া করতে পার, কিন্তু তোমার ছেলেকে তো আর দয়া করতে পার না!

—বাবা, কী যে বলেন না, কোন ঠিক নেই!

মহারাজ : সব ঠিক আছে। কিছু ভুল নেই। বাবার এখনো ভীমরতিতে ধরেনি! (সকলের উচ্চ হাসি)

প্রশ্ন : বাবা, তীর্থ করলে কি মন শুদ্ধ হয়?

মহারাজ : বলে তাই!

—আর যারা না যেতে পারে?

মহারাজ : তাদের বাড়িতে বসে চিন্তা করলেই হবে। (ভক্তটি তাঁর নির্দিষ্ট জায়গায় বসতে যাচ্ছেন দেখে মহারাজ কৌতুক করে তাঁকে বলছেন—) দেখ, লেগে যায় না যেন। তোমার লাগে লাগুক, জানলাটা যেন না ভাঙে। (সকলের হাসি)

ভক্ত : মহারাজ, কাল স্বপ্নে দেখলাম আপনি মঠের বাগানে বসে নিজে নিজে তেল মাখছেন।

মহারাজ : (উচ্চ হাসি) আমি তো নিজে নিজে কিছু করতেই পারি না। স— মহারাজ তেল মাখিয়ে দেয়।

—না মহারাজ, আমি আর কাউকে দেখতে পাইনি। আপনাকেই একা একা তেল মাখতে দেখেছি।

(এই কথোপকথনের সময় উদ্দিষ্ট সেবক মহারাজ একটু ঘরের বাইরে গিয়েছিলেন। তিনি ঘরে এসে ঢুকতেই পূজনীয় মহারাজ কপট তিরস্কারে কৌতুক শুরু করলেন—)

মহারাজ : এই যে স—, তুমি আজকাল duty-তে ফাঁকি দিচ্ছ।

সে. ম : (কিছুটা হতচকিতভাবে) কেন মহারাজ! কী হয়েছে?

মহারাজ : ঐ যে, ও বলছে, আমাকে বাগানে বসে নিজে নিজে তেল মাখতে দেখেছে। তুমি কোথায় গিয়েছিলে? তোমাকে দেখতে পায়নি কেন?

সে. ম : ওর কথায় কান দেবেন না মহারাজ। ও তো ঘুমিয়ে ছিল। চোখে চশমা ছিল না, তাই দেখতে পায়নি। ওকে চশমাটা পরতে বলুন।

মহারাজ : ওঃ! তাই বল, ঠিকই তো। স— মহারাজ তো ঠিকই বলেছে। হ্যাঁ, তোমার চোখে চশমা ছিল না, তাই দেখতে পাওনি। নইলে ও আমায় ছেড়ে যাবে কোথায়? (ভক্তদের উচ্চ হাসি)

সে. ম : আজকের মতো সময় শেষ। ওঁদের এবার হাত দেখিয়ে দিন মহারাজ।

মহারাজ : সে কী! আমি তো এখনো শুরুই করলাম না। শোন, স্বামীজী এক জায়গায় বক্তৃতা দিচ্ছেন। দূর থেকে একজন ঘড়ি উঁচু করে দেখাচ্ছে। স্বামীজী বলছেন, 'কী হল? ঘড়ি দেখাচ্ছ কেন?' লোকটি বলল, 'সময় হয়ে গেছে।' স্বামীজী বললেন, 'সে কী! আমি তো এখনো আরম্ভই করিনি, তাতে এখনই শেষ করব কী করে?'

সে. ম : আপনি এবার হাত দেখিয়ে ঠান্ডা করে দিন, মহারাজ।

মহারাজ : এরা খুব ভাল লোক, তাই। অন্য কেউ হলে গালাগালি দিতে দিতে যেত।

সে. ম : গালাগালি কেউ আপনাকে দেবে না। আমাদের দেখিয়ে বলবে—এরা আছে, তাই।

মহারাজ : যাকে সামনে পাবে দেবে। সে তো ঠাকুরকেও অনেক গালাগালি খেতে হয়েছিল।

ভক্ত : আজ আমরা সকলে আসি, মহারাজ।

মহারাজ : এস, এস।

॥ ১৫৪ ॥

ভক্ত : মহারাজ, এখানে না এলে সত্যিই বাধা-বিপত্তি খুব হয়, অশান্তিও হয়—

মহারাজ : তবে কী করব বল? তাহলে আমাকে সব সময় তোমাদের পাহারা দিতে হয়।

(এমন সময় পূজনীয় মহারাজের পায়ের ওপর কয়েকটা মাছি বসেছে। মহারাজ সেবক মহারাজকে বলছেন—)

মহারাজ : কই, নিয়ে এস। (হাত দিয়ে ভঙ্গি করে লাঠির আকার দেখাচ্ছেন, অপর সেবক তখন এসে হাত দিয়ে মাছিগুলোকে উড়িয়ে দিলেন।) আমি ওদের মারব বলে ঠিক করলাম, আর তুমি উড়িয়ে দিলে! (সকলের হাসি)

—আমার মনে হল, আপনি মাছিগুলোকে বলছেন, 'অ্যাই, তোরা উড়ে যা, নইলে মারব।'

মহারাজ : না, আমি না, (সেবক স— মহারাজকে দেখিয়ে) আমাদের যমদূত আছে। (সমবেত ভক্তদের হাসি)

সে. ম : যমদূত তো ভাল, ব্রহ্মজ্ঞ।

মহারাজ : যম ব্রহ্মজ্ঞ, যমদূত নয়। তার নরক নিয়ে কারবার।

সে. ম : কেন? স্বর্গেও তো পাঠায়।

ভক্ত : মহারাজ, গণেশের পূজা সবার আগে হয় কেন?

(পূজ্যপাদ মহারাজ এবার ভক্তদের সঙ্গে গণেশ-প্রসঙ্গ নিয়ে রঙ্গরসে মাতলেন—)

মহারাজ : গণেশের খুব বড় পেট, আর খুব খেতে পারে, তাই।

—আপনি মজা করছেন। বলুন না—

মহারাজ : গণেশকে দেখতে কদাকার, তাই মা দুর্গা বললেন—ওর পূজা আগে হবে তবে অন্য দেবতার পূজা। মা তো, তাই ছেলের জন্য চিন্তা করছেন।

—ও। মহারাজ, কেন ওঁর ঐরকম হাতির মুখ হল?

মহারাজ : সে এক বড় গল্প আছে। গণেশ যখন জন্মাল খুব সুন্দর ছিল। এরকম কদাকার ছিল না। সব দেবতারা তাকে দেখতে গেলেন, কিন্তু শনি ঠাকুর গেলেন না। তখন সবাই তাঁকে না যাবার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'আমার দৃষ্টি যার ওপর পড়ে সে-ই লুপ্ত হয়ে যায়, তাই আমি ভয়ে যাচ্ছি না।' সবাই বললে, 'যাও, কিছু হবে না।' তখন শনি দেখতে গেলেন আর যেই দেখলেন, অমনি গণেশের মাথা উড়ে গেল। এবার দুর্গা বললেন, 'তাই তো, এখন কী হবে?' উত্তরে শনি বললেন, 'উত্তরদিকে মাথা করে যে শুয়ে আছে তার মাথা কেটে এর মাথায় জুড়ে দাও।' তখন একটা হাতি উত্তরদিকে মাথা করে শুয়েছিল, তার মাথাটা কেটে গণেশের মাথায় জুড়ে দিল। এবার গণেশকে দেখতে কদাকার হয়ে গেল। তখন মা দুর্গা বললেন, 'গণেশের পূজা আগে হবে। তারপর সব দেবতার পূজা।'

সে. ম : মহারাজ, গণেশের একটা দাঁত নেই কেন বলুন তো—

মহারাজ : ওঃ, সে আরেক গল্প। শোন, গণেশ তো খুব খেতে ভালবাসে। লাড্ডু খেতে ভালবাসে বলে এক জায়গায় গিয়ে খুব লাড্ডু খেয়েছে। এত খেয়েছে যে, পেট ফেটে গেছে। তখন সব লাড্ডুগুলো বেরিয়ে পড়েছে। এবার গণেশ সেগুলোকে কুড়িয়ে পেটের ভিতর পুরছে। এমন সময় চাঁদ এই কাজ দেখে হেসে ফেলেছে। গণেশ তখন রেগে গিয়ে বলছে, 'কী! আমার পেট ফেটে গেছে, আর তুমি হাসছ?' এই বলে

চাঁদকে মারতে গেছে। কিন্তু কী দিয়ে মারবে? হাতের সামনে কিছু ছিল না। তাই নিজের একটা দাঁত ভেঙে নিয়ে চাঁদকে ছুঁড়ে মেরেছে। চাঁদ খুব ভয় পেয়ে মহাদেবের কাছে গিয়ে বলছে, 'দেখ! তোমার ছেলে আমায় এমন করে মেরেছে।' শুনে মহাদেব বললেন, 'তুমি আমার কাছে থাক, তাহলে আর ভয় নেই'—এই বলে চাঁদকে মাথায় বসিয়ে নিলেন। (সকলের উচ্চ হাসি)

—আচ্ছা, গণেশকে সিদ্ধিদাতা বলে কেন?

মহারাজ : শিব তো সিদ্ধি খায়। সেটা দেবে কে? (সকলের হাসি)

—গণেশের বাহন ইঁদুর কেন?

মহারাজ : ওকে কম খেতে দিতে হয়, ছোট্ট তো, তাই। (সকলের হাসি)

এবার শিবের গল্প শোন। খুব মজার গল্প। শিব তো কোন কাজ করেন না, খালি গাঁজা খান আর বসে থাকেন। পার্বতী বললেন, 'তুমি কোন কাজ না করে বসে থাকলে কী করে হবে? খেতে তো হবে! কিছু কর।' শিব বললেন, 'তাই তো! কী করব?' পার্বতী বললেন, 'তোমার ঐ দুমড়ো ষাঁড়টা রয়েছে, ওটাকে কাজে লাগাও।' শিব তখন ওকে নিয়ে মাঠে গেলেন। কার্তিক খুব কর্মঠ, সে একটা কাঠের লাঙল তৈরি করে দিল। এবার শিব মাঠে গিয়ে ভাবছেন, লাঙল হল, ষাঁড়ও হল, কিন্তু বীজ কই, কী দিয়ে চাষ করব? ধান, গম কিছুরই তো বীজ নেই। শেষে একটু লাঙল চষে বাড়িতে এসে চুপ করে বসে আছেন। পার্বতী ভাবলেন, বোধ হয় ফসল ফলবে। ওমা! কিছুদিন বাদে গিয়ে দেখেন, সারা জমি ভর্তি করে শুধু ভাঙ গাছ হয়েছে। (সকলের উচ্চ হাসি)

প্রশ্ন : মহারাজ, ভক্ত ত্যাগীর লক্ষণ কী?

মহারাজ : (সকৌতুকে নিজেকে দেখিয়ে) এই দেখ না, আমরা সাধু হয়েছি, অথচ যখন খিদে পায় তখন চিন্তা করি—কোন ভক্ত খাবার আনল না, কী হবে?

—সে তো আপনারা শরীরধারণের জন্য করেন মহারাজ। ওটা আপনাদের কথা। আমি আমাদের কথা জিজ্ঞাসা করেছি।

মহারাজ : তুমি তোমাদের কথা বলছ, আমি আমাদের কথা বলছি। (ভক্তদের উচ্চ হাসি) আমি একবার বেরিয়ে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে চলছি। গ্রামের নাম মনে নেই। সারাদিন খাওয়া হয়নি। খুব খিদে, পেট চোঁ-চোঁ করছে। চারপাশে কোন লোকও নেই, খাবারও নেই, ভাবছি কী করব। হঠাৎ দেখি ট্যাঁকে চার আনা পয়সা রয়েছে। মনে হল, তাই তো! এই পয়সাটা কাছে রেখেছি বলেই হয়তো খাবার জুটল না। তখন দিলাম পয়সাটা ছুঁড়ে পুকুরের জলে ফেলে। শেষে গাছ থেকে তেঁতুলপাতা ছিঁড়ে চিবিয়ে খেয়ে রইলাম!

প্রশ্ন : জপ করতে গেলে এখানে পিঁপড়ে, ওখানে মশা কামড়ায়; কিন্তু ধ্যান করলে ওসব কিছুই হয় না।

মহারাজ : ধ্যান করলে ওসব হয় না? বাঃ! তাহলে খবরের কাগজে বের করে দাও না যে, ধ্যান হচ্ছে anti-mosquito। (ভক্তদের উচ্চ হাসি)

সে. ম : মহারাজ, সেই শ্লোকটা বলুন না মহারাজ। সেই যে মালা-জপ প্রসঙ্গে—

মহারাজ : (শিশুসুলভ ভঙ্গি করে) না, ওসব বাজে কথা, বলব না।

(সমবেত ভক্তমণ্ডলী কৌতূহলবশত বারংবার মহারাজকে কথাটি বলবার জন্য অনুরোধ করতে থাকে। তখন—)

মহারাজ : ওটাতে একটা কাজে কথা আছে। তাই বলছিলাম না। 'শালা' কথা আছে। বলছি, হিন্দীতে কথাটা হল—

মালা জপে শালা, কর জপে ভাই।
মন মন জপে যো, উস্‌কো বলিহারি যাই॥

—আমরা যে রাস্তাঘাটে স্মরণ করি, মনে মনে জপ করি?

মহারাজ : না না। রাস্তাঘাটে আর ওসব করতে যেও না। গাড়ি-ঘোড়ার রাস্তা! (সকলের হাসি)

(পূজ্যপাদ মহারাজ সবসময় প্রকাশ্যেই বলতেন যে, তিনি মেয়েদের বেশি ভালবাসেন, কারণ মেয়েদের জন্য কেউ ভাবে না। তাদের কাছে সংসার সবসময় কর্তব্যকর্ম প্রত্যাশা করে, কিন্তু তাদের ভালবাসে না। মাঝে মাঝেই তাই তিনি তাঁর মেয়েদের নানাভাবে রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে আনন্দ দিতেন। তিনি তাদের নিয়ে নানা মজা করতেন—)

মহারাজ : খেয়ে যায় নিয়ে যায়, আর যায় চেয়ে
যায় যায় ঐ যায়, বাঙালির মেয়ে। (সকলের উচ্চ হাসি)

শুনলে তো, যায় যায় ঐ যায়, বাঙালির মেয়ে!

—হ্যাঁ, খেয়ে যায় নিয়ে যায়।

মহারাজ : আরে, শুধু তাই নয়, আবার চেয়েও যায়। শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে। যাবার সময় বাবাকে বলে গেল, 'বাবা, ওটা পাঠিয়ে দিও।' (সমবেত ভক্তদের উচ্চ হাসি)

ভক্ত : বাবা, যখন ভূমিকম্প হয়েছে, তার ঠিক আগের দিন আমি পুনেতে ছিলাম।

মহারাজ : সে কী! তুমি এখনো আছ? আরেকটা দিন থেকে ভূমিকম্পটা দেখে ফিরলে না কেন? (সকলের উচ্চ হাসি) শোন, একজনের দুটো

বউ। লক্ষ্মী, সরস্বতী। সরস্বতী খুব মুখরা, লক্ষ্মী সে চঞ্চলা। এক ছেলে, সে সব জায়গায় যুদ্ধ করে বেড়ায়। যার বউ সে কিছু বলতে পারে না। শান্তি নেই। শোবে যে সে-উপায় নেই। নাগের ওপর শয্যা, তাও জলের ওপর ভাসছে। এদিকে বাহন হল গরুড়—তাকে দেখলে আবার সাপ পালাবে। তখন তো জলে পড়ে যাবে। তাই ভয়ে কাঠ হয়ে আছেন। দেখ না জগন্নাথ কাঠ হয়ে আছেন!

সে. ম : মহারাজ, এবার হাত দেখিয়ে দিন।

মহারাজ : দাঁড়াও। দেখছ না ঠাকুর এখন কাঠ হয়ে আছেন। (সকলের হাসি)

॥ ১৫৫ ॥

(পূজনীয় মহারাজ ভক্তদের কাছে তাঁর জীবনের একটি ঘটনা প্রায়শই বলতেন। তিনি যখন ছাত্রজীবনে পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ মহারাজজীর কাছে অধ্যাত্ম-তত্ত্বপিপাসু হয়ে যেতেন, তখন দেখতেন, মহারাজজীর কাছে অনেক সংসারী মানুষ আসেন ও নানা সাংসারিক বিষয়ের কথা বলেন। মহারাজজী কিন্তু এতটুকুও বিরক্ত না হয়ে পরম মমতায় তাঁদের সব সমস্যা শোনেন ও নানা সমাধান সূত্র দেন। অন্যদিকে এইসব বালক ছাত্রের দল ভাবত—এখন কোথায় ভগবৎ প্রসঙ্গ হবে, তা নয়, কেবল বাজে কথা। এই ঘটনার উল্লেখ করে পূজনীয় মহারাজ বলতেন, ‘আজ বুঝি ওরা কেন বলত, আর তিনি কেন শুনতেন। ওরা এখানে এসে বলবে না তো যাবে কোথায়?’ তবে সেইসঙ্গে রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে এটাও শিখিয়ে দিতেন যে সাধুসঙ্গে, গুরুসঙ্গে ‘লাউকুমড়ো’র আলোচনা করতে নেই, পরম লক্ষ্যের পথনির্দেশ নিতে হয়—)

ভক্ত : বাবা! ছেলের ইস্কুলে ভর্তির ব্যাপারে একটু বলবেন।

সে. ম : এব্যাপারে মহারাজ কিছু জানেন না।

মহারাজ : ভেবেছে হয়তো মহারাজের একটা ইস্কুল আছে। তা, আমার কোন ইস্কুল নেই।

অপর ভক্ত : এইটাই তো একটা ইস্কুল বাবা।

মহারাজ : কিন্তু এখানে লেখাপড়া কিছু হয় না, শুধুই হাসি হয়।

ভক্ত : লেখাপড়া হয় খুবই ভাল, কিন্তু আমরাই নিতে পারি না।

প্রশ্ন : মহারাজ, 'টাকা মাটি মাটি টাকা'—এর মানে কী?

মহারাজ : একটা জায়গায় কতগুলো টাকা নিয়ে রাখ না, দেখ না মাটি হয়ে যায় কিনা!

সে. ম : মহারাজ, এবার বানটা খুব ছোট এসেছিল।

মহারাজ : (ভ্রু কুঁচকে) দুর, বান কোথায়! বান বানচাল হয়ে গেছে। তোমাদের গঙ্গায় বান এল, আর এদিকে ঘুমের বান ডেকেছে।

প্রশ্ন : মহারাজ, পাতাল রেলে চড়েছেন?

মহারাজ : না, যদি আমায় পাতালে গেঁড়ে দেয়! তাই যাইনি। জাপানে চড়েছি।

—বাবা, পাতাল রেলে করে গিয়ে কালীঘাটে মাকে দর্শন করবেন।

মহারাজ : কেন, মা কি এখন পাতালপ্রবেশ করেছেন? (সকলের হাসি)

ভক্ত : মহারাজ, সংসার যে কঠিন বুঝতে পারছি।

মহারাজ : সংসার কঠিন জেনেও তোমরা আছ বলে তবু খেতে পাচ্ছি। (বাইরের দিকে তাকিয়ে) কেবল কাকের ডাক শুনতে পাচ্ছি।

—ওরা বৃষ্টির জন্য ডাকছে মহারাজ।

মহারাজ : তুমি ওদের একটা করে ছাতা কিনে দাও না। (হাসি) একটা গল্প বলি শোন। একবার এক রাজা বসে আছেন। সামনে প্রজারা বসে

আছে। সেইসময় খুব শেয়াল ডাকছে। তখন রাজা বলছেন, 'ওরা অত ডাকছে কেন?' প্রজারা বলছে, 'মহারাজ, ওদের শীত করছে।' মহারাজ বললেন, 'সবাইকে একটা করে কম্বল কিনে দাও।' তখন সবাই কম্বল কিনে দিল। এবার পরের দিন আবার শেয়ালগুলো ডাকছে। রাজা বললেন, 'আজ আবার ওরা ডাকছে কেন?' প্রজারা বলল, 'মহারাজ, ওরা আপনাকে সম্মান জানাচ্ছে।' (সকলের উচ্চ হাসি) ও-কম্বল কি আর শেয়ালরা পেল? যা হোক, ঐ বলে কম্বল তো কেনা হয়ে গেল! (সকলের হাসি)

ভক্ত : কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণ যখন বিশ্বরূপ দেখালেন তখন কেবল অর্জুন ছাড়া আর কেউ দেখতে পেল না কেন?

মহারাজ : অর্জুনের দিব্যচক্ষু লাভ হয়েছিল তাই, অন্য সকলের তা ছিল না।

—সঞ্জয় তো ঘরে বসে দেখেছিলেন, কী করে?

সে. ম : দূরদর্শনের মাধ্যমে।

মহারাজ : ব্যাসদেব ধৃতরাষ্ট্রকে প্রথমে দিব্যচক্ষু দিতে চাইলেন। ধৃতরাষ্ট্র নিলেন না। তখন সঞ্জয়কে দিব্যচক্ষু দান করে বললেন, 'তুমি দেখে ধৃতরাষ্ট্রকে বলবে।'

সে. ম : দূরদর্শন তখন থেকেই শুরু হয়েছে মহারাজ, কারণ সঞ্জয় বাড়িতে বসেই কুরুক্ষেত্র দেখতে পেলেন।

মহারাজ : ওকে একটা ছোট T.V. কিনে দেওয়া উচিত ছিল।

—এই অন্ধকারে যুদ্ধ হতো কী করে!

সে. ম. : সন্ধে হলে যুদ্ধ থেমে যেত। তখন ওদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চলত।

মহারাজ : তখন বোধহয় সকলে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারত। এরকম একটা নিয়ম ছিল।

—এখন সব নিয়ম উলটে যাচ্ছে।

মহারাজ : হ্যাঁ, এখন সবাই রাতে আক্রমণ করে। তবে তখনো ব্যতিক্রম হয়েছিল। অশ্বত্থামা রাত্রে ঢুকে দ্রৌপদীর ছেলেদের গলা কেটে দিয়েছিল।

—(সকলে সমস্বরে) কর্ণও তো নিয়মের ব্যতিক্রম করে অভিমন্যুকে মারল মহারাজ।

মহারাজ : তা বটে, আবার ভীষ্মদেব নিজেই নিজের মৃত্যু ঠিক করলেন। কর্ণের একটা বর্ম ছিল। সেটা থাকলে কেউ তাকে মারতে পারবে না।

সে. ম : হাত দেখিয়ে দিন।

মহারাজ : কিন্তু বর্ম তো রক্ষা হল না!

সে. ম : কার বর্ম?

মহারাজ : কর্ণের।

সে. ম : মহারাজ, সে তো কবচ-কুণ্ডল। বর্ম আবার কোথায়? ঐ কবচ-কুণ্ডলটা থাকলে কেউ ওকে মারতে পারত না।

মহারাজ : তবে তাই। কবচ-কুণ্ডল। তা, ওগুলো নিল কে?

সে.ম : ইন্দ্র ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে নিল না? ইন্দ্র এসব ব্যাপারে খুব সিদ্ধহস্ত।

মহারাজ : (গুজরাটি ভাষায় বললেন) ‘আঁধার থৈ বে যাইছে ঘর ভে কা থৈ যাও।’ এর মানে হল—অন্ধকার হয়ে গেছে, যেতে অসুবিধা হবে, তাই ঘরে ফিরে যাও।

॥ ১৫৬ ॥

ভক্ত : (সেবক মহারাজকে) আমরা বসব মহারাজ?

সে. ম : এক লাইনে বসুন।

(এই অনুমতি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উৎফুল্ল ভক্তবৃন্দ হুড়মুড় করে ঘরে গিয়ে বসল। তাদের অভিব্যক্তি দেখে পূজনীয় মহারাজ আনন্দে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন। সকলে বসবার পর তিনি একটা ছড়া শোনালেন—)

মহারাজ : তেল মাখবে থাবা থাবা।
চিৎ হয়ে শোবে বাবা॥
ডোবা দেখে পাতবে পাত
তবে খাবে যাত্রার ভাত॥

এর মানে হল—গ্রামদেশে যাত্রার দল এলে তেল মাখতে দেয়। একটা বড় জায়গা করে সকলকে মাখার তেলটা একসঙ্গে দেয়। সেখান থেকে একটু একটু করে সকলে নিতে নিতে তো ফুরিয়ে যাবে, তাই থাবা থাবা তেল নিতে হবে। খাবার সময় মাটিতে পাতা পেতে সেখানে ভাতের ওপর ডাল ঢেলে দেবে। সে-ডাল তো গড়িয়ে যাবে, তাই গর্ত দেখে পাতা পাতবে, যাতে অনেকটা ডাল ধরে। আরেকটা বড় জায়গায় সবাইকে একসঙ্গে শুতে দেয়। তাই প্রথমেই চিৎ হয়ে শোবে, কারণ জায়গাটা বেশি রইল; দরকার হলে আড় করে শোবে, কিন্তু যদি প্রথমেই আড় করে শোও তবে পরে চিৎ হবার দরকার হলে আর জায়গা পাবে না। (ভক্তদের উচ্চ হাসি) তোমাদের এখন কেন বলছি, যখন প্রথমে বসবে বড় জায়গা নিয়ে ছড়িয়ে বসবে, তারপর যত ভিড় বাড়বে তত আস্তে আস্তে ছোট হয়ে (নিজে গুটিয়ে ছোট হয়ে বসার ভঙ্গি করে

দেখালেন) যাবে। যদি প্রথমেই ছোট হয়ে বস, তবে পরে আর ভাল করে বসতে পারবে না। (সকলের উচ্চ হাসি)

ভক্ত : মহারাজ, যারা রোজ মহাপুরুষের দর্শন পায় না, তাদের কী হবে?

মহারাজ : কিছুই হবে না, স-ব হবে।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন, সাধুসঙ্গ কর। আমরা তো রোজ পারি না। সাধুরা সবসময় ভগবানকে নিয়ে রয়েছেন, আমরা কী করি?

মহারাজ : তুমি কি দেখতে গিয়েছ কী নিয়ে রয়েছে? ওপরটা দেখেই বিচার কর কেন? এই এখানে যারা বসে আছে (ভক্তদের দেখিয়ে) সবাই কি ঠাকুরের ভাবে রয়েছে?

প্রশ্ন : গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন, 'মন যদি বশে আনতে না পার তবে অভ্যাস দ্বারা তা কর।' আমাদের মন যে ছড়ানো, কী করে পারব?

মহারাজ : অভ্যাস দ্বারাই করবে, ছড়ানো তো থাকবেই।

—করি তো, হয় না।

মহারাজ : অভ্যাস কি একদিনে হয়? করলাম আর হয়ে গেল? দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, এমনকি জন্মের পর জন্ম লেগে যেতে পারে। একদিনে অভ্যাস হয় না। যেগুলো হয়েছে সেগুলো কি এক জন্মের কথা? কত জন্ম গিয়েছে, তবে হয়েছে। গীতায় আছে—'বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।' (৭।১৯) বহুজন্ম সাধনার পর মানুষ তাঁকে জানতে পারে—এক আধ জন্মে নয়।

—আপনি বলেছিলেন, ত্যাগ ছাড়া কিছু হবেনি বাপু; আবার বলেছিলেন, ঠাকুর বলেছেন—প্রারব্ধ আর সংস্কার না থাকলে ত্যাগ হয় না। এই প্রারব্ধ আর সংস্কার কী?

মহারাজ : 'প্রারব্ধ' মানে পূর্বের যেসব কাজ ফল দিচ্ছে। আর 'সংস্কার' হল, আগের যেরকম কাজ সঞ্চয় আছে সেইরকম মনে ছাপ পড়ে যায়। সেই কাজ ভালও হতে পারে, মন্দও হতে পারে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছিলেন, মৃত্যুকে চিন্তা করা ভাল। এই মৃত্যুকে কেমন করে চিন্তা করব?

মহারাজ : সবসময় মনে করতে হবে কেউ চিরদিন থাকবে না, আমিও থাকব না। যাদের দেখছি সবাই একদিন চলে যাবে।

—এটা চিন্তা করলে কী হয়?

মহারাজ : এটা চিন্তা করলে মৃত্যুভয় আর থাকে না।

—আমার মৃত্যুভয় নেই।

মহারাজ : তবে তো তুমি একজন ব্রহ্মজ্ঞ হয়ে গেলে।

—আমার যখন খুব রাগ হয় তখন বলি, আমি মরে যাব, আর থাকব না।

মহারাজ : ওটা তো 'তোরা জ্বালাচ্ছিস, তাই আর থাকব না।' এটাকে মৃত্যুভয় যাওয়া বলে না। একজন রাগ করে ছেলেকে বলেছিল, 'আমি ডুবে মরতে যাচ্ছি।' কিছুক্ষণ পরে সে ফিরে এল। সকলে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল, ফিরে এলে, মরলে না?' তখন সে বলল, 'মরতে গেলাম, কিন্তু একটা হাঁড়িপানা মুখ দেখে চলে এলাম।' (ভক্তদের হাসি)

—ঐ মুখটা কার?

মহারাজ : ওটা মৃত্যুরূপ দেখে ভয়।

প্রশ্ন : আদর্শ গৃহী হতে গেলে কী কী গুণ দরকার?

মহারাজ : ঈশ্বরে মন রাখতে হবে, যেটা তোমার কর্তব্য বলে মনে হবে—সেটা করতে হবে। তোমার জন্য যেন কেউ কষ্ট না পায় সেটা

দেখতে হবে। সবাইকে দিতে চেষ্টা করবে, কিন্তু প্রতিদান প্রত্যাশা করবে না।

প্রশ্ন : ঠাকুর যে 'কপালমোচন' সেটা বুঝতে পারি না কেন?

মহারাজ : কী করে বুঝবে? ঠাকুরকে কি তুমি তোমার সন্তানের মতো ভালবাস যে বুঝবে? ঠাকুরকে সব জানাও তাহলে ধীরে ধীরে বুঝবে।

—ঠাকুর তো আমার কথা শুনতে পান না, মন্দিরে চুপ করে বসে থাকেন। তাই আপনাকে সব বলি।

মহারাজ : ঠাকুর সব শুনতে পান।

—ঠাকুর বলেছেন, 'সমুদ্রের যত কাছে যাবে তত গায়ে ঠান্ডা বাতাস লাগবে আর হিল্লোল কল্লোল শোনা যাবে'—এর মানে কী?

মহারাজ : ভগবানের সান্নিধ্যে যত যাবে তত মন শান্ত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন : ভাব কী করে সম্বরণ করতে হয়?

মহারাজ : ভাব চেষ্টা করে সম্বরণ করতে হয়, না হলে ক্ষতি হয়।

যতনে হৃদয়ে রেখো, আদরিণী শ্যামা মাকে।
মন তুই দ্যাখ্ আর আমি দেখি, আর যেন কেউ নাহি দেখে॥

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন যে, হাটের কাছে গেলে হৈহৈ চিৎকার শোনা যায়, কিন্তু হাটে পৌঁছানোর পর আর সেটা শোনা যায় না। কেন?

মহারাজ : যখন প্রত্যক্ষ করা যায় তখন মন শান্ত হয়ে যায়। সেইজন্য গোলমালের শব্দ শোনা যায় না। তেমনি যখন ভগবানকে দর্শন করা যায় তখন মন শান্ত হয়ে যায়। আর কোন গোলমাল থাকে না।

প্রশ্ন : মানুষ সরল হয় কী করে?

মহারাজ : ভগবানের কৃপা হলে হয় আর শুভ সংস্কার থাকলে হয়।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন, বিছে কামড়ালে অথবা ভ্যাকরা পোকা কামড়ালে ঘুঁটের সেঁক দিলে সারে। সেটা কী?

মহারাজ : ভ্যাকরা একরকমের মাকড়সা। কামড়ালে খুব যন্ত্রণা হয় এবং ফুলে ওঠে। তখন ঘুঁটের সেঁক দিলে যন্ত্রণা কমে যায়। তার মানে হচ্ছে, সংসারী লোক কামিনী-কাঞ্চন-বিষে জর্জরিত, এবং ভগবানকে স্মরণ করে না। সেইজন্য সর্বদা যন্ত্রণা পায়। ভগবানের নাম হচ্ছে ঘুঁটের সেঁক। সেই নাম করলে সংসারী লোকের জ্বালা যন্ত্রণা কমে।

প্রশ্ন : আমার এক নিকট আত্মীয় পঞ্চাশ বছর আগে দীক্ষা নিয়েছেন, কিন্তু কোন জপতপ করেন না। তাঁর ধারণা, তাঁর দেহ শুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এটা কি ঠিক?

মহারাজ : না, জপ-ধ্যান ছাড়া শুধু দীক্ষা নিলে শরীর শুদ্ধ হয় না।

—কেন? দীক্ষা নেবার পরেও শরীর শুদ্ধ নয়?

মহারাজ : তুমি যদি স্নান না করে বল পরিষ্কার হয়ে গেছি, তাহলে কি তুমি পরিষ্কার হলে? তেমনি যতই দীক্ষা নাও, ভগবানকে স্মরণ-মনন না করলে শরীর শুদ্ধ হয় না। অন্তরে সবসময় প্রদীপ জ্বেলে রেখে দিতে হয় এবং সংসারের কাজের মাঝে দেখতে হয় যে, প্রদীপ জ্বলছে কিনা। অর্থাৎ সবসময় হৃদয়ে স্মরণ-মনন করে যেতে হয় যাতে আমরা কোন সময়ে ভগবানকে না ভুলি।

প্রশ্ন : লজ্জা, ঘৃণা, ভয়—তিন থাকতে নয়। এর মানে কী?

মহারাজ : আমি ভগবানের আরাধনা করব, লোকে দেখলে কী বলবে—এই হচ্ছে লজ্জা। অন্যে আমার থেকে বিদ্যায়, ধনে অনেক ছোট, তাই তাদের প্রতি ঘৃণা। যদি আমার সব কিছু কেউ কেড়ে নেয়—এই হচ্ছে ভয়।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন, একই আকাশে একই সঙ্গে সূর্য অস্ত যাচ্ছে আর চাঁদ উঠছে—এর মানে কী?

মহারাজ : কারো কারো মধ্যে জ্ঞানসূর্য আর ভক্তিরূপ চাঁদ দেখা যায়। একই লোকের মধ্যে জ্ঞান এবং ভক্তি দুই-ই থাকতে পারে।

॥ ১৫৭ ॥

(সকলে প্রণাম করে বসেছে, ভক্তদের প্রশ্নের পূর্বেই পূজনীয় মহারাজ নিজেই বললেন—)

মহারাজ : শোন, সংসারে থাকলে নানারকম লোকের সঙ্গে থাকতে হয়, চলতে হয়। এখন আমাদের দেখতে হবে, কিভাবে আমরা চলব। নানারকম পরিস্থিতি আসে, পাঁচজন থাকলেই পাঁচরকম কথা হয়, সেগুলো সহ্য করতে হবে। কতগুলি উপায় দেখা যায়—অন্যায় দেখলে যদি প্রতিকার করতে যাও তবে ঝগড়া হবে, তাতে অশান্তি বাড়বে। যদি পালিয়ে যাও, সহনশীলতার দৈন্য হবে। সহ্য করতে না পারাটা অপূর্ণতা।

মায়ের জীবনে দেখতে পাই, মাকে অনেক সহ্য করতে হয়েছে। ঠাকুরও কম সহ্য করেননি। একবার ঠাকুর সমাধি অবস্থায় আছেন। একটি লোক, যে ভাবত ঠাকুর তুকতাক করে মথুরবাবুকে বশ করেছেন; সে এসে ঠাকুরকে বলছে, 'বল্, সেজবাবুকে কী দিয়ে বশ করেছিস?' ঠাকুর তখন ভাবাবস্থায় কথা বলতে পারছেন না, কিন্তু শুনতে পাচ্ছেন। লোকটি তখন ঠাকুরকে পদাঘাত করে চলে গেল। তার মৃত্যুর অনেক পরে মথুরবাবুকে ঠাকুর বলেছিলেন যে, লোকটি এইরকম করেছে। মথুর ছিলেন ঠাকুরের একনিষ্ঠ ভক্ত। শুনে তিনি বলছেন, 'বাবা! আগে বললে না! আমি জানলে কি আর তার মাথা থাকত?' সহ্য এইরকম।

ধর্মজীবন যাপন করতে গেলে সহ্য চাই। ধর্মের প্রকৃত অর্থ বুঝতে না পেরে অনেকেই ভুল করে। এদিকে বলছে ধর্মজীবন যাপন করছি, আবার বলছে সহ্য করতে পারি না। একটুও সহনশীলতা নেই। এটা ধর্ম নয়, ধর্মের গ্লানি।

ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে, হৃদয় কী এক দোষ করেছে। তাতে ত্রৈলোক্য বলছেন, 'ছোট ভট্‌চাযকে চলে যেতে বল।' ঠাকুর তখন জুতো পায়ে দিয়ে ছাতা নিয়ে গটগট করে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ত্রৈলোক্য দেখে বলছেন, 'এ কী! ঠাকুর আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' ঠাকুর বললেন, 'তুমি যে বললে চলে যেতে।' ত্রৈলোক্য বললেন, 'না, না, আপনি থাকুন আপনাকে চলে যেতে বলিনি।' ঠাকুর বলছেন, 'ওঃ! আমায় যেতে বলনি?' আবার ফিরে এলেন। কোনকিছুই তাঁকে চঞ্চল করতে পারে না। সব সহ্য করতে পারতেন। গীতায় আছে, 'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী' (১২।১৯)—যার প্রশংসায় আর নিন্দায় সমান অবস্থা। স্বামীজীর স্বভাব ছিল—যাকে যত ভালবাসতেন তাকে তত বেশি গালাগালি করতেন। শরৎ মহারাজকে খুব গালিগালাজ করতেন, তিনি চুপ করে সহ্য করতেন। স্বামীজী বলতেন, ওর বেলে মাছের রক্ত, সহজে তাতে না। এইগুলো হল অবিচল সহনশীলতার দৃষ্টান্ত।

অনেককে দেখে মনে হয় খুব ভাল, কিন্তু ভীষণ উগ্র। একটু কিছু হলেই রেগে যায়, সহ্য করতে পারে না। আবার বলে, 'আমি অন্যায় সহ্য করতে পারি না, ফটফট করে বলে দিই।' এটা খুব গৌরবের কথা নয়। সহ্য করতে না পারাটা সহনশীলতার অপূর্ণতা। ধর্ম মানে স্থিরতা, সহ্যগুণ; এগুলি মনে রাখতে হবে। যত গভীর তত অচঞ্চল।

ঠাকুর আবার আধার বুঝে উপদেশ দিতেন। সব উপদেশ সবাই নিতে পারে না। সাধুদের বলতেন, মনে বাইরে সব ত্যাগ। আবার গৃহীদের শুধু মনে ত্যাগ। গৃহীরা বাইরে ত্যাগ করতে পারে না। অন্যত্র বলছেন, 'ত্যাগ ছাড়া কিছু হবেনি বাপু।'

এক জায়গায় ব্যাবহারিক জীবনে সাপের কথা বলছেন—সাপের মত ফোঁস করবে, অনিষ্ট করবে না। সাপকে নিজের জীবন বাঁচানোর জন্য ফোঁস করতে বলেছেন। আমি বলি, বাঁচতে হবে এমন তো কোন মানে নেই। নাই বা বাঁচলাম। আদর্শের জন্য যদি একটা আধটা দেহ যায়—যাক না। সংসার থেকে চলে গিয়ে যাবে কোথায়? সব জায়গায় সংসার। সাধুদের সংসার—সেখানেও অনেক রকম অবস্থা, সাধুদেরও সহ্য করতে হয়। ঠাকুর বলেছেন—তিনটে শ, স, ষ। সহ্য কর, সহ্য কর, সহ্য কর। মায়েদের জীবনে এগুলো বেশি আসে, তাই মায়েদের লক্ষ করে বলছি।

—কিন্তু আমাদের জীবনে এভাবে চলা তো সহজ নয়। অন্যায় দেখলে কী করব?

মহারাজ : অন্যায় দেখলে যদি দেখ প্রতিকার করা যায় তবে করবে, কিন্তু মিষ্টি করে বলবে, যাতে তার মনে কোন আঘাত না লাগে। কিন্তু ধর Prime Minister একটা অন্যায় করল, তখন তুমি বলে কোন লাভ হবে? শুধু শুধু প্রাণপণ চেঁচানো হবে।

—মিষ্টি করে বললে যে অন্যায় করেছে সে তো বুঝবে না, রেগে যাবে; তাতে তার মনে তো ব্যথা লাগবে। তখন কী করব? এড়িয়ে যাব?

মহারাজ : না, এড়িয়ে যাওয়াটা গা বাঁচানো। এড়িয়ে যাবে না।

—তবে কি তার সঙ্গ ছেড়ে সরে যাব?

মহারাজ : হ্যাঁ, তার সঙ্গ ছেড়ে সরে যাবে, তাহলে আর কোন দোষ থাকবে না।

—রাখাল মহারাজের একবার এমন হয়েছিল যে, ঠাকুরের সঙ্গ ভাল লাগত না। তাতে আপনি বলেছিলেন, তখন তাঁর মন অন্তর্মুখ হয়েছিল। কিন্তু ঠাকুর সশরীরে বর্তমান থাকা সত্ত্বেও তাঁকে সামনে পেয়ে কেন এই অবস্থা?

মহারাজ : অন্তরে দেখলে আরো কাছে হল। যাঁকে তুমি তোমার অন্তরে দেখছ তখন শুধুই তাঁকে দেখছ, বাইরে কোন জিনিস দেখছ না। আর যখন তাঁকে বাইরে দেখছ তখন তাঁর সঙ্গে বাইরের জিনিসও চোখে পড়বে, তবে কোনটা বেশি কাছের বল?

প্রশ্ন : যখন এখানে আসি, ঠাকুরের ও আপনার বই পড়ি, তখন মনটা খুব ভাল থাকে। কিন্তু যখন বাইরে কোথাও যাই বা আমার কর্মক্ষেত্রে যাই, তখন সেখানকার পরিবেশে মন অন্যরকম হয়ে যায়। তখন খুব কষ্ট হয়। আমার ইচ্ছে করে সবসময় তাঁর চিন্তা করি।

মহারাজ : কী করবে মা! এটা অভ্যাস করতে হয়। দু-একদিনের ব্যাপার নয়। অভ্যাস করতে করতে হবে।

—আমি তো চাই সবসময় যাতে তাঁর চিন্তা থাকে, মন যেন একটুও সরে না যায়। কী করতে হবে? চাকরি ছেড়ে দেব?

মহারাজ : তোমার যে ঐরকম বাজে পরিবেশ ভাল লাগছে না, সময় সময় ভগবানকে চিন্তা করতে ইচ্ছা করছে, না করতে পারলে দুঃখ হচ্ছে—এটাই তো ভাল। এটা কি তাঁর কম দয়া? চেষ্টা কর, করতে করতেই হবে। গীতায় আছে—

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ।। (৮।৫)

যিনি মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করেন, তিনি আমাকেই প্রাপ্ত হন।

—যাতে চেষ্টা করতে পারি, আশীর্বাদ করুন, তাহলেই হবে।

মহারাজ : আশীর্বাদ তো আছেই, কিন্তু তোমাকে চেষ্টা করতে হবে।

—আপনি এইমাত্র একজনকে বললেন যে, সবসময় তাঁর চিন্তা করতে হবে। কিন্তু আমাদের জীবনে তো প্রাত্যহিক কাজকর্ম করতে হবে, সেগুলো করতে করতে কী করে তাঁকে চিন্তা করব?

মহারাজ : কাজ তো করতেই হবে। কাজ করতে করতে তার মধ্যেই তাঁকে চিন্তা করতে হবে।

—স্মরণ-মনন?

মহারাজ : হ্যাঁ।

—আপনি বললেন যে ভগবান বলছেন, মৃত্যুকালে আমাকে স্মরণ করলে আমাকেই প্রাপ্ত হয়। কিন্তু কেউ হয়তো সারাজীবন স্মরণ-মনন করল, অথচ মৃত্যুর সময় কঠিন রোগের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে স্মরণ করার ক্ষমতা হারাল, তখন তার কী হবে?

মহারাজ : তার নিশ্চয়ই হবে, ভগবান কি আর দেখবেন না যে, এ সারাজীবন আমাকে স্মরণ করেছে? তার একটা ফল তো আছে।

—যে স্মরণ করতে পারে না তার কি একটু কম হয়?

মহারাজ : একটু কেন, অনেকটাই কম হয়। একটা সাধারণ চলতি কথায় আছে, 'জপ-তপ কী কর, মরণের ভয় কর।' মানে জপ-তপ করছ কিন্তু দেখ যেন মৃত্যুকালে তাঁকে স্মরণ করতে পার। কথাটা সাধারণ, কিন্তু খুব দামি। সারাজীবন অভ্যাস থাকলেও যে ঠিক মৃত্যুসময়ে স্মরণ

করতে পারবেই—এমন কোনো কথা নেই। আবার যে সারাজীবন কিছু করল না, সে হয়তো মৃত্যুর সময় দৈবযোগে স্মরণ করল। যেমন অজামিলের উপাখ্যানে আছে, তার ছেলের নাম ছিল নারায়ণ। সে মৃত্যুকালে তার ছেলেকে 'নারায়ণ' বলে ডেকেছিল। তাই নারায়ণ বললেন, যখন ডেকেছে যেতে হবে। তা নারায়ণ কী এতই বোকা যে, ছেলেকে ডেকেছে আর তিনি সাড়া দেবেন!

—তাহলে সবসময় স্মরণ-মনন করতে হবে? শুধুই স্মরণ-মনন?

মহারাজ : হ্যাঁ, শুধুই স্মরণ-মনন।

অন্য ভক্ত : তার মানে সবসময় অনুভব করতে হবে?

মহারাজ : অনুভব নয়, স্মরণ-মনন।

অপর ভক্ত : মহারাজ। আপনি অজামিলের গল্পে যে বললেন, 'নারায়ণ কী এতই বোকা!' তার মানে কি অজামিলের আগে করা ছিল, যার ফলে নারায়ণ এলেন?

মহারাজ : না, এটা নামমাহাত্ম্য দেখাবার জন্য অর্থবাদ। মানে, অনিচ্ছায় বা ইচ্ছায় যেভাবেই হোক তাঁর নাম করলেই তিনি সাড়া দেবেন।

অন্যজন : মহারাজ। গল্প কি সত্য?

মহারাজ : সত্য মানে? তুমি সত্য কাকে বলবে? মহাভারতে আছে—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে এত হত্যা হয়েছিল যে, রক্তগঙ্গা বয়ে গিয়েছিল, আর তাতে হাতি ভেসে যাচ্ছিল। এ কী সম্ভব! রক্তগঙ্গা কি বয়? তাও আবার এমন রক্তগঙ্গা যে, তাতে হাতি ভেসে যাবে? এটা সেইরকম একটা অর্থবাদ। অর্থবাদ মানে হল গল্পটা আসল নয়, তাৎপর্যটাই আসল।

—মহারাজ, শ্রীকৃষ্ণ যে গোবর্ধন ধারণ করেছিলেন বা ছোটবেলায় পা দিয়ে শকট ভেঙেছিলেন—এগুলো কি অর্থবাদ বলে ধরে নেব?

মহারাজ : অবতারজীবনে অর্থবাদ দেখা যায় না। ভগবান তাঁর যা ইচ্ছে করতে পারেন। ঠাকুরের গল্পে আছে—একজন বলছে, 'ভাই, তুমি কোথা থেকে এলে?' সে বলছে, 'বৈকুণ্ঠ থেকে এলাম।' তখন জিজ্ঞাসা করছে, 'নারায়ণ এখন কী করছেন?' সে বলছে, 'দেখলাম তিনি একটা ছুঁচের ভিতর দিয়ে হাতি গলাচ্ছেন।' তখন একজন বলছে, 'না, না। সে কি সম্ভব?' অন্যজন বলছে, 'ভগবানের পক্ষে সবই সম্ভব।'

—বুদ্ধি আর যুক্তি দিয়ে বিচার করতে বলা হয়। কিন্তু সেটা কতদূর পর্যন্ত? আমাদের বুদ্ধি দিয়ে তো সবটা করা যায় না।

মহারাজ : বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা যায়। দেখতে হবে, মূল ঘটনার তাৎপর্যটা কী? তাৎপর্যটাই আসল। ঘটনাটা নয়। ঠাকুরের নাম করলে যে ভাল হয় এটা তো বুদ্ধি দিয়ে বিচার করা যায়। এই বুদ্ধিই শুদ্ধ বুদ্ধিতে পরিণত হয়। শুদ্ধ বুদ্ধি তো আর আকাশ থেকে পড়ে না। সৎ-বিষয় চিন্তা করতে করতে বুদ্ধি শুদ্ধ হয়। কোন মহাপুরুষের উপদেশ বা আদেশ মেনে চলতে হয়। কিন্তু তাঁরা যা করেন সেটা করতে নেই। ভাগবতে আছে—

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ।।

(১০।৩৩।৩১)

—কিন্তু অনেক সময় আমরা বিচার করতে পারি না। ধরুন, একটা মাকড়সার জাল, তার মধ্যে একটা মাছি পড়েছে। মাকড়সাটা মাছিটাকে খেতে যাচ্ছে, এখানে একবার বিচার আসে যে মাছিটাকে বাঁচানো উচিত, আবার বিচার হয়, মাকড়সাটা তো ক্ষুধার্ত হতে পারে। এখানে কী করা উচিত?

মহারাজ : ভাগবতে ঠিক এই ধরনের একটা গল্প আছে। দিলীপ খুব দয়ালু রাজা। তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্য ইন্দ্র নিজে বাঘ হলেন আর অন্য এক দেবতা গরু হলেন। বাঘ যখন গরুকে খেতে এল, তখন গরু দিলীপের শরণাপন্ন হল। দিলীপ তখন বাঘকে বললেন, 'তুমি একে খেও না।' বাঘ বলল, 'আমি খুব ক্ষুধার্ত।' দিলীপ বললেন, 'তুমি ক্ষুধা মেটাবার জন্য আমায় খাও।' ইন্দ্র তখন নিজের রূপ ধরে বললেন, 'তুমি এত বড় ধার্মিক রাজা, তুমি এরকম বিচার করলে! সামান্য একটা গরুর জন্য নিজের প্রাণটা দিয়ে দেবে?' এবার তুমি কী বিচার করবে বল?

—বিচার-মূঢ়তার কথা যদি বলেন, তো বুদ্ধদেবের জীবনে রয়েছে। হাঁসকে বাঁচানোর জন্য নিজের দেহের মাংস দিতে চাইলেন। এখানে তো তাঁকে দয়ালু বলা হয়েছে।

মহারাজ : একদিক থেকে দেখতে গেলে এটা বিচার-মূঢ়তা, আবার অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে অসাধারণ।

প্রশ্ন : মহারাজ, শান্তি কিছুতেই পাচ্ছি না, বাড়িতে খুব অশান্তি হচ্ছে, কী করব? একটু আশীর্বাদ করুন, যাতে শান্তি হয়।

মহারাজ : শান্তি তো বাজারে কিনতে পাওয়া যায় না, বাইরে খুঁজে পাওয়া যায় না। নিজের ভিতরে খোঁজ, তাহলেই পাবে।

প্রশ্ন : 'সোনার তরী' কবিতায় আছে যে, ধান (কর্মফল) নিয়ে গেল, কিন্তু কর্মফলের কর্তা পড়ে রইল—এর মানে বুঝিনি।

মহারাজ : এর মানে আমরা ভগবানকে কর্মের ফলগুলি দিয়ে দিই, কিন্তু নিজেকে দিতে পারি না।

প্রশ্ন : মা বলতেন, ঠাকুরকে রোজ দেখব এত ভাগ্য করে আসিনি। মা তো জগজ্জননী, তবে মায়ের এই আক্ষেপ কেন?

মহারাজ : মা দেখাচ্ছেন যে, এইরকম ব্যাকুলতা চাই। দেখে সবাই শিখুক।

প্রশ্ন : বুদ্ধপূর্ণিমার দিন কি বুদ্ধের জন্মদিন?

মহারাজ : জন্ম, মহানিষ্ক্রমণ (যেদিন উনি সংসার ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন) আর বোধিলাভ বা নির্বাণলাভ করেছিলেন ঐ দিনে। তাই ঐ দিনটিকে 'Thrice blessed day' বলা হয়।

প্রশ্ন : ভক্তির কি কিছু প্রকাশ আছে?

মহারাজ : আছে বৈকি। যেমন ধর, দুহাত জোড় করা, মাথা নুইয়ে প্রণাম করা, চোখ দিয়ে জল পড়া—এগুলি ভক্তির প্রকাশ।

—যদি বাইরে প্রকাশ না হয়ে আন্তরিক ভক্তি হয়?

মহারাজ : হ্যাঁ, তাতেও হবে।

প্রশ্ন : পুরুষকার বড় না সংস্কার বড়? আমাদের যেসমস্ত সংস্কার আছে, সেই থেকেই কি কাজ হয়?

মহারাজ : হ্যাঁ, সংস্কারও খানিকটা আছে, আবার পুরুষকারও আছে। নিজের পুরুষকারের দ্বারা সংস্কার অনেক কেটে যায়।

—সংস্কার তো আছেই। আমরা যখন ভাল কাজ করতে চাই বা মন্দ কাজ করতে চাই, তখন সংস্কার তৈরি হয়। ভাল কাজ করবার ইচ্ছে হলেও পারি না।

মহারাজ : তুমি ইচ্ছে করলে ভাল কাজ করতেও পার, আবার ইচ্ছে করলে খারাপ কাজ না করতেও পার। ইন্দ্রিয় তোমার বশে থাকবে, তুমি ইন্দ্রিয়ের বশে থাকবে না। যেমন ধর, একটা চোর চুরি করল; সবাই বলি—ওর সংস্কারে ও চুরি করেছে। কাজেই সংস্কার হল আমাদের কল্পনা। লোকের কাজ দেখে আমরা কল্পনা করে নিই যে, এটা তার

সংস্কার। কিন্তু পুরুষকার দ্বারা সব করা যায়। নিজে কিছু চেষ্টা না করে বলবে, 'আমার ভাগ্য'—এ বললে চলবে না। (মায়েদের দিকে ফিরে মহারাজ বললেন—) তোমাদের ভিতরেই অনেক শক্তি আছে, তোমরা ইচ্ছে করলেই সব করতে পার।

প্রশ্ন : আহারে আশ্রয়-দোষ কি করে এড়ানো যায়?

মহারাজ : ও বড় কঠিন ব্যাপার। তোমরা সব খাবে। আশ্রয়-দোষ বাঁচানো যায় না, কিন্তু চেষ্টা করবে শুদ্ধ খাবার খেতে। যেগুলো খেলে মনের শুদ্ধি হয়, পবিত্রতা বাড়ে, দেহ সুস্থ থাকে।

প্রশ্ন : আপনি বলেছিলেন, লালপদ্ম অনুরাগের প্রতীক। তাহলে সাদাপদ্ম কী signify করে?

মহারাজ : সাদাপদ্ম পবিত্রতার লক্ষণ।

প্রশ্ন : আগম-নিগম মানে কী?

মহারাজ : আগম হচ্ছে পার্বতী প্রশ্ন করছেন শিব উত্তর দিচ্ছেন; আর নিগম হল শিব প্রশ্ন করছেন, পার্বতী উত্তর দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : সাধুসঙ্গ কি সকলের দরকার? সন্ন্যাসীরও সাধুসঙ্গ দরকার?

মহারাজ : সন্ন্যাসীরও সাধুসঙ্গ দরকার। 'সাধু' মানে সে সন্ন্যাসীও হতে পারে, গৃহস্থও হতে পারে। সব দিক থেকে যে ভগবানের চিন্তা করে, সে-ই সাধু। সন্ন্যাসী হয়ে গেলেই যে তাঁর সব কিছু হয়ে গেল তা তো নয়। তাই তাঁরও সাধুসঙ্গ দরকার।

—আমাদের চলার পথে তো অনেক কষ্ট আছে।

মহারাজ : ভগবানকে ধরে থাকলে সব বাধা কাটিয়ে উঠবে। সব বাধা তিনি দূর করে দেবেন। চলার পথ মানে খাচ্ছি-দাচ্ছি নয়, তাঁর পথে চলা। তাঁর পথে চললেও বিঘ্ন আসে। তাঁকে ধরে থাকলে যে দুর্ভোগ

ভুগতে হবে না, তা নয়। তবে সেগুলি মনকে বিচলিত বা চঞ্চল করবে না। দেহ-ঘরে ঢুকলেই তার দণ্ড সকলেই ভোগ করে। জ্ঞানী তাকে জ্ঞানপূর্বক ভোগ করে। তাঁকে ধরে থাকলে সব কেটে যাবে। এর নাম অচলা ভক্তি।

—ভগবান ছাড়া আর কার ক্ষেত্রে ভক্তি প্রযোজ্য?

মহারাজ : বাবা, মা, গুরুজনদের প্রতি ভক্তি। তবে আমার বাবা, আমার মা—এই ভক্তি হলে ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি হল না। যত বিভিন্ন জায়গায় আমার ভক্তি আছে সকলেই আমার ভগবানের বিভিন্ন রূপ—এই ভাব থাকলে তাহলে সেই ভক্তি অনন্য।

প্রশ্ন : সহ্য করা মানে কী?

মহারাজ : সহ্য করা মানে সর্ব অবস্থায় অনুদ্বিগ্ন থাকা।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন, অবতারকে দেখাও যা ঈশ্বরকে দেখাও তা। আপনাকে দেখলে আনন্দ হয়।

মহারাজ : এ আনন্দের পরে দুঃখ আছে। এখন আমাকে দেখলে আনন্দ হয়, পরে মরে গেলে দুঃখ হবে। ভগবান মরেও যাবেন না, দুঃখও হবে না। ভগবান অমর। আমি কি অমর? ঠাকুর বলেছেন ঠিকই—অবতারকে দেখাও যা ভগবানকে দেখাও তা, কিন্তু ঠাকুরকে কি সবাই অবতার বলে দেখেছে? যারা দেখেছে, তাদের পক্ষে ভগবদ্‌দর্শন।

প্রশ্ন : ঈশ্বরের ইচ্ছা ছাড়া গাছের পাতাও নড়ে না; কর্মফল, প্রারব্ধের তাহলে তো কোন মূল্য নেই!

মহারাজ : সেই দৃষ্টিতে দেখলে কোন মূল্য নেই। যে-দৃষ্টিতে দেখে ভগবান কর্মফলদাতা, সেই দৃষ্টিতে মূল্য আছে। যার যেমন কর্ম, সেই রকম ফল দিচ্ছেন।

প্রশ্ন : একজন মা তার সন্তানের জন্য যে-আকর্ষণ বোধ করে, ভগবানের জন্য তেমন সহজাত প্রবৃত্তি হয় না কেন?

মহারাজ : হচ্ছে না। হবে কী করে? ঠাকুর যা বলছেন, তা করছ? আর বলছ, ব্যাকুলতা হচ্ছে না! কী করে ব্যাকুলতা হবে? ঠাকুর যা যা বলেছেন, সেগুলো করে দেখ। করে কেউ দেবে না, নিজে নিজে করতে হবে। অনেক জন্মের সাধনার পর সিদ্ধিলাভ হয়। আর একজন্মেই হয়ে যাবে? যতদিন বাঁচবে, অনন্তকালের তুলনায় তা এক ফোঁটাও না। অনন্তকালরূপ মহাসমুদ্র। অত সোজা নয়, আঁতে ঘা লাগলে ভক্তি-টক্তি উবে যাবে।

বহুজন্ম চেষ্টা করতে করতে ক্রমে তাঁতে রুচি হয়, তাঁর কথা চিন্তা করতে করতে তাঁতে ভক্তি হয়। ভক্তির পরাকাষ্ঠায় তাঁর কাছে গিয়ে পৌঁছায়। তাঁকে লাভ করার যে-চেষ্টা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতে যে-চেষ্টা তার নাম সংগ্রাম। চেষ্টা করবে, বাকিটা ঠাকুর করে দেবেন। চেষ্টা করলে তিনিই সহায় হবেন। ঠাকুরের কথা আছে, তুমি যদি তাঁর দিকে এক পা এগোও, তিনি দশ পা এগিয়ে আসবেন। ঠাকুরের কথা কি মিথ্যা হবে?

—পঞ্চাশ-ষাট বছর এই সংসার করছি, আবার ঠাকুরের নামও করছি।

মহারাজ : পঞ্চাশ-ষাট বছর তো কাটিয়েছ, সংসার প্রতিপালন করেছ। ঠাকুরের নাম যা করেছ তা অতি সামান্য। কেউ বাঁধেনি। ‘নিজ হস্তে রজ্জু করে আকর্ষণ।’ একজন লোক একটা ভাল্লুককে থাম ভেবে জাপটে ধরে চিৎকার করছে যে, ভাল্লুকটা ছাড়ছে না। তখন ভাল্লুকটা বলল, ‘আরে ভাই, ম্যায় তো তুম্‌কো ছোড় দিয়া, তুম্ তো মুঝে নেই ছোড়া।’

প্রশ্ন : চিন্তা করতে করতে দর্শন হলে কি বোধে বোধ হয়?

মহারাজ : যখন শুদ্ধ মনে ধারণা হয়, তখন বোধে বোধ হয়। চিন্তা করতে করতে মন শুদ্ধ হয়। মন এবং ইন্দ্রিয়ের একযোগে কাজ হয়, তখন মন কাজ করে, অনেক সাধনার পর সেই মন শুদ্ধ হয়। সেই মন যখন আত্মা তখন তাতে আত্মতত্ত্ব ছাড়া আর কিছু চিন্তা হয় না, তখন তা শুদ্ধ মন। এই শুদ্ধ মনে যে ভগবানের চিন্তা হয়, তাকে বলে বোধে বোধ হওয়া।

প্রশ্ন : মনের জোর কী করে বাড়ে?

মহারাজ : Exercise করলে যেমন গায়ের জোর বাড়ে, তেমনি exercise করলে মনের জোর বাড়ে। অশুভ চিন্তা আসছে, তাকে আসতে দেব না। শুভ চিন্তা দিয়ে তাকে ঢেকে দেব। হরি মহারাজ বলতেন, যতক্ষণ না ঘুমিয়ে পড়বে ততক্ষণ বেদান্তচিন্তা দিয়ে মনকে ভরিয়ে তুলবে—যাতে অশুভ চিন্তা মাথা চাড়া দিয়ে না ওঠে।

ঠাকুর বলেছেন, মনটা হচ্ছে ধোপা ঘরের কাপড়, তাকে যে-রঙে চোবাবে সেই রং হবে। সেইজন্য যাতে ভাল রং মনটায় ঢোকে তার চেষ্টা করতে হবে। খারাপ বই পড়লে সেইসব চিন্তা মনে আসে, খারাপ সিনেমা দেখলে মনে সেইসব কথা আসে। তাই ঠাকুর সাধুসঙ্গ, সৎসঙ্গের ওপর জোর দিয়েছেন। সাধু মানে সন্ন্যাসী নয়, যারা ভগবানের কথা চিন্তা করে। সৎসঙ্গ যত করবে, তত মনটা সদ্‌ভাবে ভাবিত হবে।

অনেকে বলেন, এখানে যখন আসি মনটা ভাল লাগে, কেন? কারণ, এখানে কোন খারাপ আলোচনা হয় না। এইজন্য বাড়িতেও প্রতিজ্ঞা করবে—সবসময় ভাল প্রসঙ্গ আলোচনা করব। ওরকম একটা বাতাবরণ সৃষ্টি করবে। যাতে যা দরকার তা দিলে তবে তা বেড়ে উঠবে।

—বাড়িগুলোকে কি আশ্রমের মতো করা যায় না?

মহারাজ : করা তো দরকার, নিশ্চয়ই দরকার। বাড়িকে তো আশ্রমই বলি, গৃহস্থ-আশ্রম—যাকে আশ্রয় করে মানুষ ভগবানের দিকে যায়। আগে নিয়ম ছিল—প্রত্যেক বাড়ির একজন গৃহদেবতা থাকবে। পূজা-অর্চনা হতো, সবাই প্রসাদ পেত। একটি অগ্নি বাড়িতে জ্বলত—অগ্নি-পতি। দেবতাকে কেন্দ্র করে সব, তিনিই সব। এটা বাড়িতে করতে হবে। ‘আমার আমার’ করলেই আমার আমার হবে, ‘তাঁর তাঁর’ করলেই তাঁর হবে।

প্রশ্ন : কৃপা কি সাধনসাপেক্ষ নয়?

মহারাজ : না, তিনি কৃপা করবেন কী করবেন না তাঁর ওপর। তুমি সাধন করবে কী করবে না তোমার ওপর। বাইবেলে আছে, দিনমজুরে এত পাবে—কেউ সকালে, কেউ দুপুরে, কেউ সন্ধ্যায় কাজ করতে এসেছে। মজুরি সবাই একরকমই পেল। আগে যারা এসেছে তারা ক্ষুব্ধ। মালিক বললেন, ‘বাপু, তোমাদের তো কম দিইনি।’ আবার গল্প আছে একজন জঙ্গালের ভিতর বিপন্ন হয়ে গাছে উঠেছে। দেখল, শবসাধক শবের ওপর বসে জপধ্যান করছে, বাঘে এসে তাকে নিয়ে গেল। সে ভাবল, এই তো সুযোগ, আমি বসে যাই। মায়ের দর্শন হল। লোকটি বলল, ‘মা, এ তোমার কেমন বিচার? তার হল না, আর আমি কিছুই করলাম না, তোমার দয়া হল!’ মা বললেন, ‘বাপু, তোমার পূর্বে অনেক কাজ করা আছে।’ পূর্ব পূর্ব জন্ম তো মনে থাকে না, তাই মনে হল—হঠাৎ। মালি এদিক-ওদিক খুঁড়তে খুঁড়তে জলের ফোয়ারা পেল। এই হল আমাদের দৃষ্টিতে কৃপার ব্যাখ্যা, তাঁর দৃষ্টিতে কৃপার ব্যাখ্যা নেই।

প্রশ্ন : Tension মুক্ত কী করে হওয়া যায়?

মহারাজ : হওয়া যায়। Tension-এর কারণগুলোকে তুচ্ছ বলে ভাবতে হবে। যেখানে যা দাম তাই দিতে হয়। তুচ্ছ বিষয়ে দাম দিচ্ছ, তাই tension হচ্ছে। তোমরা সবসময় বল—চেষ্টা তো করছি; ও চেষ্টা কিছু নয়। গরম লোহাতে জলের ছিটে দিলে যেরকম—ওতে লোহা ঠান্ডা হয় না। যেমন মেয়েরা স্বামী-পুত্রের জন্য ছটফট করে, ভগবানের জন্য যাতে সে-রকম হয়, চেষ্টা করলেও—যতটা চেষ্টা নিজের অন্নের সংস্থান, পরিবার প্রতিপালনের জন্য কর, ততটা কি চেষ্টা করছ? তাঁকে ধরে সব করতে হবে। সংসারী মানুষ মানে কী, সংসারে আছ কিন্তু সংসার তোমাকে যেন গ্রাস না করে। ঠাকুর বলছেন, জলেতে নৌকা আছে তাতে দোষ নেই, নৌকাতে জল থাকলে দোষ। তুমি সংসারে থাক তাতে দোষ নেই, সংসার তোমাতে থাকলে দোষ।

প্রশ্ন : মহারাজ, পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল?

মহারাজ : এ আবার কী! কথাটি হল, 'শোনার চেয়ে দেখা ভাল।' 'পড়ার চেয়ে শোনা ভাল'—এটি তুমি add করছ। যেকোন বিষয়ে শোনা কথা আর দেখায় তফাত আছে না? এমনি কানে শোনা আর অন্তর দিয়ে গ্রহণ করা—অনেক তফাত। একজন ভদ্রলোক ছিলেন শিলং-এ। তিনি পাঁচ জায়গায় পাঠ শুনতেন। বলছেন, পাঁচ জায়গায় পাঠ শুনি। বললুম, তাই নাকি? তাহলে তো ফোঁপরা। কথা অনেক শুনলে কাজ হয় না, একটা শুনে তাতে ডুবে যেতে হয়, তাঁতে কাজ হয়। তা না হলে এক কান দিয়ে শুনছ, আরেক কান দিয়ে বার হয়ে যাচ্ছে। সে-শোনার সার্থকতা নেই। বাইবেলে আছে—কতগুলো বীজ আগাছার ওপর পড়ল, কতগুলো পাথরের ওপর, কতগুলো খেতের ওপর পড়ে ফসল হল। ক্ষেত্র তৈরি না হলে হয় না। যাওয়া-আসা করতে করতে ভাব জন্মে, যা অঙ্কুরিত

আছে—তা বেড়ে ওঠে।

প্রশ্ন : ভক্তি চাওয়া কি স্বার্থপরতা?

মহারাজ : স্বার্থ মানে আমরা যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব, তাতে যে-আকর্ষণ—তাই স্বার্থ। স্বার্থ মানে আমরা ব্যক্তিত্বের অনুকূল জিনিস চাইছি, সেইগুলো চাইলে ঐ বিশাল ভূমাকে চাইব না। যতক্ষণ স্বার্থ, ততক্ষণ বিশাল আমাদের কাছে দূরে। চাওয়া মানে শুধু দাও দাও নয়, আমাকে তোমার করে নাও—এটাও তো চাওয়া হল। এই আকাঙ্ক্ষা বন্ধন করে না, মুক্তি দেয়। তিনি কী করবেন না করবেন, তিনি জানেন; চাওয়াটা তোমার।

প্রশ্ন : আমাদের জীবনের আদর্শ কিরকম হওয়া উচিত?

মহারাজ : দেখ, একটা আদর্শ বা উপদেশ তো সকলের পক্ষে মেনে চলা সম্ভব নয়। সকলের মানসিকতা, ধারণা, গ্রহণ করবার ক্ষমতা এক রকম হয় না। তাই একটি আদর্শ বা উপদেশ সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। তাই বলছি, 'আদর্শ' বলতে যার যেমন ধারণা সে সেইভাবে নিজের জীবন গঠন করার চেষ্টা করবে। তবে ঠাকুর, মা এবং স্বামীজীর জীবনের আদর্শকে যে যতটুকু পারবে জীবনে কাজে লাগাবার চেষ্টা করবে—তাহলেই হল।

প্রশ্ন : ঠাকুরের কৃপাবাতাস বইছে, তাহলে মানুষের এত কষ্ট কেন?

মহারাজ : ঠাকুর বলেছেন, কৃপাবাতাস বইছে, কিন্তু নিজেকে পাল তুলে রাখতে হবে। যে-নৌকা পাল তুলে দেবে, সেই নৌকা কৃপাবাতাস লাগিয়ে এগিয়ে যাবে। মানুষের জীবন একটা নৌকা, যে-নৌকা অর্থাৎ যে-জীবন কৃপাবাতাসকে কাজে লাগাবে—সেই জীবন তরতর করে ভগবানের দিকে এগিয়ে যাবে, যে কাজে লাগাবে না সে এগোতে পারবে না। তাঁর কৃপাবাতাস সমানভাবেই বইছে। কৃপাকে কাজে লাগানো অর্থাৎ

সর্বদা স্মরণ-মনন, তিনি যাতে সন্তুষ্ট হন এমন ব্যবহার করা, ধর্মজীবন যাপন করা, সত্যকে ধরে থাকা, অনাসক্ত হওয়া, নিঃস্বার্থভাবে সৎসঙ্গ করা—এইসব।

প্রশ্ন : গুরুকে সেবা করলে কি ইষ্টদেবতাকে পাওয়া যায়?

মহারাজ : হ্যাঁ, মন শুদ্ধ হলে পাওয়া যায়। গুরু হচ্ছেন ইষ্টদেবতার প্রতীক, তাঁর পিছনে ইষ্টদেবতা রয়েছেন। তাঁকে সেবা, পূজা বা তাঁর ধ্যান করলে উপযুক্ত সময় হলে তাঁর মাধ্যমে ইষ্টদেবতাকে পাওয়া যায়। যেমন আমরা মাটির কালীমূর্তিকে সামনে রেখে পূজা করি। সেই মূর্তি আসলে মায়ের প্রতীক। মাটির মূর্তি চিন্তা করতে করতে আসল মূর্তিকে দেখা যায়। ঠিক তেমনি গুরুও হচ্ছেন ইষ্টদেবতার প্রতীক। অন্তর শুদ্ধ হলেই হল। তার জন্য দরকার সত্য কথা বলা, কারো মনে কষ্ট না দেওয়া, ইন্দ্রিয়কে সংযত রাখা, বিনা প্রয়োজনে অন্যের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ না করা, অভাববোধকে কমানো। ভক্তের পিছনে পিছনে ঠাকুর চলেন। ভক্তের ধূলিতে তিনি ধন্য হন। আরেকটা কথা, ঠাকুরকে যে-ব্যক্তি ধরে তাকে তিনি প্রথমে খুব কষ্ট দেন, তাতেও যদি সে তাঁকে না ছাড়ে তখন ঠাকুর ভক্তের দাসের দাস হন। একটা কথা আছে—'যে করে আমার আশ, করি তার সর্বনাশ। তবু যদি না ছাড়ে পাশ, হয়ে থাকি দাসের দাস।' শুধু দাসের দাস নয়, দাসের দাসের দাসের দাস।

প্রশ্ন : ঈশ্বর, ভগবান ও অবতারে পার্থক্য কী?

মহারাজ : ঈশ্বর—যাঁর কোন কর্ম নেই। ভগবান—যিনি সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়-রূপ কর্ম করছেন। অবতার—জীবের মুক্তির জন্য যাঁর আবির্ভাব।

॥ ১৫৮ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনার জন্ম কোন মাসে?

মহারাজ : মহাপুরুষ মহারাজকে একবার এই প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার জন্মই হয়নি, আবার জন্মদিন কী করে হবে?'

—আপনারও কি তাই মত?

মহারাজ : হ্যাঁ। এর মানে আমার কোনদিন জন্ম হয় না।

প্রশ্ন : রামকৃষ্ণ মিশনের emblem-এ যে সংস্কৃত কথাটি আছে, তার মানে কী?

মহারাজ : 'তন্নো হংসঃ প্রচোদয়াৎ'—মানে পরমহংস অর্থাৎ পরমাত্মা, তিনি আমাদের কল্যাণের পথে প্রেরণ করুন।

প্রশ্ন : সাধকরা দুরকম সাধনা করেন—প্রথমে নিজেকে খুঁজে পাওয়ার সাধনা, পরে নিজেকে হারিয়ে যাওয়ার সাধনা। এটার মানে কী?

মহারাজ : প্রথমে নিজের মধ্যে সেই বস্তুকে খুঁজে পাওয়ার সাধনা, তারপরে তাঁর চরণে নিজেকে বিলীন করে দেওয়ার সাধনা।

—এ-দুটো কি এক?

মহারাজ : না। প্রথমটি step, দ্বিতীয়টি পরিণাম।

প্রশ্ন : কায়িক, মানসিক আর বাচিক তপস্যা কী—একটু বুঝিয়ে দিন না।

মহারাজ : কায়িক তপস্যা—দেহকে কষ্ট দিয়ে যে-তপস্যা। মানসিক তপস্যা—মনে চিন্তা করে যে-তপস্যা। বাচিক তপস্যা—বাক্যকে সংযম রাখা, হাঁহাঁ করে বকা নয়।

প্রশ্ন : শরৎ মহারাজ একবার খাচ্ছিলেন, তখন একজন সেবক জিজ্ঞাসা করলেন, 'মহারাজ, ঝোলটা কেমন হয়েছে?' মহারাজ বললেন, 'দাঁড়াও খেয়ে দেখি।' একটু চেখে বললেন, 'ঝোলে নুন দিসনি কেন?' তখন

সেবক বললেন, 'মহারাজ, আপনি এতক্ষণ খাচ্ছিলেন, কিছু বলেননি; আর জিজ্ঞাসা করার পর বললেন।' তখন শরৎ মহারাজ বললেন, 'তখন রসনায় মন ছিল না।'—মহারাজের এই কথাটার মানে বুঝতে পারিনি।

মহারাজ : মন যখন কাজ করে না, তখন কিছু বোঝা যায় না। স্বাদ, গন্ধ, স্পর্শ এগুলো বোঝবার জন্য ইন্দ্রিয়ের দরকার। তুমি একটা জিনিস দেখছ, কিন্তু সেদিকে মন নেই, অথচ চোখটা সেইদিকে। মন সেটা রেকর্ড করছে না, কাজেই তুমি তাকিয়ে আছ ঠিকই, কিন্তু দেখছ না। তুমি যে-কাজ করবে সেই কাজে মন না থাকলে কিছু বুঝবে না। ঠাকুরের গল্প আছে, একজন পুকুরে ছিপ ফেলে বসে আছে, পাশ দিয়ে বাজনা বাজিয়ে বর চলে গেল, সকলে জিজ্ঞাসা করল—'বর দেখেছ?' সে বলল, 'না দেখিনি তো।' কারণ, তখন তার ঐ ছিপের ফাতনার দিকেই মন, আর অন্য কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

—তবে কি মন দিয়েই দেখে? মনই কি সব?

মহারাজ : অন্ধের কি চোখ আছে? তারা তো মন দিয়ে দেখে অনুভব করে। বৈজ্ঞানিক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু একদিন একটা চিন্তা করছিলেন। একজন ছেলে এসে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে, অথচ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। অনেকক্ষণ পরে যখন দেখলেন তখন ছেলেটিকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কখন এসেছ?' ছেলেটি বলল, 'একটু আগে।' উনি বললেন, 'আমায় বলনি কেন?' আসলে তিনি তখন উদ্ভিদজগতে চলে গিয়েছিলেন। কথায় আছে, 'কালি, কলম, মন লেখে তিনজন।' তোমার কালি, কলম—সব আছে, কিন্তু মন নেই, তাহলে লেখা হবে না। একটা জিনিস দেখতে হলে মন, ইন্দ্রিয়—চোখ, বিষয়—এইগুলি চাই। সবগুলি একসঙ্গে কাজ করলে তবে একটা জিনিস দেখা যায়।

প্রশ্ন : লয় কাকে বলে?

মহারাজ : লয় মানে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া। জপ করতে করতে মাঝে মাঝে খেই হারিয়ে ফেলি, আবার ঠিক করে নিই। এই ঝিমুনি বা বিলুপ্ত হয়ে যাওয়াকে মনের inactive অবস্থা বলে। আবার যখন জপ ঠিক করে শুরু করলাম তখন সেটা active অবস্থা। সবসময় active থাকতে হবে।

—এটা কি শুধু এই আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে, না সব ক্ষেত্রে?

মহারাজ : মন active না থাকলে কাজ হবে কোথা থেকে? মনের লয় একটা বাধা।

প্রশ্ন : কষায় মানে কী বোঝায়?

মহারাজ : কষায় মানে রসাস্বাদন। যেমন বলছি, ধর, তুমি ধ্যানে বসে কিছু অনুভব করলে—বাঁশি শুনলে বা নূপুরের শব্দ শুনলে, এতে তোমার আনন্দ হল। তখন তোমার বাধা সৃষ্টি হল, মনে হল—আমার অনেক হয়েছে। তাই এসবে বেশি আনন্দ করতে নেই।

—এটাই কি রসাস্বাদন?

মহারাজ : হ্যাঁ, এটাই রসাস্বাদন। এই রসাস্বাদনও একটা বাধা।

—তাহলে বাধা তিনটে—লয়, কষায় আর বিক্ষেপ। কিন্তু আনন্দ পেলেও তা বাধা কেন? তিনি তো আনন্দস্বরূপ।

মহারাজ : তিনি আনন্দস্বরূপ, কিন্তু আনন্দ পাবার জন্য তাঁকে ডাকলে সেটা বাধা। যদি তাঁকে ডাকতে ডাকতে আনন্দ পাও সেটা দোষের নয়।

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুর ভক্ত-বাড়ি থেকে ফেরার সময় একটু লুচি ছিঁড়ে খেয়ে বলছেন, 'একটু খেতে হয় তাই খেলাম, না হলে ওটা খাবার লোভ থেকে যেত।' ঠাকুর এরকম একটা রসিকতা করলেন সবাই হেসে উঠল। ঠাকুরের এই কথা ও সকলের হাসির মধ্যে কী শিক্ষা আছে?

মহারাজ : ঠাকুর এখানে সাধারণ লোককে একটা দৃষ্টান্ত দেখালেন, দৃষ্টান্তটি হল সাধু গেলে তাঁকে কিছু খেতে দিতে হয়।

—যদি কোন সাধু গৃহে আসেন, তারপর বলেন, 'না না, আমার দেরি হয়ে যাবে'—এই বলে চলে যান?

মহারাজ : তাতে দোষ নেই। তুমি তো offer করেছ। না খেলে অন্য কথা। আমরা যখন মাস্টারমশায় (শ্রীম)-র বাড়ি যেতাম ছাত্রজীবনে, তখন কথাটথা বলে এমনিই চলে আসতাম। কিন্তু সাধু হবার পর যখনই গেছি, কিছু খাইয়ে তবে ছাড়তেন।

প্রশ্ন : অবতার, বাবা—এইসব বললে ঠাকুরের গায়ে কাঁটা দিত, কিন্তু মথুরবাবু তো ঠাকুরকে বাবা বলতেন।

মহারাজ : যাদের সেই ভাব নেই, শুধুই ডাকার জন্য ডাকা—তাদের ডাকে গায়ে কাঁটা দিত। কিন্তু যারা সেই ভাব নিয়ে ডাকত, তাদের ডাকে কিছু হতো না।

প্রশ্ন : ঠাকুর স্বামীজীকে বলছেন, 'ও আমার শ্বশুর ঘর।' একথা কেন ও কী অর্থে বলেছেন?

মহারাজ : স্বামীজীকে ঠাকুর ভাবতেন শিবের অংশ, আর নিজেকে ভাবতেন মা কালী। তাই বলেছেন।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলছেন, আগে কলাগাছ বেঁধো, তারপরে সলতে, তারপরে পাখী—একথার অর্থ কী?

মহারাজ : লক্ষ্যটাকে ক্রমশ স্থূল থেকে সূক্ষ্ম করা। প্রথমে কলাগাছ—একটা স্থূলবস্তু। তারপর সেটা সূক্ষ্ম হতে হতে উড়ন্ত পাখিকে টিপ করা যায়, তেমনি প্রথমে একটা স্থূলকে চিন্তা করবে, তারপর স্থূল থেকে সেটা ক্রমশ ধীরে ধীরে সূক্ষ্মে গিয়ে পৌঁছবে। ইষ্ট কেমন, কটা হাত-পা বা কী

কাপড় পরে কেমন করে বসে আছেন—এরকম চিন্তা করছ। তারপর ধীরে ধীরে সেটা আর দেহ থাকবে না। একটা জ্যোতিমাত্র চিন্তা হবে, আবার সেটা থেকে ধীরে ধীরে একটা বিন্দুতে পরিণত হবে।

—এটা কি মনের উন্নত অবস্থা? ক্রমশ হতে হতে আপনিই উপলব্ধি হয়, না চেষ্টা করতে হয়?

মহারাজ : না, চেষ্টা করতে হয় না, নিজে থেকেই উপলব্ধি হয়। স্থূল চিন্তা করতে করতে যখন মন সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ হয়, তখন চিন্তাটাও সূক্ষ্ম হয়ে যায়। যারা science নিয়ে পড়েছ তারা জানবে যে, বৈজ্ঞানিকেরা অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে স্থূল থেকে সূক্ষ্ম জিনিস পরীক্ষা করে দেখে। এটা স্থূলজগতের কথা। আর সূক্ষ্মজগতে স্থূল থেকে ধীরে ধীরে সূক্ষ্ম চিন্তা হয়। মন যত সূক্ষ্ম হবে চিন্তাও তত সূক্ষ্ম হবে।

—মহারাজ, এই স্থূল থেকে সূক্ষ্ম চিন্তা ঠাকুরকে ধরে কিভাবে হবে?

মহারাজ : প্রথমে তো ঠাকুরের স্থূলশরীরটা ভাবছ, তারপর ধীরে ধীরে তাঁর ভাবটা চিন্তা করবে।

প্রশ্ন : স্বামীজী বলেছেন, 'যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সে ঠাকুরকে বিশ্বাস করতে পারে না।' এই নিজেকে বিশ্বাস করা কী বুঝতে পারিনি।

মহারাজ : যে নিজেকে বিশ্বাস করতে পারে না, সে অন্য কাউকে বিশ্বাস করতে পারবে কী করে? ভগবানকেও বিশ্বাস করতে পারে না। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারে না, অন্যের ওপর বিশ্বাস রাখবে কী করে? সবসময় নিজের সৎ, শুদ্ধ স্বরূপ চিন্তা করতে হবে। আমি দেহ—এ ভাবলে চলবে না। দেহের ভালমন্দ আছে, বিনাশ আছে তাই দেহ ভাবলে হবে না। আমি আত্মা—এই ভাবতে হবে। নিজেকে যদি সেই সৎ, শুদ্ধ স্বরূপ বলে চিন্তা করা যায় তবেই বিশ্বাস আসে।

প্রশ্ন : আমরা যে ভগবানের দিকে এগোচ্ছি কী করে বুঝব?

মহারাজ : দেখ, ভগবানের দিকে যত এগোবে তত তাঁর প্রতি ভালবাসা বাড়বে, বিষয়ে বিতৃষ্ণা হবে, মন শুদ্ধ হবে। এগুলো হলেই বুঝবে তাঁর দিকে এগোচ্ছ।

প্রশ্ন : মঠে যে দুর্গা, কালী, সরস্বতী—এইসব পূজা হয়, সে কি একই দেবীর বিভিন্ন ঐশ্বর্যের আরাধনা?

মহারাজ : হ্যাঁ, চণ্ডীতে আছে—শুম্ভ-নিশুম্ভ যখন যুদ্ধ করছে মায়ের সঙ্গো—শুম্ভ বলছে, এত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ করছ? মা বললেন, যাদের দেখছ ওরা আমারই অংশ। নাও আমি ওদের আমার শরীরে সংবরণ করে নিলাম, এবার যুদ্ধ কর। আমি একই দেবী, কিন্তু বিভিন্ন প্রকাশ—

> একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
> পশ্যৈতা দুষ্ট মষ্যেব বিশন্ত্যো মদ্‌বিভূতয়ঃ।। (১০।৫)

প্রশ্ন : শরণাগতি আর বকলমা কি একই অর্থ?

মহারাজ : হ্যাঁ, অনেকটা এক। বকলমাও এক অর্থে শরণাগতি। বকলমা হল full surrender করা। প্রতিটি নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর—এই ভাব। নিজের কোন ইচ্ছে থাকবে না। আর শরণাগতি হল partly surrender করা। কিন্তু শরণাগতি অভ্যাস করতে করতে যখন আর partly থাকে না, তখন সম্পূর্ণ সমর্পণ হয়।

প্রশ্ন : তুমি কে? আমি কে? তোমার সঙ্গো আমার সম্বন্ধ কী?

মহারাজ : তুমি কে?—তুমি অবতার। আমি কে?—আমি অবতারের পার্ষদ। তোমার সঙ্গো আমার সম্পর্ক কী? তোমার সঙ্গো আমার প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক অথবা পিতা-পুত্র সম্পর্ক।

প্রশ্ন : 'সর্বদেবদেবীস্বরূপায়'—এই কথাটা কেন বলা হয়?

মহারাজ : তাঁর নিজের তো কোন রূপ নেই। তাই সব দেবদেবীর রূপে তাঁকে চিন্তা করা। তাই 'সর্বদেবদেবীস্বরূপায়' বলা হয়।

প্রশ্ন : এই সব পার্ষদ যখন রামকৃষ্ণলোকে যান বা থাকেন, সেখানে কি তাঁদের মতো পৃথক থাকেন না তদাকারাকারিত হয়ে যান?

মহারাজ : সত্তা পৃথক থাকে কিনা বলা মুশকিল, তবে ভুলে যান। আবার যখন আসেন তখন কিছু মনে থাকে না।

—এটা কি তাঁদের লীলা? না ঠাকুরের লীলা?

মহারাজ : ঠাকুর লীলা করেন, কিন্তু নিজেও ভুলে যান।

প্রশ্ন : গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলছেন—দোষ গুণ সমানভাবে দেখতে হবে, কিন্তু তিনি নিজে তো অর্জুন ও পাণ্ডবদের বেশি ভালবাসতেন আর দুর্যোধন ও কৌরবদের দোষ দেখতেন। এটা কেন?

মহারাজ : সে তো শ্রীকৃষ্ণ-রূপ নিয়ে এসেছিলেন বলে। রূপ নিয়ে এলে তার নিজস্ব একটা ব্যক্তিত্ব তো থাকবে। ভগবান যখন একটা রূপ নিয়ে আসেন, তখন তাঁকে বলে অবতার। শ্রীকৃষ্ণের শত্রু-মিত্রে সমদর্শন ছিল। কেউ তাঁর শত্রু নয়, কেউ তাঁর মিত্র নয়। তবে অর্জুন তাঁর ভক্ত, তাই তিনি ভালবাসতেন। ভক্ত হলেই ভগবান তাকে ভালবাসেন, আর দুর্যোধনরা তাঁকে ভগবানরূপে দেখত না, শত্রুরূপে দেখত।

প্রশ্ন : ঠাকুর হাজরাকে বলছেন, ভারি হীনবুদ্ধি, এখানে এসেও জপ করছে। এর মানে কী?

মহারাজ : জপ করা মানে হল ভগবানকে ডাকা। সেই ভগবান স্বয়ং সামনে, তবুও জপ করে যাচ্ছে! তার মানে ভগবানকে মানুষ-বুদ্ধিতে দেখছে, ভগবান-বুদ্ধিতে নয়। তাই হীনবুদ্ধি বলছেন।

প্রশ্ন : আপনি বলেছিলেন—'আমি কি তোমাদের পাতানো বাবা?'

মহারাজ : আমি গুরু অর্থে তোমাদের বাবা। গুরু নিত্য। সে জন্মানোর আগেও ছিল, সে মৃত্যুর পরেও থাকবে। কাজেই আমি তোমাদের পাতানো বাবা নই।

প্রশ্ন : কায়মনোবাক্যে পবিত্র না হলে ঈশ্বরে ভক্তি হয় না। এটি কেন?

মহারাজ : এটি ঈশ্বরে ভক্তিলাভের শর্ত। কথা হচ্ছে, পূর্ণ ভক্তি লাভ করতে হলে কায়মনোবাক্যে পবিত্র হতে হবে। ব্রহ্মচর্য পবিত্রতার একটি পথ। সত্যবাদিতা পবিত্রতার আরেকটি পথ। অল্প পবিত্র হলে অল্প ভক্তিলাভ হবে।

—ভক্তির দ্বারা জ্ঞান হয় কি?

মহারাজ : ভক্তির দ্বারা তিনি তাঁর স্বরূপকে ভক্তদের কাছে প্রকাশ করেন। তাঁর স্বরূপকে জানা নিয়ে কথা, যেভাবে হোক।

প্রশ্ন : যারা বেশি কঠোরতা করে, তারা কি বেশি কৃপা পাবে?

মহারাজ : কৃপার কি কোন condition আছে? কোন condition নেই। তাঁর যাকে খুশি কৃপা করবেন। কঠোরতা উপায় মাত্র, উদ্দেশ্য নয়। ঠাকুর বেশি কঠোরতা পছন্দ করতেন না। শরীরকে লালন-পালন করলে শরীরের দিকে মন যায়, তাই তাকে মাঝে মাঝে control করতে হয়। তাহলে শরীর ভাল থাকে। মন কী করছে তাই দেখতে হবে।

প্রশ্ন : আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও অনেক কাজ করি, তখন আমাদের circumstance বাধ্য করছে কাজগুলি করতে। এটা কি ঠিক?

মহারাজ : করছে কে? তুমি দেহের সঙ্গে মিশিয়ে করছ। তাঁর ওপর নির্ভরতা এলে মনে হবে, আমি কিছুই করছি না। কর্মের ফল নিতে হবে। যেটা করছ তার ফল নিতে হবে এখন। নেওয়াই ভাল। তা না হলে মনের সঙ্গে কপটতা করা হয়। যখন বোধ হবে তিনি কর্তা, তখন আর

ফল নিতে হবে না। ভোগদেহ প্রবৃত্তির বশে যে-কাজ করে তার ফল উৎপন্ন হয়। পশুদেহে কর্মফল জমা থাকছে না—সঙ্গে সঙ্গে ভোগ হচ্ছে। মানুষের শরীরে কর্মফল জমা হচ্ছে। নিজেকে অকর্তা মনে করলে ফল হবেই না। বাড়ির গিন্নি সমস্ত কাজ হয়ে গেলে স্নান করতে যায়। কর্তব্য শেষ করে তবে তার নিষ্কৃতি। তেমনি তোমাদেরও সংসারে কর্তব্য-কর্ম ভাল লাগলেও করতে হবে, না লাগলেও করতে হবে। করতে তো তোমাকেই হবে। আমাদের জন্ম-মৃত্যু পরম্পরার মধ্য দিয়ে যেতে হচ্ছে। জন্মের কষ্ট ভুলে যাই, মৃত্যুর কষ্ট, তার যে ভয়ঙ্করতা মনেও আসে না। তাই কর্মকে কাটাবার জন্য আমাদের কোন ব্যস্ততা নেই।

প্রশ্ন : আমরা যখন সুন্দর পরিবেশ বা কোন সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখি তখন আমাদের মন আনন্দে ভরে যায়। মনটা অতি সহজে শান্ত হয়। তাহলে মনের ওপর পরিবেশের প্রভাব আছে?

মহারাজ : আনন্দের সঙ্গে ধ্যান মিলিয়ে দিতে হয়, তাতে আনন্দ আরো তীব্র হয়। বাইরে বিশাল প্রকৃতি দেখলেই শুধু হবে না, ভিতরে ধ্যান করতে হবে। ধ্যানের নিয়ম আছে। যে-স্থান মনের অনুকূল, চোখের পীড়াদায়ক নয়—সেইখানে ধ্যান করতে হয়। কথা হচ্ছে, বাইরের পরিবেশ মনকে সাহায্য করবে আত্মস্থ হবার জন্য। শান্ত পরিবেশ মানে অন্য বস্তু মনকে চঞ্চল করবে না। ধ্যান মানে মনকে একাগ্র করা। তার জন্য মনের সঙ্গে struggle করতে হয় শান্ত পরিবেশেও। এই struggle-এর ফলে মন তন্ময় হয়ে যায়—সেটাই ধ্যান। অর্থাৎ তন্ময় হওয়াটাই লক্ষ্য। তার আগে পর্যন্ত struggle। প্রাকৃতিক দৃশ্য তো স্থায়ী নয়। তুমি ধ্যানপ্রবণ হলে প্রকৃতির help তোমার লাগে না।

প্রশ্ন : অহংকার কিরূপে যায়?

মহারাজ : শরণাগত হওয়া মানেই অহংকার ত্যাগ করা। 'আমি' 'আমি' হল অহংকার। 'তিনি' 'তিনি' হল শরণাগতি। শরণাগত হতে হতে অহংকার যায়। ভগবানের কাছে চাও। তিনি সব অনুকূল করে দেবেন।

—অহংকার ও আত্মবিশ্বাসে তফাত কোথায়? কী করে বুঝব কোনটা আমার অহংকার আর কোনটাই বা আত্মবিশ্বাস? যাকে আমি আত্মবিশ্বাস ভাবছি, সেটা তো আমার অহংকারও হতে পারে?

মহারাজ : দুই ভাবকে স্থিরভাবে লক্ষ করলেই বুঝতে পারবে। একটা ক্ষুদ্র অহং-বুদ্ধি থেকে উৎপন্ন, অন্যটা তাঁর প্রকাশ। যখন দেখবে, কেউ তোমার সংস্পর্শে এসে তার নিজের ওপর আস্থা পাচ্ছে, নিজের ওপর তার বিশ্বাস, শ্রদ্ধা আরও বেড়ে যাচ্ছে, সে সবদিক থেকে নিজেকে উন্নত করতে পারছে তখন বুঝবে তোমার আত্মবিশ্বাস—যা তোমার অন্তরে যিনি আছেন তাঁরই শক্তিতে হচ্ছে। আর যখন দেখবে কেউ তোমার সংস্পর্শে এসে হীনমন্যতায় ভুগছে, সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে, তার ভিতরের শক্তি প্রকাশিত হতে পারছে না, তোমার ব্যক্তিত্ব তাকে গ্রাস করে ফেলছে তখন জানবে তোমার অহংকার। অপরের প্রতিক্রিয়া দেখে নিজের ভাব বুঝতে পারবে।

প্রশ্ন : ত্যাগেই পরম শান্তি—একথার অর্থ কী?

মহারাজ : ত্যাগ মানে কোন কিছুর প্রতি আসক্তি না থাকা। আসক্তিই বন্ধন। আসক্তি না থাকলে বন্ধন হয় না। মৃত্যু হলেও আবার জন্ম হবে—যতক্ষণ বাসনা থাকবে ততক্ষণ মুক্তি নেই। বাসনা ত্যাগ না করলে শান্তি আসবে না। বাসনা না থাকলে বেঁচে থেকেও মুক্তি। কর্তব্যবুদ্ধি মনে। কর্মের সঙ্গে যদি 'আমি' মেশানো না থাকে তাহলে কোন ক্ষতি

নেই। আমি 'বাবা', আমি 'মা', আমি 'পতি'—এই বুদ্ধি না করা। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—'আমার এই ত্রিজগতে কোন কর্তব্য নেই। আমার অপ্রাপ্য কোন বস্তুও নেই। তবু আমি কর্তব্য করছি।' সেই কর্তব্য বন্ধনের কারণ নয়, 'আমি' আছি বলেই কর্তব্য।

প্রশ্ন : আমাদের প্রার্থনা কি ঠাকুর শুনতে পান? তাঁর সেবা হবে কিরূপে?

মহারাজ : তিনি না শুনে যাবেন কোথায়? সব জায়গায় যে তাঁর কান। তাঁকে আপনার বলে মনে করলেই তাঁর সেবা হবে। আপনার—একান্ত আপনার। তাঁকে পাওয়ার জন্য মনের আগ্রহ—সেটা বড় জিনিস। তাই 'পাওয়ার চেয়ে চাওয়া বড়। হরির চেয়ে চেলা বড়।' চাওয়া মানে তাঁকে চাওয়া। চাওয়াতেও আনন্দ। চাওয়া মানে এমন চাওয়া যে, যাঁর কাছে চাইছি তাঁর সঙ্গো মনের অচ্ছেদ্য যোগ হয়ে যাবে। তাঁকে চাওয়া তো তাঁর সঙ্গো মনের যোগ হওয়া। তাঁকে না পেয়ে ছটফট করা—এটাতেই আনন্দ। সাধক এই আনন্দ ধরে রাখতে চায়। কষ্টটা একটা পরম সম্পদ। এমন চাইবে যে, দুনিয়ার আর কোনদিকে মন থাকবে না। এক লক্ষ্য হয়ে যাওয়া। এইরকম চাওয়াটাই একটা মস্ত বড় পাওয়া।

প্রশ্ন : কিভাবে দুঃখ দূর করা যাবে?

মহারাজ : দুঃখ দূর হলেই আনন্দ হয় না। সুখ-দুঃখ দুটোকেই প্রত্যাহার করতে হবে। মনে করতে হবে আমাতে সুখও নেই, দুঃখও নেই। দুঃখকে কেউ উপভোগ করে নাকি? দুঃখ সকলেরই দুঃখ। তা সর্বদাই অনভিপ্রেত। তবে সেগুলি তুচ্ছ করতে হবে। অন্য একটা উঁচু সুরে মন বাঁধলে সেগুলি তুচ্ছ হয়ে যায়। এক এক সময় আমাদের জীবনে পরীক্ষা আসে—যখন প্রবল দুঃখ বা প্রচণ্ড সুখ আসে তখন কি আমরা ভগবানকে ভুলে যাই না? গভীর দুঃখে বলি, ভগবান আমার কী

করলেন? যেন ভগবান কিছু করবেন—এই প্রত্যাশা নিয়েই আমরা ডাকছি। দুঃখকে তাঁর কৃপা বলে গ্রহণ করতে পারে—এমন সাহস আছে কজনের? দুঃখকে তাঁর আশীর্বাদ বলে বরণ করে নেওয়া খুব কঠিন। দুঃখ এলে মনের পরিণত ও অপরিণত অবস্থা বোঝা যায়। এইজন্য দুঃখ ও তার সঙ্গে সঙ্গে বিচারশীলতা দরকার। দুঃখে আমি ভগবানকে ভুলে যাচ্ছি না তো? তুমি ভগবানের কাছে কিছু চাও না—এই অভিমানও মনে কখনো রাখবে না। দুঃখ-কষ্ট কর্মের ওপর নির্ভর করে। ভগবান ইচ্ছা করলে রেহাই দিতে পারেন। কিন্তু আমাদের এই ভেবে ভগবানের ওপর অভিমান আসে যে, এত তোমার নাম করি, তবু আমার এত কষ্ট! খুব কঠিন বাপু, খুব কঠিন।

প্রশ্ন : মহারাজ, আমাদের (গৃহীদের) মনে মাঝে মাঝে যে না-পাওয়ার হতাশা জাগে—এটা কি সাধু-সন্ন্যাসীদের মনেও হয়?

মহারাজ : হ্যাঁ, সকলের মনেই হয়। তোমরা মানুষ, তারাও মানুষ। তোমরা সংসারের মধ্যে ডাকছ, আর ওরা সংসার থেকে বেরিয়ে এসে ডাকছে—এই যা তফাত।

প্রশ্ন : মহারাজ, মা বলেছেন, ঠাকুরকে যে ডাকে তার অন্নবস্ত্রের কষ্ট থাকে না। কিন্তু আমরা তো দেখি কত মানুষই ভগবানকে ডাকছে, অথচ অভাবী—

মহারাজ : মায়ের ঐ কথা সম্পূর্ণ শরণাগতের জন্য। গীতায়ও আছে—আমায় যে অনন্যচিত্তে ডাকে আমি তার যোগক্ষেম বহন করি।

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্।। (৯।২২)

অর্থাৎ 'যোগ' মানে যা নেই তা জোগাড় করে দিই, আর 'ক্ষেম' মানে যা আছে তা রক্ষা করি।

ভক্ত গীতা পড়ে ভাবছেন যে, ভগবান কষ্ট করে ভক্তের যোগক্ষেম বহন করবেন—এটা কিরকম? তাই তিনি গীতার 'বহাম্যহম্' কেটে 'দদাম্যহম্' করে দিলেন, অর্থাৎ 'যোগক্ষেম' দিই। এই করে তিনি স্নান করতে গেলেন। ঘরে স্ত্রী ভাবছেন, 'তাই তো স্নান করতে গেল কিন্তু এলে কী খেতে দেব? ঘরে তো খাবার কিছু নেই।' এমন সময় একটি ছেলে এসে পাতায় করে খাবার দিয়ে গেল। স্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ-খাবার তুমি কোথায় পেলে?' ছেলেটি বলল, 'তোমার স্বামী পাঠালেন।' ছেলেটির বুকের কাছে একটি খোঁচা, তা থেকে রক্ত পড়ছে দেখে স্ত্রী বললেন, 'তোমার বুকে কেন রক্ত পড়ছে—কে মেরেছে?' ছেলেটি বলছে, 'তোমার স্বামী মেরেছে।' ভক্ত স্নান সেরে আসার পর তাঁর স্ত্রী সব কথা বললেন, আর সেই রক্তের কথাও বললেন। তখন ভক্ত বুঝতে পারলেন যে, তিনি গীতায় আঁচড় কেটেছিলেন বলে ভগবানের হৃদয় কেটে রক্ত পড়ছে। গীতা হল ভগবানের হৃদয়। তিনি তখন গিয়ে গীতার ঐ অংশে তিনবার লিখলেন 'বহাম্যহম্', 'বহাম্যহম্', 'বহাম্যহম্'। অত সোজা না, কঠিন, খুব কঠিন।

॥ ১৫৯ ॥

প্রশ্ন : মহারাজ, আজ বছরের শেষদিন, কিছু বলুন।

মহারাজ : (একটু হেসে) আমিও তাই ভাবছিলাম। ঠাকুর একদিন নিরঞ্জন মহারাজকে বলছেন—ওরে বাবা নিরঞ্জন, একটা দিন কেটে গেল এখনো ভগবানলাভ করলিনি! আমাদের একটা দিন কেন, এবছরেও—৩৬৫ দিন কেটে গেল; ভগবানলাভ তো দূরের কথা, ভগবানের জন্য ব্যাকুলতাও আসে না। ভগবানের জন্য কিরূপ ব্যাকুলতা দরকার ঠাকুর তার দৃষ্টান্ত দেখালেন; বললেন, ভগবানের জন্য এইরকম

করে কাঁদতে পারিস? এই কথা বলে তিনি দক্ষিণেশ্বরে একদিন মাটিতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদলেন।

আমরা সজাগ নই। মনকে সজাগ করার কথা আমাদের মনেও পড়ে না। সংসারের আর পাঁচটা জিনিস নিয়ে আমরা দিব্যি আছি। ভগবানকে ছাড়াই আমাদের বেশ চলে যাচ্ছে। লোকদের দেখাই আমরা কত ধার্মিক, কিন্তু তাতে আন্তরিকতা কতটুকু তা আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে। ধার্মিকতা কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন বা চিহ্নধারণ নয়। জীবনকে শুদ্ধভাবে চালনা করা—তাও যথেষ্ট নয়। আমাকে এসে অনেকে বলে—মহারাজ আপনি করে দিন। এ কি ছেলের হাতের মোয়া? নিজেকে করতে হয়। যদি কেউ ভাবে, সংসারে সব কাজ সেরে ভগবানকে ডাকব তবে তার কোনদিনই ভগবানকে ডাকা হবে না। ঠাকুর বলেছেন—বাড়ির গিন্নি স্নান করতে গেলে তাকে শত ডাকাডাকি করলেও আর আসে না। সংসারের মধ্যেই কিছুটা সময় করে নিতে হয়। ভগবানের জন্য খানিকটা ছটফটানি না হলে ভগবানের দিকে এক পাও এগোনো যাবে না।

বাইরে থেকে যাদের দেখে মনে হয়, ছটফটানি হচ্ছে তারাও যদি খুব খতিয়ে দেখে তাহলে দেখা যাবে তারা কী চায়? খালি সংসারের অপ্রাপ্ত বস্তু পেতে চায়।

আমাকে কেউ কেউ এসে জিজ্ঞাসা করে, সমাধি কী করে পাওয়া যায়? 'কথামৃত' পড়ে সমাধি কথাটা শিখেছে। কিন্তু সমাধি লাভ করার জন্য যে কী দাম দেওয়া উচিত, তার জন্য যে কত সাধনা করতে হয় তা কি একবারও তারা ভেবে দেখে?

আমরা সকলেই ফাঁকি দিয়ে কিছু একটা পেতে চাই। ফাঁকি দিয়ে ধর্ম হয় না। ভগবানের জন্য সব জিনিস তুচ্ছ না করলে ভগবানের দিকে এক

পাও এগোনো যাবে না। দুঃখের সময় আমরা বলি—সংসার অনিত্য। আমাদের কাছে কেবল 'আমি ও আমার' নিত্য, আর সকল জিনিস অনিত্য। এইভাবে এক বছর কেন, বহু বছর কেটে গেল কিন্তু আমাদের চেতনা আসছে না। আন্তরিক দুঃখ হলে মন ছটফট করবে। এ-সংসারে এমন কে আছে যার দুঃখের অনুভূতি হয়নি? কিন্তু ভগবান-লাভের আকাঙ্ক্ষা বিরল—কারো কারো হয়।

স্বামীজী বলেছেন—ঘর সাজাবার জন্য অনেক আসবাবপত্রের দরকার হয়, কিন্তু তাদের মূল্য কিছু নয়। ধর্মটাও আমাদের সেরকম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংসারে সব সুবিধা আছে, তার মধ্যে খানিকটা ধর্ম করে নিলাম। এরকম করে ধর্ম হয় না। প্রকৃত ধর্মের জন্য যে কত চোখের জল, কত সাধনার দরকার—সেকথা তারা ভাবে না। আমাদের কাছে ধর্মটা হল, যেমন ছোট ছেলেরা খেলার সময় বলে 'ঈশ্বরের দিব্যি'—সেরকম। খুড়ি, জেঠিরা কোঁদলের সময় বলে 'ঈশ্বরের দিব্যি'—তারাও সেই শুনে শুনে বলে।

ঈশ্বরের জন্য আমাদের কোন আগ্রহ নেই। জীবনকে তাঁর দিকে চালনা করার জন্যও আমাদের কোন আগ্রহ নেই। এরকমভাবে কত বছর চলে গেছে! শুধু বছর নয়, কত জীবন চলে গেছে, তাঁর জন্য কি এতটুকু ব্যাকুলতা জন্মেছে?—এসব কথা মনে মনে ভাবতে হয়। লোকে বলে গুরুকৃপায় সব হবে! গুরু কৃপা করবেন কী করবেন না সে-কথা গুরু ভাববেন। আমাকে কী করতে হবে সেকথা আমাকে ভাবতে হবে।

আমি তাঁর কাছে তোমাদের জন্য প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমাদের চৈতন্য দেন। ঈশ্বরের কৃপা তো চাই-ই, সঙ্গে সঙ্গে নিজের চেষ্টাও

দরকার। আর তোমরাও তাঁর কাছে প্রার্থনা কর, যেন তিনি তোমাদের এমন আকর্ষণ করেন যাতে সব বিষয়ের আকর্ষণ তুচ্ছ হয়ে যায়।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন, সচ্চিদানন্দই গুরু। তাহলে আমাদের গুরু কে?

মহারাজ : মদ্‌গুরু জগদ্‌গুরু। যিনি আমার গুরু, তিনি জগতের গুরু। তোমার গুরু কে? ঈশ্বর আমার গুরু, আবার কে? এসব কথা ভাববে, মনে মনে চিন্তা করবে। গুরু একমাত্র তিনি। গীতায় শ্রীকৃষ্ণকে অর্জুন বলছেন, তুমি গুরু। ভগবান গুরু সেই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। মানুষ-গুরু সেই ভগবানের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রতিফলন। তাই তিনি অমর, তিনি সব দিতে পারেন। ঠাকুর বলেছেন—গুরুকে আগে পরীক্ষা করে নিবি, তারপরে বিশ্বাস করবি। বিশ্বাস করবার পর তা যেন আর না নড়ে। আগে দেখে নেবে, তারপর নিজেকে তাঁর কাছে ছেড়ে দেবে। তার ফলে তোমার বিশ্বাস অটল থাকবে।

আমরা প্রতিমাপুজো করি, পুজোর শেষে প্রতিমাকে বিসর্জন দিই। আমরা প্রতিমাতে ঈশ্বরত্ব আরোপ করি, পূজা করি, পরে বিসর্জন দিই; কারণ প্রতিমা ঈশ্বর নয়। আমার এই দেহটা যখন জন্মেছে, এর মৃত্যুও অবধারিত। আমি কি চিরকাল বেঁচে থাকব? তোমরা যদি দেহটাকে গুরু বলে মনে কর তাহলে 'গুরুবাদ' 'দেহবাদ'-এ পরিণত হয়ে যাবে। গুরু এক, সকলের গুরু সেই একজন। ঈশ্বরই গুরুর মধ্যে দিয়ে আসেন। গুরু কি আলাদা আলাদা হয়? যখন আমরা বলি—

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরং ব্রহ্ম তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ।। (গুরুগীতা)

তাহলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর কি অনেক? সুতরাং সকলের গুরু একজনই। তিনি গুরুর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত। গুরুর দেহ গেলেও তিনি সূক্ষ্মশরীরে

শিষ্যের অন্তরে থাকেন চিরকাল। তিনি নিত্যগুরু। তাঁর কখনো বিনাশ নাই। তোমরা যদি সেইভাবে এই দেহটাকে গুরু না ভেবে এর ভিতরে যিনি নিত্য, তাঁকে ভালবাস তাহলে কোনদিনও গুরুকে হারাতে হবে না। গুরু সেইভাবেই চিরকাল তোমাদের মধ্যে থাকবে। তা না হলে কিসের গুরু? সেই নিত্য-গুরু হিসাবে তিনিই গুরু, তিনিই ইষ্ট, তিনিই ঈশ্বর। তিনি এক, অদ্বিতীয়। আলাদা আলাদা কিছু নেই। এইভাবে যদি ভাবতে পার তো চিরকাল তোমার গুরুকে তুমি পাবে, তাঁকে কখনো হারাতে হবে না।

গুরু সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন মানে তোমাকে চালান, তোমার বুদ্ধিকে চালান। গুরু ব্রহ্ম, তাঁর শরণাগত না হলে তিনি লাগাম ধরেন না। তিনিও লাগাম ধরবেন আবার তুমিও ধরবে, তাহলে তো লাগাম ছিঁড়ে যাবে! এক্ষুণি বলছ—তুমি যা করবার কর, আবার পরক্ষণেই বলছ—তুমি এই কর, তুমি ঐ কর। ভগবানের নাম করতে করতে প্রথমে এত বেলপাতা, এত জপ—এসব দরকার হয়। তারপর সাধনা করতে করতে তাঁর নামে বিভোর হয়ে যায়। তখন ঠাকুর এই বলেছেন, সেই বলেছেন—এসব বলে না। ব্রহ্মজ্ঞান হলে হৈচৈ বন্ধ হয়, ভগবানের নামে বিভোর হয়ে থাকলে হৈচৈ হয় না।

প্রশ্ন : মহারাজ, তাঁর ওপরে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া কিভাবে আসে?

মহারাজ : শোন একটা ঘটনা বলি। আমি তখন দেরাদুনের রাজপুর গ্রামে আছি। একটা পাহাড়ের ওপর ভবানী-মন্দির। তার পিছনদিকে দুটি ঘর। সামনে ভক্তরা এলেও পিছনে নির্জন। ওখানে গেছি কিছুদিন নির্জনে তপস্যা করতে। একদিন সকালে উঠে দেখি খুব হৈচৈ—মিটিং হবে সামনের মাঠে। শুনলাম, কাদের যেন conference চলবে একমাস ধরে। ভাবলাম এখানে তো আর থাকা যাবে না। অন্য কোন জায়গা খুঁজতে

বেরলাম। সারাদিন হেঁটে হেঁটে কোথাও দেখি একটা গুহা জলে ভর্তি, কোথাও একটা গুহায় অন্য জন্তু থাকে। এই করে করে সারাদিনেও আর কোন জায়গা পেলাম না থাকবার মতো। সন্ধেবেলা দেহ-মন অবসন্ন, ঘরে ফিরছি; হঠাৎ আসতে আসতে মনে হল—আচ্ছা, এত তো ছুটোছুটি করলাম সব নিষ্ফল হল, তার মানে এসব তো তাঁর ইচ্ছা, আমার ইচ্ছায় কিছু হল না। তবে তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হোক, আমি struggle ছেড়ে দিই। খুব একটা নির্ভরতা এল মনে, তখনই দেহ-মন কেমন শান্ত হয়ে গেল। খুব relieved বোধ করলাম। তখনো মাইক বাজছে, কিন্তু কিছুই কানে যাচ্ছে না। নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে দেখি সব একদম চুপচাপ, কেউ কোথাও নেই। কী ব্যাপার? না, ওরা সব চলে গেছে। কী একটা অসুবিধার জন্য এখানে আর conference হবে না। আমরা সবটাতেই অধৈর্য হই। তাঁর ওপর নির্ভর করলে সব ঠিক হয়ে যায়।

—এই নির্ভরতা কী করে হয়?

মহারাজ : তাঁর দয়া হলে তবেই হয়। তবে চেষ্টা করতে হবে যাতে নির্ভরতা হয়।

॥ ১৬০ ॥

প্রশ্ন : ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।
যেমন ভাব তেমনি লাভ মূল সে প্রত্যয়।
কালীর ভক্ত জীবন্মুক্ত নিত্যানন্দময়॥
কালীপদ সুধাহ্রদে চিত্ত ডুবে রয়।
যাগ যজ্ঞ পূজা বলি কিছুই কিছু নয়॥

—এর তত্ত্বার্থ কী, মহারাজ?

মহারাজ : প্রত্যয় মানে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ঠাকুরের কৃপা হলে হয়। সেজন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে হয়। তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে সবই পাওয়া যায়। তবে কী চাইতে হবে তা আমরা জানি না। আমরা লাউ-কুমড়োই চাই। তাঁকে চাই না। 'যেমন ভাব তেমনি লাভ' মানে তো বোঝ, তাই শুধু কৃপাই চাইতে হয়। তবে কৃপা চাইলেই যে পাবে তা নয়। তিনি কখন কৃপা করবেন তিনি জানেন, তাই তাঁর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে ভরসা রাখতে হবে। জ্ঞান বিচার, যাগযজ্ঞ—এসব কঠিন পথ। পূজা, হোম, তপস্যাও তাঁর ওপর ভক্তি-বিশ্বাস আনার জন্য। আর যাগযজ্ঞ তো স্বর্গে যাবার জন্য, যাতে আরো ভোগ করতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ভক্ত তা চায় না। কালীপদ সুধাহ্রদে ডুবে থাকতে চায়। একমাত্র ভক্তি-বিশ্বাসেই তাঁকে সহজে পাওয়া যায়। তাই ঠাকুরের শ্রীচরণে আন্তরিক ভালবাসা আর শরণাগতি ছাড়া উপায় নেই।

প্রশ্ন : পুরুষকার আর শরণাগতি কি এক?

মহারাজ : দুটোর মানে এক নয়। পুরুষকার হচ্ছে চেষ্টা করা। রোখ, রোখ চাই। আর শরণাগতি হচ্ছে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করতে হবে, বলতে হবে—আমার কিছু ইচ্ছা নেই। তোমার ইচ্ছাই আমার ইচ্ছা। 'তোমার ইচ্ছা কর হে পূর্ণ আমার জীবনমাঝে।'

প্রশ্ন : মহারাজ, ঠাকুরকে কিভাবে ভালবাসব?

মহারাজ : মা যেমন সন্তানকে ভালবাসে সেইরকম করে। যেমন—ছোট্ট মেয়েরা পুতুল খেলে, খেলতে খেলতে ভালবেসে ফেলে। সেই পুতুল ভেঙে গেলে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়।

প্রশ্ন : আমাদের যখন দুঃখ-কষ্ট হয় তখন শ্মশানবৈরাগ্য আসে। তাকে কিভাবে জাগিয়ে রাখা যায়?

মহারাজ : বিচার করে মনকে বোঝানো যে, জগতের যাকিছু অনিত্য তাকে ত্যাগ করতে হবে। আর ভগবানের প্রতি ভালবাসা এলে সব তুচ্ছ হয়ে যায়। তাই যাতে ভালবাসা আসে তার চেষ্টা করা।

প্রশ্ন : ঈশ্বরের দর্শন পেতে গেলে কি তাঁর মতো আমাদের হতে হবে?

মহারাজ : হ্যাঁ, তার মতো হলে তবে হবে। শুদ্ধ, পবিত্র, নিষ্পাপ, সর্ববাসনাশূন্য, করুণাময় হতে হবে। তবে দর্শন হবে।

প্রশ্ন : কাল মন বড় হতাশ হয়ে গেল। আমার কিছু হচ্ছে না। এক-একদিন খুব ভাল লাগে।

মহারাজ : কেন হতাশ হবে? এই যে আসছ, এতে কি কিছু হচ্ছে না? হচ্ছে। কত জন্মের তপস্যার ফলে এখানে আসতে পারছ। ঠাকুর তোমাদের জন্য রাস্তা ঝাঁট দিয়ে সাফ করে রেখেছেন। তোমরা নিশ্চিত জেনো। চিন্তা করছ কেন? ঠাকুরের নাম যখন করছ, বৃথা যাবে না। তোমাদের ভাল ফল হবেই। তোমাদের কোন অভাব হবে না।

প্রশ্ন : মনে করি দোষ করব না, কিন্তু কে যেন করাচ্ছে। এ কী করে বন্ধ হবে?

মহারাজ : প্রার্থনা করতে হবে। মনের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। দোষ যে করে সে অভ্যাসে করে। তেমনি অভ্যাস করতে করতে দোষ করা বন্ধ করতে হবে।

প্রশ্ন : 'তুরীয়ানন্দজীর পত্র'-এ পড়লাম, অমঙ্গলের মধ্যেও মঙ্গল আছে, এর মানে কী?

মহারাজ : আমরা জানি না কোনটা মঙ্গল আর কোনটা অমঙ্গল। আমাদের কাছে যেটা অমঙ্গল, ঠাকুরের কাছে সেটা মঙ্গল। ঠাকুরকে বিশ্বাস কর, তখন বুঝবে। ভাববে ঠাকুর মঙ্গলময়।

প্রশ্ন : স্বভাব বদলাব কী করে?

মহারাজ : লড়াই কর, মনের সঙ্গে যুদ্ধ কর। যা স্বভাব সেটা তো অনেকদিন করতে করতে হয়। সেটার বিপরীত চেষ্টা করতে করতে স্বভাব বদলানো যায়।

প্রশ্ন : ‘আত্মা’ মানে তো ভগবান। তিনি তো আমাদের অন্তরেই আছেন। তাহলে আমরা যখন অন্যায় করি তখন তিনি বারণ করেন না কেন?

মহারাজ : তিনি ঠিকই সাবধান করেন। তোমরা শুনতে পাও না। ছেলেমেয়ে অন্যায় করলে বাবা-মা সাবধান করেন। কিন্তু ছোট ছেলেমেয়েরা বারণ শোনে, বড় হয়ে গেলে শোনে না। তারা যা করে বুঝেই করে।

—আমরা কী করে তাঁর বারণ বুঝব?

মহারাজ : শান্ত, শুদ্ধ মনে তাঁর ইঙ্গিত বোঝা যায়।

প্রশ্ন : আমি যেখানে থাকি, সেখানে দেখি লোকেরা দিনের বেলায় মিথ্যাচারণ করে, লোক ঠকায় কিন্তু সারারাত হরিনাম করে। এদের কি নামে ফল হবে?

মহারাজ : না। কোন ফল হবে না। একে বলে নামাপরাধ। তবে নাম করতে করতে কারো কারো চৈতন্য হয়। কারণ, নামের একটা ফল আছে। তখন সে ভাবে—নামও করছি আবার এইসবও করছি! তখন সে এগুলো ছাড়তে চেষ্টা করে।

প্রশ্ন : বেড়ালছানাকে তার মা যেখানে রাখে সেখানেই থাকে, আর ঠাকুর বলছেন, ‘ঝড়ের এঁটো পাতা হও’—দুটোই কি এক?

মহারাজ : ভাবার্থে এক। কিন্তু একটু আলাদা। বিড়ালছানাকে তার মা যেখানে রাখে সেখানেই থাকে। মাঝে মাঝে শুধু মিউ মিউ করে তার অসুবিধাটা মাকে জানায়। কিন্তু ঝড়ের এঁটো পাতা ঝড় যেদিকে নিয়ে যায় সেদিকেই যায়। বিড়ালছানা মায়ের ওপর নির্ভর করে, তবে অসুবিধা জানায়।

—তাঁর ওপর নির্ভর করতে বলছেন, কিন্তু তাঁর ওপর নির্ভর করলেও অনেক সময় মনে সংশয় আসে।

মহারাজ : নির্ভরতা মানে তাঁর ওপর ছেড়ে দেওয়া। যদি নির্ভরই কর, তাঁর ওপর ছেড়ে দাও। সে ভাল হোক বা মন্দ হোক। তোমার ইচ্ছামতো সব হবে তা তো নয়। তাঁর যা ইচ্ছা হবে তাই হবে, তাতেই সন্তুষ্ট হও। যে ভগবানে নির্ভর করে, তার কোন সংশয় বা অশান্তি হয় না। সংশয় বা অশান্তি হলে বুঝতে হবে ঠিক ঠিক নির্ভরতা হচ্ছে না। তাই যতক্ষণ নির্ভরতা না আসে, ততক্ষণ চেষ্টা করে যাবে বৈকি। আমরা সবেতেই অধৈর্য হই। কিন্তু তাঁর ওপর নির্ভর করলে সব ঠিক থাকে। চেষ্টা করে যেতে হবে যাতে সেই নির্ভরতা হয়। চুম্বকের কাছে যত এগোবে তত তার আকর্ষণ বাড়বে। আদর্শের দিকে যত এগোবে তত তুমি আদর্শের অনুরূপ হয়ে যাবে। বাধা যে পড়ে, সেটাও দরকার। প্রবল বাধায় প্রবল শক্তি। বাধা আকর্ষণকে বাড়ায়।

প্রশ্ন : দিন চলে যাচ্ছে, নামে রুচি হচ্ছে না তো?

মহারাজ : দিন চলে যাচ্ছে—এই বোধ হচ্ছে কি? তাঁর জন্য মন ছটফট করছে? না, বিষয়রক্ষার জন্য মন ব্যাকুল? সবকিছু ঠিকঠাক রেখে অবকাশমতো তাঁকে ডাকলে কি হয়? রুচি তো আকাশ থেকে পড়বে না। নাম করতে করতে নামে রুচি হবে।

—অনেক সময় বড় ক্লান্ত লাগে।

মহারাজ : ক্লান্ত লাগলে বিশ্রাম নাও।

—কৃপা করুন যাতে ধর্ম ‘জাপানী ফুলদানি’ না হয়।

মহারাজ : কৃপা আছে, রাখার জায়গা নেই। ভিতরে ‘আমি’ গজগজ করছে, শরণাগতি আসবে কোথা থেকে?

—এই অহং সারাবার উপায় কী?

মহারাজ : তাঁকে দিয়ে ভরে ফেল যাতে মনে আর কোন কিছুর জায়গা না থাকে।

—কতখানি দুঃখ পেলে তাঁর কৃপা অনুভব করা যায়?

মহারাজ : দুঃখের কি শেষ আছে, না মাপা যায়?

প্রশ্ন : অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও সামাজিকতার দায়ে বিরুদ্ধ পরিবেশে যেতে হয়। সমাজে থাকি, কিছু বিধি-নিষেধ তো মানতে হয়।

মহারাজ : কেন যাও? যতক্ষণ দুদিক রাখার ইচ্ছে ততক্ষণ সামাজিক দায়। তাঁকে লক্ষ্য করে চললে সমাজ-সংস্কার, লোকলজ্জা, ভয়—সব চলে যায়।

প্রশ্ন : শরীর অপারগ হলে যখন জপ-ধ্যান, পূজা করতে পারব না, তখন কী হবে?

মহারাজ : (করজোড় করে দেখিয়ে) তখন শুধু বলবে—‘শরণাগত, শরণাগত’!

—তাঁকে অনেক সময় ভুলে যাই, এতে কি ক্ষতি হবে?

মহারাজ : তাঁকে ভুলে থাকছি—সেটাই তো বড় ক্ষতি। এর থেকে বেশি ক্ষতি কী হবে?

প্রশ্ন : গুরুর আশীর্বাদে তো কল্যাণ হয়?

মহারাজ : গুরু আর ইষ্ট অভিন্ন বোধ হলে গুরুর আশীর্বাদ অমোঘ। যদি বিফল হয় তার জন্য আমরাই দায়ী। আমাদের ভক্তি ও বিশ্বাসের অপরিপক্কতাই দায়ী।

প্রশ্ন : শুদ্ধ মন কাকে বলে?

মহারাজ : যে-মন অসৎ চিন্তাকে প্রশ্রয় দেয় না। অনাসক্ত মনে কোন ক্ষতিকর বা বিরূপ বৃত্তি ওঠে না। অনলস নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার দ্বারা মন শুদ্ধ হয়। মনের মধ্যে এই ধারণা দৃঢ় রাখতে হবে যে, নিজের কল্যাণের জন্যই মনকে শুদ্ধ করতে হবে। অনাসক্তি স্বতই আসে না। নিরন্তর আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা আসে।

—অসৎ চিন্তা মন থেকে সরাব কী করে? অসৎ চিন্তায় তো ক্ষতি হবে—

মহারাজ : ক্ষতি তো হবেই। সৎ চিন্তায় মন ভরে রাখলে অসৎ চিন্তা আসবে কী করে? অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাস করতে করতে শেষে হবে।

প্রশ্ন : আমি বেশিক্ষণ ধ্যান-জপ করতে পারি না, এতে কি আমার অপরাধ হচ্ছে?

মহারাজ : কে কতক্ষণ ধ্যান-জপ করলে সেটা বড় কথা নয়। মন কতটা তাঁতে গেল তা দেখতে হবে। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করবে, আমাকে শক্তি দাও যেন ধ্যান-জপ করতে পারি। ঠাকুর ঠিক শুনবেন। তিনি কান পেতে বসে আছেন।

প্রশ্ন : আচার অনুষ্ঠান কতদিন করতে হয়?

মহারাজ : তাঁকে লাভ হলে আর আচার অনুষ্ঠান করতে হয় না। আচার অনুষ্ঠান হল উপায়। তাঁকে যখন লাভই হয়ে গেল তখন আর আচার অনুষ্ঠান করে কী হবে? তাঁকে লাভ করার জন্যই তো আচার অনুষ্ঠান।

প্রশ্ন : জ্ঞানপথ আর ভক্তিপথের মধ্যে ঠাকুর বলছেন, কলিতে ভক্তিপথই সোজা। জ্ঞানপথে কোন কামনা-বাসনা থাকবে না, কিন্তু ভক্তিপথে তো আমাদের কামনা-বাসনা থেকেই যায়—

মহারাজ : ভক্তিপথে কামনা-বাসনাকে ভগবানের ওপর আরোপ করা যায়। কিন্তু জ্ঞানপথে কার ওপর আরোপ করবে? জ্ঞানপথে মনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। সেখানে তো 'আমি' নেই। যে-আমি আছে সে-আমি 'সোঽহম্'—সঃ অহম্। কিন্তু ভক্তিপথেও আমিত্ব লোপ হয়। কারণ, এখানে 'আমি' তাঁর।

প্রশ্ন : আমরা সংসারী। আমাদের সকাম ভক্তি, আমাদের কি নিষ্কাম ভক্তি হবে না?

মহারাজ : কেন হবে না? চেষ্টা করতে হবে। আন্তরিক প্রার্থনা করতে হবে। মনকে বোঝাতে হবে—এ-সংসার অনিত্য। কিছুই থাকবে না। ঠাকুর বলছেন 'আমি' ও 'আমার' ত্যাগ করতে। 'এ-ব্রহ্মাণ্ড তোমার সৃষ্টি, দৃষ্টিহীনে আমার বলে।'

প্রশ্ন : ঠাকুরের কৃপায় আমি এখন খুব সহ্য করি।

মহারাজ : শুধু সহ্য করলেই হবে না। সবই ঠাকুর করছেন, ঠাকুর সব বলাচ্ছেন—এই ভাবতে হবে। গায়ে কিছু মাখবে না। কে কী বলল কিছু মনে করবে না। জানবে, সব ঠাকুর জানেন।

—গীতায় আছে মান-অপমান, সুখ-দুঃখকে সমান দেখতে হবে। কী করে সমান বলে ভাবব?

মহারাজ : মান-অপমান হবে না, সুখ-দুঃখ হবে না—এমন নয়। রোগ-শোক হবে না—এমনও নয়। নিজে চঞ্চল হবে না। নিজেকে তাতে হারিয়ে ফেলবে না। ঈশ্বরকে ধরে থাকতে হবে। সূর্যের আলো সকল

জায়গায় পড়ে। কেউ জপ-তপ করে, কেউ খুন করে। তাতে সূর্যের কিছু এসে যায় না।

—কী করে এমন হবে?

মহারাজ : নির্লিপ্ত হয়ে থাকবে। শুধু দেখে যাবে। থিয়েটারের 'সিন' বদলে বদলে যাচ্ছে। থিয়েটারে সুখ-দুঃখ আছে, কিন্তু সেটা আমাদের নয়, আবার যারা অভিনয় করছে তাদেরও নয়—তেমনি সংসারে ভাবতে হবে, এটা আমাদের নিজের নয়।

—ভক্তিপথে নির্লিপ্ত হয়ে থাকব কী করে?

মহারাজ : তাঁর ইচ্ছাতে হয়ে যায়।

—আমাদের ইচ্ছা আর ঠাকুরের ইচ্ছা বুঝব কী করে?

মহারাজ : তোমাদের ইচ্ছা বোঝা যাবে, ঠাকুরের ইচ্ছা বোঝা যাবে না। ঠাকুরের ইচ্ছার সঙ্গে যদি তোমার ইচ্ছা মিলিয়ে দাও তাহলে তো হয়েই গেল। তোমাদের ইচ্ছা শেষ হবে যেখানে, সেখানে ঠাকুরের ইচ্ছা শুরু হবে।

—ফাঁকি দেওয়া বুঝব কী করে?

মহারাজ : নিজের মনকে বিচার করে বুঝবে।

—আপনার জন্য বাজি এনেছি।

মহারাজ : বাজি কি জান? সংসার হচ্ছে বাজি। সর্বদাই সব পুড়ছে, জ্বলছে।

—ইচ্ছা করলেই তো ঠাকুর সব বন্ধ করে দিতে পারেন?

মহারাজ : তা পারেন। কিন্তু তাঁর খেলা। এই যে কত জ্বলছে, পুড়ে যাচ্ছে। পোড়া দেখলে ভয় পেও না।

—'বাবার সম্পত্তি' সন্তান পায়। আমরা কেমন করে পাব?

মহারাজ : বিশ্বাসে পাবে। তাঁর যোগ্য সন্তান হলে পাবে। পিতা যা করলে খুশি হন তাই করতে হবে, তন্ময় হয়ে তাঁকে ডাকতে হবে।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন, ত্যাগ না করলে কিছু হবে না। কী ত্যাগ করব বুঝতে পারছি না।

মহারাজ : হ্যাঁ, ত্যাগ না করলে কিছু হবে না। যেমন, অনেক কাপড় রয়েছে, দুই-তিন খানা হলেই তো হয়ে যায়। তারপর বাকি সব কাপড় ত্যাগ কর। যার পঞ্চাশখানা ঘর রয়েছে, সে দশখানা রেখে বাকি চল্লিশখানা দান করে দিক। তাহলেই ত্যাগ হল।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন—নির্জনবাস। নির্জনবাস কিরকম?

মহারাজ : নির্জনবাস মানে তুমি একা থাকবে। তোমার মনটা কেউ নিতে পারবে না। মন শুধু ঈশ্বরেতে থাকবে। একে বলে নির্জনবাস।

প্রশ্ন : স্তবপাঠ, মন্ত্র—কত কী আছে! আমি কিছুই করতে পারি না। কিন্তু সবসময় ঠাকুরকে চিন্তা করি, জপ করি, তাহলে কি ক্ষতি হবে?

মহারাজ : জল ঢালতে হয় গাছের গোড়ায়। তাহলে গাছের কাজ হবে। গাছ বাঁচবে। পাতায় বা ডালে জল দেয় না। জল গোড়াতেই ঢালতে হয়। শুধু স্তবপাঠ করে কী হবে? জপ-ধ্যান, ঠাকুরের চিন্তা করতে হবে।

প্রশ্ন : ঠাকুরের কাছে আমার হয়ে আপনি 'প্লিড' করুন।

মহারাজ : (হাসি) এ উকিলকে 'ফি' দিতে হয় না। উকিল যেমন মক্কেলকে বলে, মক্কেল যদি সেইরকম কাজ করে তাহলে জিততে পারে, তা নাহলে হারবে।

প্রশ্ন : সবসময় আনন্দে কিভাবে থাকা যায়?

মহারাজ : সবসময় একেবারে স্বার্থশূন্য হতে পার? তাহলে সবসময় আনন্দে থাকবে। নিঃস্বার্থ হতে হবে।

প্রশ্ন : কাজে সফল কী করে হওয়া যায়?

মহারাজ : ধৈর্য, বিশ্বাস, বিচার করলে সাফল্য পাওয়া যায়।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলছেন, একবার রামনাম করলে কোটি সন্ধ্যার ফল হয়। আমরা তাহলে এত জপতপ করি কেন?

মহারাজ : হ্যাঁ, হয় তো, বিশ্বাস থাকা চাই। যেমন অসুখ করলে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খায়, আবার অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ খায়, তারপর কবিরাজি ওষুধ খায়, তারপর জলপড়া খায়, তারপর হাত দেখায়। মানে কোনটাতেই বিশ্বাস নেই। সেজন্য কোন কাজও হয় না।

প্রশ্ন : আপনি বলেছিলেন, ঠাকুর কারোর দোষ দেখেন না। তাহলে তো সকলেই বেশি করে দোষ করবে।

মহারাজ : দোষ করুক না, ঠাকুরকে মনে রেখে ক্ষমা চাইলেই হবে।

প্রশ্ন : মনের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ নানারকম বাজে চিন্তা ভেসে ওঠে। খুব কষ্ট হয়। আমি চিন্তা করি না, তবুও কোথা থেকে যে ঐসব বাজে চিন্তা মনের মধ্যে আসছে বুঝতে পারি না, তাই আমার খুব কষ্ট হয়।

মহারাজ : ভেতরে ভরে আছে। (পূর্বসংস্কাররূপে) তারই ফুট উঠছে।

প্রশ্ন : তিনি কি সবাইকে সমানভাবে কৃপা করেন?

মহারাজ : তাঁর কৃপা সর্বত্র প্রসারিত। কিন্তু সকলে কৃপা অনুভব করতে পারে না। ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে কৃপা নিতে পারা যায়। কৃপা নিতে হলে ক্ষেত্র প্রস্তুত হওয়া চাই। সূর্য সকলকেই আলো দিচ্ছে। কিন্তু যদি কেউ চোখ বন্ধ করে থাকে তাহলে সে সূর্যকে দেখতে পায় না। চোখ খুলে রাখলে সূর্যের আলোকে সে কাজে লাগাতে পারে। সূর্যের আলো যেমন চোখ দিয়ে অনুভব করতে হয়, তেমনই কৃপা প্রাণ দিয়ে অনুভব করতে হয়।

প্রশ্ন : আমরা প্রারব্ধের জন্যই তো দুঃখ পাই, সুখ পাই, দুঃখে কষ্ট পাই।

মহারাজ : দুঃখের দিনে তাঁর নাম করবে। তবে দুঃখেও তিনি, সুখেও তিনি। দুঃখের দিনে তাঁর পাদপদ্ম সর্বদা স্মরণ রাখবে।

প্রশ্ন : 'ভূতেশ' মানে কী?

মহারাজ : 'ভূতেশ' মানে যিনি সমস্ত প্রাণীর নিয়ন্ত্রণকারী। সমস্ত প্রাণীকে নিয়ন্ত্রণ করছেন যিনি। 'ভূতে যঃ স্থিত অসৌ আনন্দ ইতি ভূতেশানন্দ।' 'ভূতেশ'—বিষ্ণু (বা কৃষ্ণ) এবং শিব। যিনি ভূতসমূহের পালক—এই অর্থে বিষ্ণু। যিনি ভূতসমূহের অধীশ্বর অথবা ভূতসমূহ যাঁতে অবস্থিত—এই অর্থে শিব।

প্রশ্ন : ঠাকুর মাস্টারমশায়কে জিজ্ঞাসা করছেন, 'এই যে এত লোক এখানে আসছে, এদের কি কিছু হচ্ছে?' মাস্টারমশায় বললেন, 'হ্যাঁ, এদের হচ্ছে।' ঠাকুর বললেন, 'তুমি কী করে বুঝলে?' মাস্টারমশায় বললেন, 'এখানে যারা আসে তারা আর ফেরে না।' মহারাজ আমরাও তো এখানে আসছি। আমাদের কী কিছু হচ্ছে?

মহারাজ : তোমাদের একটা সম্ভাবনা আছে, এটা তোমাদের সহজাত। ভয় পেও না। মা বলছেন, তোমাদের আর কেউ না থাক, জানবে একজন মা আছেন। তোমাদের পিছনে সর্বদা ঠাকুর ও মা আছেন। তোমাদের 'জাতসাপে' ধরেছে!

প্রশ্ন : জপ করতে বসলে বাইরের কথা কানে ভেসে আসে।

মহারাজ : মন তাড়াতাড়ি একটা থেকে আরেকটায় চলে যায়। চঞ্চল মন সবসময় ছুটোছুটি করছে। মন বিচ্ছিন্ন—সিনেমার পরদা যেমন কাটাকাটা। কিন্তু তাতে ছবিগুলো চলে যাচ্ছে, যেন মনে হচ্ছে একটা ছবি। মন স্থির হলে তাকে যেটাতে লাগানো যায় সেটাই হয়।

প্রশ্ন : মন স্থির করব কী করে?

মহারাজ : জপ করতে করতে মন স্থির হয়। জপ করা মানে মনকে একটা বিষয়ে স্থির রাখা। মনকে প্রত্যয়ী করতে হবে।

—আপনি একদিন বলেছিলেন, জপের সময় অন্য চিন্তা করলে জপাপরাধ হয়। আমরা তো জপের সময় অনেক রকম খারাপ চিন্তা করে ফেলি; তাহলে সেটা কি জপাপরাধ হয়?

মহারাজ : ঠাকুর মা-বাবা। ঠাকুরের কাছে কোন অপরাধ হয় না। অত 'অপরাধ' ধরলে তারা (যারা চিন্তা করছে) যাবে কোথায়?

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন, মায়ের কাছে পিঁপড়ের সারির মতো লোক আসবে, তা এখন তো দেখছি তাই হচ্ছে। পিঁপড়ের সারির মতোই লোক আসছে।

মহারাজ : (সহাস্যে) তা তো ঠিকই। ঠাকুরের কাছে সব 'মানুষ' গিয়েছে আর মায়ের কাছে সব 'পিঁপড়ে' আসছে!

প্রশ্ন : আমার মন খুব চঞ্চল। যখন মন খুব চঞ্চল হয় তখন জপ না করলেও কি হবে?

মহারাজ : চঞ্চল বলে কি খাওয়া-দাওয়া কর না? খাও তো? সবকিছু করতে পার, আর জপ করতে পার না? জপ করতে করতেই মন স্থির হবে।

প্রশ্ন : আমরা যা করছি, তা কি ঠিক করছি?

মহারাজ : নিজেই বোঝার চেষ্টা কর। যখন ঠাকুরকে স্মরণ করবে তখন ভাল থাকবে, ভাল পথে চলবে। আর যখন ঠাকুরকে ভুলে যাবে তখন ভুল করবে।

প্রশ্ন : নিষ্কাম কর্ম তো আমরা করতে পারি না, কামনা এসেই যায়।

মহারাজ : শুভ কামনা কল্যাণের পথে নিয়ে যায় আর অশুভ কামনা মনকে মলিন করে।

প্রশ্ন : লঙ্কা খেলে ঝাল লাগবে। মা তো ছেলেকে লঙ্কা খেতে গেলে বারণ করবে। তাহলে আমরা কোন অন্যায় করলে ঠাকুর, মা কেন আমাদের হাত ধরেন না?

মহারাজ : 'লঙ্কা খাওয়া' মানে অন্যায় করলে তাকে কর্মফল ভুগতে হবে। ছোটদের বারণ করলে তারা শোনে। কিন্তু জানবে, বড়রা জেনে অন্যায় করে। তাদের ঠাকুর বাধা দিলেও তারা শুনবে না।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন, ভগবানের কাছে লাউ-কুমড়ো চাইতে নেই। কিন্তু কী করব? এই শরীরটার মধ্যে বাসনা ভরে আছে। আর কী করব? আপনাকে সব বলে ফেলি, আপনার কাছেই সব চাই।

মহারাজ : (সহাস্যে) লাউ-কুমড়োরও তো দরকার আছে, কাল সকালে তো রান্না করতে হবে। (খুব জোরের সঙ্গে) বেশ কর, ঠিক কর। আর কার কাছে চাইবে? ঠাকুরকে এদিকে মা, বাবা—সব বলছি, তাহলে ঠাকুরের কাছে চাইব না তো কার কাছে চাইব? বেশ করবে চাইবে।

প্রশ্ন : আপনি থাকতে আমাদের গায়ে কালি লাগবে কেন?

মহারাজ : মনে সংসার রেখেছ যে, সেখানে আমি কী করব?

প্রশ্ন : গুরুর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা কী করে হয়?

মহারাজ : বহু জন্ম ধরে একটু একটু করে শুভ কাজ করতে করতে তার একটা শুভ ফল জমা হয়। এইভাবে জমতে জমতে যখন ফল খুব বাড়ে তখনই গুরুর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়।

প্রশ্ন : ঠাকুরের কাছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করার ইচ্ছা তো আছে, চেষ্টা তো করছি। তবু হচ্ছে না কেন?

মহারাজ : বহু জন্মের সংস্কারের জন্য হচ্ছে না। তবে এই যে ইচ্ছা—এটা থাকা ভাল। এটাই পরে বলিষ্ঠ হবে। সবসময় তাঁর চিন্তা করবে। ঠাকুরের বই পড়বে, ভজন করবে। তাঁর প্রতি আকর্ষণ যত বাড়বে, সংসারের দিকে মন তত কম হবে। তখন হবে।

প্রশ্ন : ঠাকুর বলেছেন, গুরুর কৃপা হলে ভক্তি-শ্রদ্ধা হয়।

মহারাজ : গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, নিষ্ঠা থাকলে তো গুরু কৃপা করবে।

প্রশ্ন : তীর্থে দুবছর সাধনের ফল হয়?

মহারাজ : স্থান-মাহাত্ম্য আছে। সেখানে ঈশ্বরের দিকে মন খুব তাড়াতাড়ি যায়। কিন্তু তোমাদের তীর্থে যাওয়া হয় না। তোমরা বেড়াতে যাও। ঠাকুর কাশী গেলেন, কাশীতে দেখলেন সব শিবময়। আর তোমরা দেখ কোথায় শাকপাতা সস্তায় পাওয়া যায়, কোথায় গঙ্গার হাওয়া। আবার ভিড়ের মধ্যে কেউ চুরি করে।

—ঠাকুরের কাছে ভরা মন নিয়ে সর্বদা আসতে পারি না, সেজন্য কষ্ট হয়।

মহারাজ : যতটুকু আছে, ততটুকু নিয়ে আসবে, তারপর তিনি ভরে দেবেন।

প্রশ্ন : আমার ওপরে ঠাকুরের টান নেই কেন?

মহারাজ : ঠাকুরের ওপরে তোমার টান থাকা চাই। ঠাকুর একজনকে টানলে আরেকজনকে টানবেন না কেন? ঠাকুরের টান হলে কি আর রক্ষে আছে? সংসার-টংসার সব কোথায় চলে যাবে! ঠাকুরের টান সর্বনেশে টান।

—ঠাকুরের পায়ে সব দিলে হবে না মহারাজ?

মহারাজ : বাজনার 'বোল' মুখেও বলে, আবার হাতেও তোলে। মুখে বলা সহজ, কিন্তু হাতে তোলা কঠিন। তেমনি ঠাকুরের পায়ে সব দিলাম বলা খুব সহজ, করা কঠিন।

প্রশ্ন : মা বলেছেন, এখানে যারা এসেছে তারাই মুক্ত হবে। আমরাও মুক্ত হব?

মহারাজ : তোমরা এসেছ কি? 'আসা' মানে তাঁকে অন্তরের সঙ্গে গ্রহণ করা; করেছ কি? তাঁকে গ্রহণ করলে আর কোন বন্ধন থাকবে না।

প্রশ্ন : মায়ের মন বুঝব কী করে?

মহারাজ : তোমার মন মায়ের দিকে না গেলে তুমি মায়ের মন বুঝতে পারবে না। মায়ের কথা ভাবতে ভাবতে তোমার মন তন্ময় হয়ে যাবে যখন, তখন তোমার এতটুকু মন 'মা-ময়' হয়ে যাবে। মা ছেলেকে খেলনা দিয়ে বসিয়ে দিয়ে ঘরের কাজ করতে যায়। ছেলে কি জানে যে, মা তার কথা ভাবছে? মা কিন্তু ঠিক ছেলের কথা ভাবছেন।

—আমরা বুঝতে পারি বা না পারি, মা আমাদের কথা ভাবছেন, তাই তো?

মহারাজ : মা ভাবছেন বলেই তো বেঁচে আছ। মা যে তোমাদের ভালবাসেন।

—মা ঠাকুরের কাছে সবার জন্য প্রার্থনা করেছেন, আমরা তা বুঝতে পারি না কেন?

মহারাজ : নিজেরা যে-পরিমাণ গ্রহণ করার যোগ্যতা রাখবে সেই পরিমাণ ফল পাবে। মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, পরিপূর্ণ বিশ্বাস রাখতে হবে। শুধু 'মা' বললেই কি হবে?

প্রশ্ন : স্বামীজী বলেছেন, উপলব্ধিই ধর্ম। আমাদের তো উপলব্ধি হয়নি।

মহারাজ : যতক্ষণ উপলব্ধি হয়নি, ততক্ষণ ধর্ম হয়নি। চেষ্টা কর, চেষ্টাটাও ধর্মের সোপান বা সিঁড়ি। চেষ্টা করে ধর্মলাভ হয়।

প্রশ্ন : এখানে (বেলুড় মঠে) কত সৎ-প্রসঙ্গ হয়, তবে এটিও তো সব তীর্থের সমান, তাই নয় কি?

মহারাজ : সব নির্ভর করছে গ্রহণশক্তির ওপরে। গ্রহণশক্তি থাকা চাই, তা নাহলে হবে না। তিনি সর্বত্র বিরাজমান, আমরা সবাই কি তাঁকে গ্রহণ করতে পারছি? এ-জন্মটা পেয়েছ, জন্মটা কাজে লাগাও। আগের জন্ম বা পরের জন্ম সম্বন্ধে বেশি ভেবো না।

প্রশ্ন : আপনার এখানে মন আনন্দে পূর্ণ থাকে, কিন্তু এখান থেকে বেরোলে থাকে না কেন?

মহারাজ : আনন্দে রাখ না কেন? মন তো তোমারই। মন তোমাদের, মনের ওপরে প্রভুত্ব রাখতে হবে অর্থাৎ তুমি যেমন বলবে মন তেমন-ভাবে চলবে। মনকে তো মারা যায় না, অভ্যাস করতে করতে হবে।

॥ ১৬১ ॥

(বাংলা সাহিত্যজগতের অন্যতম উল্লেখযোগ্য পত্রিকা 'দেশ'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর দুজন বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব একবার বেলুড় মঠে পূজ্যপাদ মহারাজের বাসভবনে তাঁর একটি একান্ত সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। মননসমৃদ্ধ ও বিচারপ্রবণ সেই প্রশ্নোত্তর-পর্বটি 'দেশ' কর্তৃপক্ষের সৌজন্য ও সহৃদয়তায় এ-পুস্তকে অসীম কৃতজ্ঞতায় গ্রথিত করতে পেরে আমরা ধন্য।)

প্রশ্ন : রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন তথাকথিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মতো মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্যে মাদুলি-মালা কিংবা কোন মন্ত্রপূত অলৌকিক বস্তু অথবা রোগজ্বালা উপশমের জন্য জড়ি-বুটি-ওষুধ ইত্যাদি কিছুই দেয়

না। এমনকি উগ্র গুরুবাদী ধারণার পরিমণ্ডল থেকেও এই সংঘ নিজেকে সরিয়ে রেখেছে। আশ্চর্যের বিষয়, এইসব অভিপ্রেত উপাদানগুলি নেই জেনেও বহু মানুষ আজ নানাভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গো যুক্ত হতে চাইছে। শ্রীরামকৃষ্ণ, শ্রীমা ও স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারায় নিজেকে মিশিয়ে দেওয়ার জন্য মানুষের আকুলতা বাড়ছে। কেন এমনটি হচ্ছে? এর সম্ভাব্য কারণ কী?

মহারাজ : দেখ, মানুষের একটি স্বাভাবিক প্রবণতাই হল, সংসারে যে জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করছে তার থেকে সে মুক্তি চায়। এই মুক্তি পাবার জন্য যেসব অলৌকিক উপায় আছে, সেগুলিতে যারা বিশ্বাসী, তারা হয়তো সেদিকেই ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু সব মানুষকে এই অলৌকিক উপাদানগুলি নিজের দিকে আকর্ষণ করতে পারে না। যারা অলৌকিকের প্রতি আকৃষ্ট হয় না, তারা লৌকিক জীবনের মধ্যেই মুক্তির সন্ধান করে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, এর মধ্যে আমরা মুক্তির উপায়রূপে এমন সব কথা ও ভাব পাই, যেগুলি মানুষ বুঝতে পারে। স্বভাবতই বুঝতে পারে। কোন অলৌকিক বস্তু বা বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করতে হয় না। সাধারণ মানুষ এইজন্য ঠাকুরের ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়। দুর্বোধ্য, হেঁয়ালি এখানে কিছু নেই। সোজা, পরিষ্কার কথা। যেমন, ঠাকুর বলেছেন, ত্যাগ ছাড়া কিছু হবে না। মানুষ করতে পারুক বা না পারুক বিষয়টির তাৎপর্য তার বোধগম্য। বাসনা ত্যাগ হলেই মানুষের শান্তি। এও মানুষ বুঝতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ভগবানেতে ভক্তি যত বৃদ্ধি পাবে, তত সাংসারিক দুঃখ-কষ্টের ঊর্ধ্বে মানুষ উঠতে পারবে। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণ সহজ, শ্রীরামকৃষ্ণ সহজবোধ্য এবং তাঁর ভাবও সহজবোধ্য। আসলে, ঈপ্সিত বস্তু পাবার জন্য লৌকিকের চেয়ে

অলৌকিক উপায়ের মধ্যে আমরা ঢুকে পড়তে চাই। কিন্তু যদি লৌকিক উপায়ের মধ্যে সেটি পেয়ে যাই, তাহলে অলৌকিকের কোন দরকার হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণ যা বলছেন, সেগুলির কোনটিই অলৌকিক নয়। তা সহজ, স্বাভাবিক। এর জন্য অলৌকিকে বিশ্বাসী হওয়ার প্রয়োজন হয় না। মানুষ সাধারণ দৃষ্টি দিয়ে তা বুঝতে পারে।

প্রশ্ন : বিজ্ঞানের জয়যাত্রার যুগে অলৌকিকের প্রতি মানুষের এই আস্থা বা বিশ্বাস বেশ আশ্চর্যের নয় কি?

মহারাজ : হ্যাঁ। দেখ, মানুষের অলৌকিকের প্রতি ঝোঁক বেশি হওয়ার কারণ এই যে, মানুষ এমন জিনিস পেতে চায়, যার মূল্য সে দিতে প্রস্তুত নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ ঐরকম কোন জিনিস দিতে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন না। তিনি সেই কথাই বলছেন, যা লৌকিক জীবনে আচরণের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হবে। খুব সোজা কথায় তিনি সব বলছেন। তাঁর সব কথা জীবনে প্রয়োগ করা হয়তো দুষ্কর; কিন্তু বোঝা খুব সহজ। সুখের কথা, বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে মানুষের মন ক্রমশ পরিণত হচ্ছে। আর বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে মানুষের মন যখন শিক্ষিত হয়, তখন স্পষ্ট প্রতীয়মান ভাবগুলি তাকে বেশি আকর্ষণ করে। অলৌকিক জিনিসের প্রতি তার আস্থা কমতে থাকে। লৌকিক বুদ্ধির ওপর তার আস্থা বেশি হয়।

(প্রসঙ্গত ভূতেশানন্দজীর একটি অভিভাষণ এই সূত্রে স্মরণীয়। ৮ মে ১৯৮৭ তারিখে তমলুক শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন—ঠাকুর তো দেখিয়েছেন তিনি কিছু অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ড করেন না। একজন ঠাকুরের কাছে এসে বলছে, শুনেছি এখানে পরমহংসদেব ওষুধ দেন। ঠাকুর সশঙ্কিত হয়ে বলছেন, না এখানে না, ঐ পঞ্চবটীতে। সাধুর কাছে বা ভগবানের কাছে আমরা এইসব বিষয়ই চাই। মুখে বলি

জ্ঞান-ভক্তি চাই, কিন্তু বাস্তবিক তা কতটুকু চাই? এরকম অবস্থায় ঠাকুর আমাদের কোন কাজে লাগবেন, সেই কথা ভাববার। আমরা সাধারণত যা চাই—ঠাকুরের কাছে সেসব কিছুই নেই। ধনদৌলত নেই, রোগ ভাল করতে পারেন না বা করেন না; মামলায় জিতিয়ে দেওয়া, ছেলেমেয়েদের পরীক্ষায় পাস, চাকরি পাওয়া, মেয়ের বিয়ে প্রভৃতি পার্থিব ব্যাপারে আশীর্বাদ চাইলে ঠাকুর বলতেন, মা জানেন, আমি কিছু জানি না। তখন আর তাঁকে প্রয়োজন নেই। এমন যে-ঠাকুর তাঁকে দিয়ে আমরা কী করব? তাই যখন দেখে যে, তাঁর কাছে এসে পার্থিব কিছু লাভ হল না, যেমন—কেউ কেউ বলে, আমি দীক্ষা নেবার পর থেকে সংসারে নানা অঘটন ঘটছে; এটি কি দীক্ষার দোষে হচ্ছে? এর উত্তরে বলব—ঠাকুর বলেছেন, ভগবানের জন্যেই ভগবানকে চাইব। তাঁকে উদ্দেশ্য-রূপে চাইব, উপায়-রূপে নয়। তিনি এই দেবেন, ঐ দেবেন—এইসব আশা করে তাঁকে চাইব না। কিন্তু সেরকম মানসিকতা নিয়ে ঠাকুরের কাছে কজনই বা আমরা যাই? আমরা যা চাই তাঁর কাছে পাই না। ফলে কী করি? একদিকে মুখে 'ঠাকুর ঠাকুর' বলি, আর অন্যদিকে অলৌকিক ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তিদের শরণাপন্ন হই। আমি সেইসব ব্যক্তিদের দোষ দিচ্ছি না, শুধু মানুষের বাসনার কথা বলছি।

একবার এক জায়গায় গিয়েছি—একজন আমাকে বলছে, 'আপনি হাত দেখতে জানেন?' আমি বললাম, না। 'তাহলে আপনি কী জানেন?' ভাবলাম, সত্যিই তো আমি কী জানি? এইসব মানুষের আশা মেটাবার মতো বস্তুসম্ভার আমার কাছে কিছুই নেই। অথচ শ্রীরামকৃষ্ণকে এদের ভাল লাগে। কেন লাগে? একটি কারণে লাগে, তা হচ্ছে—এমন সরল, আত্মভোলা, সকলের দুঃখে দুঃখী মানুষ কজন মেলে! যিনি সর্বদাই

ত্যাগ-বৈরাগ্যের কথা বলেন; ঈশ্বর ছাড়া যিনি আর কিছু জানেন না; অথচ কেউ সন্তান হারিয়ে তাঁর কাছে গিয়ে দুঃখের কথা জানালে তাঁর চোখে জল। এই ঠাকুরকেই তো আমরা চাই। যিনি আমাদের দুঃখে দুঃখ পান, উদাসীন হয়ে থাকেন না, তাঁকেই তো আমরা চাই। তিনি সব দুঃখ-বিপদ থেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ধার করতে নাও পারেন; কিন্তু তাঁর মধ্যে আমরা এমন একজন দরদীকে পাই—যিনি আমাদের দুঃখ বোঝেন।)

প্রশ্ন : স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব সত্যযুগ এনেছে। সত্যযুগ বলতে স্বামীজী কী বলতে চেয়েছেন? কোন কোন লক্ষণ এই যুগকে সত্যযুগ বলে চিহ্নিত করবে?

মহারাজ : সত্যযুগ—এই শব্দটি সকলের মনকে আকর্ষণ করে, আলোড়িত করে। একইসঙ্গে আমাদের মনে সংশয় দেখা দেয় এই ভেবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাব থেকে সত্যযুগ শুরু হয়েছে। বুঝলাম। কিন্তু তার প্রকাশ কোথায়? কথা হল, সত্যযুগ বলতে এমন একটি কাল্পনিক যুগকে আমরা মনে করি, যে-যুগের কোন দোষ নেই, সব গুণ। এরকম কোন যুগ কখনো ছিল না। এই জগৎটা ভাল-মন্দয় মেশানো সবসময়েই। তাহলে স্বামীজী 'সত্যযুগ' শব্দটি কেন বললেন! এর উত্তরে বলব, মানুষ যখন জগতের ভালর দিকটার প্রতি আকৃষ্ট হয়, মন্দের থেকে দূরে থাকতে চায়, তখন অর্থাৎ সেই সময়ে তার যে মনের অবস্থা, সেটাকেই আমরা বলি সত্যযুগ! সেই যুগের আবির্ভাব ব্যাপকভাবে কিংবা হঠাৎ হয় না। ধীরে ধীরে যুগের পরিবর্তন ঘটে—লোকচক্ষুর অন্তরালে। সেই পরিবর্তনের সময় যখন আরম্ভ হয়, পরিবর্তন মানে ভালর দিকে পরিবর্তন—তাকেই বলি সত্যযুগ।

সেই সত্যযুগের পরিপুষ্টি হতে দীর্ঘ সময় লাগে। এখুনি তার ফল কী কী, তার স্বরূপটি কেমন তা বোঝা যাবে না। দেখা যাবে না। তবে বিচার করে দেখলে দেখতে পাব, শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবের পর থেকে মানুষের ভেতরকার তন্দ্রা ভাঙছে। অন্ধকার দূর হচ্ছে। একটা নতুন পথে, যাকে আমরা কল্যাণের পথ বলে মনে করছি, সেদিকে চলবার প্রবৃত্তি আসছে। আর ধ্রুবতারার মতো শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনা ও ভালবাসার আলোয় আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলেছেন। এটি আমরা বেশ বুঝতে পারছি। এইরকম সময়টাকেই স্বামীজী সত্যযুগ বলেছেন। তিনি এই কল্যাণের অভিমুখে উত্তরণের দিকে ইঙ্গিত করেছেন।

প্রশ্ন : শিবজ্ঞানে জীবসেবা সম্পর্কে বিবেকানন্দের যে-আদর্শ, সেই আদর্শ রূপায়ণের লক্ষ্য থেকে মঠ-মিশন ক্রমশ সরে আসছে কি? যদি সরে না এসে থাকে, তাহলে আর পাঁচটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গো রামকৃষ্ণ সংঘের পার্থক্য কোথায়? তার স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যটিকে আমরা কিভাবে চিনে নেব?

মহারাজ : সেবার আদর্শকে যখন আমরা একটি কোন উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার বলে গ্রহণ করি, তখন তার ভেতরে একটি কপটতা থাকে। তখন কোন অভিপ্রেত স্বার্থকে সিদ্ধ করার উপায় হিসেবে সেবাকে গ্রহণ করি। কিন্তু যে-সেবার আদর্শ, যা শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ আমাদের দিয়েছেন, তার প্রকৃত রূপ হচ্ছে 'মানব-প্রেম'। মানব-রূপী যে-ঈশ্বর, তার প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসা। এটাই রামকৃষ্ণ সংঘের যে-ত্যাগ, তার মূল প্রেরণা। 'জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।' আমরা এই ভাবটিকে জীবনে কতটা পরিণত করতে পারলাম, সেটাই সবচেয়ে বড় কথা। রামকৃষ্ণ সংঘ শুরু থেকে এই আদর্শ রূপদান করার চেষ্টা করছে। কখনই সরে আসেনি। তার চেষ্টা অব্যাহত।

অনেক প্রতিষ্ঠান হয়তো তাদের কাজের ভেতরে সেবাধর্মকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে না। হয়তো কোন প্রতিষ্ঠান নাম-যশের আকাঙ্ক্ষায় কাজ করছে। বা হয়তো মানুষের ওপর তাদের একটা স্বভাবসুলভ হিতাকাঙ্ক্ষা আছে। তার দ্বারা প্রেরিত হয়ে কাজ করে। স্বামীজী যেটিকে বলেছেন সেবাধর্ম, ঠিক সেইভাবে হয়তো অনেক জায়গাতেই কাজ হয় না। সেবার মধ্যে দিয়ে মানব-প্রেম—এই ভাবটি বহু মানুষকে আকর্ষণ করে। এই কাজের মূল্য অনেক বেশি। এতে জীবনে কল্যাণের পথে চলবার সাহায্য বেশি হয়।

প্রশ্ন : মহারাজ, আপনি পাশ্চাত্যের দেশগুলি ঘুরে এসেছেন। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন ওখানকার মানুষের মনে কী প্রভাব রাখছে? এই ভাবধারা সম্পর্কে তাদের আগ্রহ কতটা ও কেমন বলে আপনার মনে হয়েছে?

মহারাজ : পাশ্চাত্যে ঘুরেছি মানে, আমার ঘোরা খুব সীমিত। যেমন, আমেরিকানদের গল্প আছে, পনেরো দিনে ভারত ভ্রমণ করে একখানা প্রকাণ্ড বই লিখে ফেলে—আমার সেইরকম করে ঘোরা হয়নি। ঠাকুরের কাজে বিদেশ গিয়েছি। সেখানকার ভক্তদের সঙ্গে সম্পর্ক হল। আর তাদের পাশাপাশি সাধারণ লোককে দেখলুম। সাধারণ লোকের থেকে ভক্তদের সংখ্যা যে খুব বেশি তা নয়। হিসেবমতো তারা হয়তো মুষ্টিমেয়। এই সামান্য কয়েকজন ঠাকুরের ভাবকে ঠিক ঠিক ধরবার চেষ্টা করছে এবং এর ভেতর দিয়ে শান্তির সন্ধান পাচ্ছে। বাইরের দেশগুলিতে দেখেছি, সেখানকার মানুষদের যথেষ্ট সচ্ছলতা আছে। তাদের জীবনে সুখ-সুবিধার উপকরণের প্রাচুর্য প্রশ্নাতীত, কিন্তু এ দিয়ে তাদের প্রাণের চাহিদা মিটছে না। তারা জীবনটাকে আরো সার্থক করতে

চায়। কিন্তু কিভাবে করতে হবে তা তারা খুঁজে পাচ্ছে না। মনে হয়, অন্তত ওদেশে গিয়ে মনে হয়েছে, ঠাকুর-মা-স্বামীজীর ভাব তাদের সেদিক দিয়ে খানিকটা হৃদয়ের খোরাক যোগাচ্ছে। সেই শান্তির সন্ধান তারা পাচ্ছে।

প্রশ্ন : আমাদের দেশে সাম্প্রতিককালে যে-সমস্যাটি প্রবলভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, তা হল ধর্মীয় মৌলবাদ। বিভিন্ন ধর্মের মৌলবাদীরা যে-কোন একটি আবেগপ্রবণ বিষয়কে নিয়ে দেশে সাধারণ ধর্মপ্রাণ, ধর্মভীরু মানুষকে খেপিয়ে তুলছেন। যার অনিবার্য পরিণতি হয়ে দাঁড়াচ্ছে—হানাহানি, রক্তপাত ও মৃত্যু। মৌলবাদীদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতা দেশের সার্বিক মঙ্গলের পক্ষে একান্ত ক্ষতিকর। অথচ আমাদের এই মহান দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ। তাঁর সমগ্র জীবন ও বাণী সর্বধর্মের মিলনমালিকা। আমাদের প্রায়ই মনে হয়, ধর্মীয় মৌলবাদীরা যখন পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তখন রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তাদের মাঝখানে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী নিয়ে যদি দাঁড়ান, তাহলে ধর্মসংক্রান্ত বহু সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হতে পারে। এবিষয়ে আপনার অভিমত কী?

মহারাজ : মানুষের ভেতরে সবসময়েই একটা সঙ্কীর্ণতার মনোভাব কাজ করে। এবং এই সঙ্কীর্ণতার ফলে মানুষের ভেতরে ধর্মান্ধতা আসে। শ্রীরামকৃষ্ণ এই জগতে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মমতের সারমর্ম উপলব্ধি করে বলেছেন, বিচার করে বলেছেন—এই ধর্মান্ধতার মূলে আছে মানুষের অজ্ঞতা। মানুষ নিজের ধর্মমতটিকেই কেবল বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাসকে স্বামীজী বলেছিলেন—অন্ধ বিশ্বাস। আর শ্রীরামকৃষ্ণ একে বলেছেন—মতুয়ার বুদ্ধি। কথামৃতে তিনি বলেছেন, "আন্তরিক হলে সব ধর্মের

ভিতর দিয়াই ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বৈষ্ণবেরাও ঈশ্বরকে পাবে, শাক্তরাও পাবে; বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রহ্মজ্ঞানীরাও পাবে; আবার মুসলমান, খ্রিস্টান এরাও পাবে; আন্তরিক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। তারা বলে, 'আমাদের শ্রীকৃষ্ণকে না ভজলে কিছুই হবে না'; কি, 'আমাদের মা কালীকে না ভজলে কিছুই হবে না', 'আমাদের খ্রিস্টান ধর্মকে না নিলে কিছুই হবে না।' এসব বুদ্ধির নাম মতুয়ার বুদ্ধি; অর্থাৎ আমার ধর্ম ঠিক, আর সকলের মিথ্যা। এ বুদ্ধি খারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পোঁছান যায়।"

বস্তুত, মানুষের অন্ধবিশ্বাসের পেছনে কোন যুক্তি থাকে না। যেমন আছে, মানুষ মাত্রেই পাপী। এবং সেই পাপ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য কোন ব্যক্তিবিশেষকে আশ্রয় করা ছাড়া তার কোন উপায় নেই। এই মত মানুষকে খুব অল্প কথায় একটা পথ দেখিয়ে দিতে চায়। কিন্তু যখন সে বিচার করে অন্য দেশের সঙ্গে, অন্য জাতির সঙ্গে, অন্য ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে—তখন সে বুঝতে পারে এই কথার কোন মূল্য নেই। কাজেই ধর্মান্ধতা যাকে বলছি, সেই জিনিসটার উৎপত্তি হয় অজ্ঞান থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর সাধনা ও শিক্ষার ভেতর দিয়ে এই অজ্ঞানকে দূর করার খুব চেষ্টা করেছেন। নিজে উপলব্ধি করেছেন অন্যান্য ধর্মের প্রণালীকে। প্রত্যেকটি ধর্মমতের মধ্যে দিয়েই যে সেই পরম সত্যকে লাভ করা যায়—এটা দেখেছেন। কোন ধর্মের প্রতি তাঁর অশ্রদ্ধা নেই। সত্য যে চারদিকে ছড়ানো এবং তার যে বিভিন্ন রূপ তিনি দেখেছেন, তাকে স্পষ্ট ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এর ফলে, মানুষের নিজের নিজের মনে যে-সঙ্কীর্ণতা তা দূর করবার পথ তারা পেয়েছে। আমরা পেয়েছি। শ্রীরামকৃষ্ণের এই সর্বধর্মসমন্বয়ের বাণী সব জায়গায় যত ছড়াবে, ততই

মানুষের কল্যাণ। কিন্তু সেই কল্যাণ একজনের দ্বারা বা একটি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের দ্বারা হবে না। যখন মানুষ স্বাভাবিকভাবে এই কথায় অর্থাৎ ঠাকুরের বাণীর সত্যতাকে বুঝবে, তখনই তাদের কল্যাণ হবে। তা সে সবাই কখনো বুঝবে কিনা বলা যায় না। কেননা গোঁড়া সব জায়গাতে, সব দেশে, সব সময়েই আছে। আবার পাশাপাশি এই যে অজ্ঞানের বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম—জ্ঞানলাভের জন্য মন্দের সঙ্গো ভালর সংগ্রাম—এ সব জায়গাতেই আছে এবং থাকবে। প্রত্যেকেই, যারা ভাল চায় তারা মন্দের থেকে মুক্ত হতে চায়। আবার, আমার নিজের জন্য যা কল্যাণকর, অপরের জন্য তা কল্যাণকর—এই কথা তার মনে স্বাভাবিকভাবেই উদিত হয়। এইজন্য সে নিয়ত চেষ্টা করবে। নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকা মানুষের উচিত নয়। কারণ তার একটা সমষ্টি-জীবন আছে। স্বার্থবুদ্ধিকে পরিত্যাগ করে, সকলের কল্যাণে আমার কল্যাণ—এই কথাটি যত মানুষ বুঝতে পারবে, ততই সে এই সত্যকে সকলের সামনে, তার নিজের জীবনের ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারবে এবং করতে চাইবে। তবে, গোড়ার কথা হচ্ছে—ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে আমাদের নিজেদেরকে আলোকিত করা দরকার। নিঃসন্দেহ হওয়া দরকার। তা না হলে কী ফল! যে-জিনিসটা সম্পর্কে আমি নিজে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ নই, তার ওপরে আমার অত জোর থাকে না। কাজেই সকলের কাছে পৌঁছে দেব—এ যেমন দরকার, তার চেয়ে বেশি দরকার আমার নিজের জীবনে তা বাস্তবায়িত করা। ধর্মান্ধতাকে এইভাবে দূর করতে হবে।

প্রশ্ন : স্বামী বিবেকানন্দের মহাপ্রয়াণের পর শ্রীমা সারদাদেবী সংঘজননী-রূপে রামকৃষ্ণ সংঘকে যেভাবে তাঁর আধ্যাত্মিক বিভা, জীবনাদর্শ ও

মাতৃস্নেহ দিয়ে লালিত-পালিত করেছেন, তা বিস্ময় উদ্রেক করে। রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের এই কর্মধারার পেছনে শ্রীমায়ের সাধনা ও অবদান অপরিমেয়। সেই তুলনায়, অনেকে বলেন, মায়ের জীবন ও বাণীকে সাধারণের কাছে তেমনভাবে পৌঁছে দেওয়া হয়নি—যতটা দেওয়া হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। এমনকি শ্রীমার নামাঙ্কিত শ্রীসারদা মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রামকৃষ্ণ মঠের অনেক পরে। অথচ ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দে গুরুভ্রাতা স্বামী শিবানন্দজীকে লেখা একটি চিঠিতে স্বামীজী বলেছিলেন, 'তাঁর (শ্রীমা) মঠ প্রথমে চাই। রামকৃষ্ণ পরমহংস যান, আমি ভীত নই। মা-ঠাকুরাণী গেলে সর্বনাশ।' এবিষয়ে আপনি যদি কিছু আলোকপাত করেন—

মহারাজ : কথা হচ্ছে, কোন আদর্শ তখনই প্রসারিত হয়, যখন সে-আদর্শকে ধারণ করবার যোগ্যতা সেই সমাজে আসে। স্বামীজীর ইচ্ছা ছিল, প্রথমে মায়েদের মঠ তৈরি করবেন। কিন্তু তখন তিনি তার উপযোগী ক্ষেত্র পাননি, যা দিয়ে করবেন তার সাধন পাননি। এতদিন পরে স্বামীজীর শুভ ইচ্ছা ফলবতী হয়েছে। ইচ্ছা আমাদের সবসময়েই থাকে, কিন্তু তা রূপায়িত হতে সময় লাগে। উপযুক্ত সময়। বিবেকানন্দের কাছে ভারতীয় নারীর শেষ আদর্শ হলেন মা। নিবেদিতার অনুভবেও 'শ্রীশ্রীমা হলেন নারীত্বের আদর্শ সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের শেষ কথা।' স্বামীজী বলেছিলেন, 'আমাদের দেশ সকলের অধম কেন? শক্তিহীন কেন?—শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা-ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন; তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী, মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।' সেই মাকে বুঝতে মানুষের দীর্ঘ সময় লাগল। এখনো লাগছে। শিবানন্দজীকেই তো স্বামীজী আবার বলেছিলেন, 'মা-ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে

পারবে।' কাজেই সবসময়ে ইচ্ছা থাকলেই যে তাঁর কাজ সিদ্ধ হয়, তা নয়। এটা সময়সাপেক্ষ।

প্রশ্ন : হিমালয়ের কোলে মায়াবতীতে অবস্থিত মঠ-মিশনের একটি কেন্দ্র 'অদ্বৈত আশ্রম' নামে চিহ্নিত। এই কেন্দ্রে শ্রীরামকৃষ্ণের পট-প্রতিমা-মূর্তি-মন্দির কিছুই নেই। স্বামীজীর ভাবনা ও ইচ্ছানুযায়ী এখানে বিশুদ্ধ নিরাকার অদ্বৈততত্ত্বের সাধন, অনুশীলন ও চর্চা হয়। মঠ-মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রে আচরিত ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে মায়াবতীর পার্থক্য একেবারে সুস্পষ্ট। প্রশ্ন হল, মঠ-মিশনের অন্যান্য কেন্দ্রে মূর্তি-মন্দিররহিত এই যে অধ্যাত্মসাধনার পদ্ধতি, তা নেই কেন? এবিষয়ে যদি কিছু বলেন—

মহারাজ : স্বামীজী অদ্বৈতকে যে সবসময়ে সাধনার ক্ষেত্রে উপযোগী বলেছেন, তা নয়। তবে এটিকে আদর্শ পথ বলে বলেছেন। অদ্বৈত একটি আদর্শ। এই আদর্শে পৌঁছাবার জন্য ধীরে ধীরে নিজেকে প্রস্তুত করতে হয়। অদ্বৈত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করার পেছনে স্বামীজীর উদ্দেশ্য এই ছিল না যে, এখানে সকলে অদ্বৈতসাধন করবে। সেটা স্বামীজী করতে বলেনওনি। স্বামীজী বলেছেন, এখানে যারা অদ্বৈতবাদের সাধনা করতে চায়, তাদের জন্য একটি অনুকূল ক্ষেত্র হবে। প্রতিকূলতা সেখানে থাকবে না; এইজন্য ওখানে তিনি মূর্তিপূজাদি নিষিদ্ধ করেছেন। তার মানে এই নয় যে, অদ্বৈত আশ্রমে যাঁরা থাকেন, তাঁরা সবাই নিরাকারবাদী। তা নয়, তবে কেউ যদি নিরাকারবাদী হন, সেখানে তাঁর প্রতিকূলতা কেউ করবে না। এইজন্যই ঐ মঠটিকে, মায়াবতীর মঠটিকে তিনি এইভাবে গ্রহণ করেছেন। যাতে এখানে কোন অদ্বৈতবাদীর সাধনার প্রতিকূলতা না হয়। আর অদ্বৈতবাদ, স্বামীজীও বলেছেন, ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদ সাধন করা সাধারণের পক্ষে সম্ভব নয়। তবে, সাধারণত যদি

কেউ করতে চায়, তার অনুকূল জায়গা থাকা দরকার। সেখানে তার প্রতিকূলতা কেউ করবে না। মায়াবতীর আশ্রমটি সেইরকমই একটি জায়গা।

প্রশ্ন : মঠ-মিশনের বার্ষিক প্রতিবেদন ও সংবাদপত্র থেকে একটা বিষয় ক্রমশ বোঝা যাচ্ছে যে, গত কয়েক বছরে মঠ-কেন্দ্র যতগুলি স্থাপিত হয়েছে, সেই তুলনায় মিশন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। কেন এমন হচ্ছে? মিশন-কেন্দ্র ছাড়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ বাস্তবায়িত হবে কী করে?

মহারাজ : দেখ, মঠ-মিশন সম্পর্কে সাধারণের মধ্যে নানারকম বিভ্রান্তি আছে। মঠ-কেন্দ্র ও মিশন-কেন্দ্রের মধ্যে কোন মূল পার্থক্য নেই। কাজের পদ্ধতি নিয়ে মাত্র পার্থক্য। মূল পার্থক্য নেই; কারণ ঠাকুর-মা-স্বামীজীর যা আদর্শ, সেই আদর্শ নিজেদের জীবনে রূপায়িত করবার জন্যই এই দুটি কেন্দ্র। মঠ বা মিশনের মাধ্যমে সেই আদর্শই প্রচার করা, সেই আদর্শ প্রসার করা।

প্রধানত দেখতে গেলে মঠ-মিশনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, মঠ হল সেই স্থান, যেখানকার আশ্রিতরা ঠাকুরকে জীবনের সর্বস্বরূপে গ্রহণ করেছে। ঈশ্বরীয় সাধন-ভজন ও ধর্মাচরণ মঠ-কেন্দ্রের কাজ। অপরদিকে ধর্মীয় অনুশাসন না মেনেও যারা জনহিতকর কাজ করতে চায়, তাদের জন্য মিশন-কেন্দ্র অনুকূল ক্ষেত্র। সকলকেই এর ভিতরে নেওয়া হয়। মঠের সম্পূর্ণ পরিচালনার ভার থাকে সন্ন্যাসী-সাধুদের ওপর। মিশন-কেন্দ্র সেরকম নয়। এটি যারা সন্ন্যাসী নয়, যারা হিন্দুধর্মে বিশ্বাসী নয়—এমন সকলের জন্যও একটি ক্ষেত্র। মিশনের ক্ষেত্রটা এইদিক থেকে ব্যাপক। তাহলে মঠের সার্থকতা কোথায়? যারা শ্রীরামকৃষ্ণের

ভাবধারায় জীবন গড়তে চায়—তাদের জন্য মঠের সার্থকতা। অপরদিকে মিশনের সার্থকতা হল—শ্রীরামকৃষ্ণকে কেউ যদি বাদও দেয়, তাহলেও সে মিশনের সভ্য হতে পারে; তার কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। মিশন-কেন্দ্র কিন্তু কম প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে না। আসলে যেখানে মানুষ যেভাবে ভাবিত, সেখানে তাদের চেষ্টাতেই সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়—তা সে মঠই হোক কিংবা মিশন। এই দুটির মধ্যে কেবল আইনের দিক দিয়ে পার্থক্য। মৌল পার্থক্য কিছুমাত্র নেই।

প্রশ্ন : মঠ বা মিশন—এই দুটি কেন্দ্রেরই লক্ষ্য তাহলে এক—সেবা।

মহারাজ : কথাটা ঠিক হল না। সেবাই একমাত্র লক্ষ্য বলব না—সেবা আছে, জীবনকে একটা বিশেষ আদর্শে রূপায়িত করা আছে। সেবা হল একটা উপায়। এটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। অনেক সময় আমরা মনে করি যে, মঠের কার্য ব্যাপক হচ্ছে, মিশনের কাজ তদ্রূপ হচ্ছে না। এটা ভুল ধারণা। যেখানে মঠ আছে, সেখানে তারা জনহিতকর কাজ করছে। আবার যেখানে কেবল জনহিতকর কাজের জন্য মিশন-কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে—সেখানে ধর্মকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা হচ্ছে না। কাজেই মঠ-মিশনের ঐদিক থেকে কোন পার্থক্য নেই।

প্রশ্ন : রামকৃষ্ণ মঠ-মিশনের কর্মধারার প্রধান বাহক ও পরিচালক তার সর্বত্যাগী সন্ন্যাসিবৃন্দ। তাঁরা এই সংঘের স্তম্ভস্বরূপ। অনেক সময় আমরা শুনেছি যে, মঠ-মিশনের বহুবিস্তৃত কর্মকাণ্ডের তুলনায় সন্ন্যাসী মহারাজদের সংখ্যা অপ্রতুল। এই অপ্রতুলতার কারণ কী? যুক্তিবাদী ও বিজ্ঞানমনস্ক যুবকরা কি আর উৎসাহিত হচ্ছেন না ত্যাগের পথে আসতে? নাকি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবাদর্শ তাঁদের চেতনায় আর কোন আলোড়ন তুলতে পারছে না?

মহারাজ : এই যে বলছ লোকের অপ্রতুলতা, তার কারণ হল—সর্বত্যাগ না করে রামকৃষ্ণ সংঘে এসে কেউ সন্ন্যাস নিতে পারে না। লোক বাড়ানোর চেয়ে আমরা বেশি দৃষ্টি দিই সেইদিকে—যাতে আমরা আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট না হই। এইজন্য আমাদের কাউকে গ্রহণ করা বা রিক্রুটমেন্ট খুব সীমিত। ফলে, আমাদের সংখ্যা বেশি বাড়ে না। তবে একেবারেই যে বাড়ে না—তা নয়। অল্প হলেও বছরে বছরে সন্ন্যাসীর সংখ্যা বাড়ছে। যদিও আমাদের ক্রমবর্ধমান কাজের তুলনায় তা নগণ্য। এদিকে আমাদের কাজের ওপরে মানুষের আস্থা বাড়ছে। আবার যে-উপায়েতে সেবা করব, তার সম্পদও বাড়ছে। এর ফলে, যে-কাজ আগে একজন করতে পারত, তা এখন অনেকগুণ বেড়ে যাওয়াতে দশজনে মিলে করতে হচ্ছে। একথা অনস্বীকার্য—কাজের চাহিদার তুলনায় আমাদের সন্ন্যাসীর সংখ্যা কম। অভাব সবসময়েই থাকে এবং এ সবসময়েই থাকবে। তবে যুবকেরা অবশ্যই মঠ-মিশনে যোগদান করতে উৎসাহী হচ্ছে। আমরা যদি পরিসংখ্যান নিই, তাহলে দেখব আমাদের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কিন্তু সেই বাড়ার গতিটা, বৃদ্ধিটা এত দ্রুত হচ্ছে না, যা চোখে পড়ার মতো কিংবা কাজের তুলনায় পর্যাপ্ত।

প্রশ্ন : ভারতের সর্ববৃহৎ অনাথ আশ্রম অর্থাৎ রহড়ায় অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম পরিচালনার কৃতিত্ব এই সংঘের। শ্রীরামকৃষ্ণ এখানে যথার্থই অনাথের নাথ। এত বড় একটি কাজ প্রায় নীরবে পালিত হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হল, এই কাজে দেশের মানুষ আপনাদের সহায়তা দিচ্ছেন কি? কিভাবে তাঁরা দিচ্ছেন?

মহারাজ : রহড়া আশ্রম সর্ববৃহৎ কিনা জানি না। তবে দেশের মানুষ অকুণ্ঠ সহায়তা দিয়েছে বলেই এতগুলি অনাথ সেখানে আশ্রয় পেয়েছে,

প্রতিপালিত হচ্ছে। মানুষের সহানুভূতি ছাড়া একাজ হতে পারে না। অবশ্য কাজের পরিসরের তুলনায় এই সহায়তা হয়তো যথেষ্ট নয়। এই সাতশো অনাথকে সেবা করলেই কি দেশের অভাব মিটবে? মিটবে না। কাজেই যে-অভাব—তার তুলনায় আমরা অতি অল্পই করতে পারছি। আবার এই কাজে লোকের সহানুভূতি নেই—একথা বলব না। প্রচুর সহানুভূতি আছে। যে যেভাবে পারছেন, সে সেভাবে সাহায্য করছেন। আগে আমরা যেখানে হয়তো পাঁচটি ছেলেকে কিংবা সাতটি ছেলেকে পালন করতাম—সে-জায়গায় সাতশো ছেলেকে পালন করতে পারছি। কাজেই এটা লোকের সহানুভূতির জন্যই হচ্ছে। অন্য কোন কারণ নেই। তবে সেই সহানুভূতি, সারা ভারতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শত সহস্র অনাথের অভাব মেটানোর পক্ষে যথেষ্ট নয়। কখনোই মনে করি না—আমরা অভাব মেটাতে পেরেছি; বা কখনো সম্পূর্ণভাবে পারব—এ-ভরসাও করি না। কিন্তু এই ভাবটা লোকে নিক, এই জিনিসটি সকলের ভেতরে একটা ভাব সৃষ্টি করুক, আলোড়ন সৃষ্টি করুক; এবিষয়ে সক্রিয় সহযোগিতা দেওয়ার জন্য সকলে উদ্বোধিত হোক। রহড়া আশ্রম একটি মডেল ইনস্টিটিউট। এটিকে দেখে আরো অনেকে কাজ আরম্ভ করবে—এই আমাদের আশা। এরকম আশ্রম আরো গড়ে উঠুক।

প্রশ্ন : আপনি জানেন, তবু সবিনয়ে জানাই, ‘দেশ’ পত্রিকা তার আপন বৈশিষ্ট্যে আজ বাংলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে উঠছে। এই পত্রিকার প্রকাশনার বয়স ছাপান্ন বছর। ‘দেশ’ পত্রিকার তুলনায় বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত ‘উদ্বোধন’ পত্রিকা বয়ঃপ্রবীণ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, নিরবচ্ছিন্নভাবে এত দিনের প্রকাশনার গৌরব থাকা সত্ত্বেও ‘উদ্বোধন’-এর বিপুল প্রসার ও প্রচার তেমনভাবে হয়নি—যদিও স্বামীজী

চেয়েছিলেন, 'উদ্বোধন'-কে ঘরে ঘরে পৌঁছে দিতে। সম্ভব হলে বিনামূল্যে। অনেকে বলেন—রামকৃষ্ণ মঠ-মিশন আজ পর্যন্ত 'উদ্বোধন'-কে স্বামীজীর স্বপ্ন অনুযায়ী বাঙালির অধ্যাত্মজীবনের অচ্ছেদ্য অঙ্গ করে তুলতে পারল না। কেন এমন হল? কোন বাধা, না উদ্যোগের অভাব? এ-বিষয়ে আপনার মতামত—

মহারাজ : প্রধান কথা হচ্ছে, 'উদ্বোধন'-এ যা পরিবেশিত হয়, তা কতকটা নির্জলা সত্য। তার ভেতরে রসকষ পুরে দিয়ে সেটাকে জনপ্রিয় করবার চেষ্টা করা হয় না। 'উদ্বোধন'-এর মধ্যে দিয়ে একে অবলম্বন করে, একটি আদর্শকে প্রচার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সেই আদর্শকে ঠিক ঠিক বুঝতে মানুষের সময় লাগবে। কোন কিছু জনপ্রিয় বা পপুলার হয় তখনি, যখন তা সাধারণের রুচি অনুযায়ী হয়। আমরা 'উদ্বোধন'-কে সেইরকমভাবে অপরের রুচিসম্মত করে গড়বার চেষ্টা করিনি। স্বামীজীও করেননি। 'উদ্বোধন' একটি আদর্শের বাহকমাত্র। সেই আদর্শ বহন করে সে চলেছে। এতগুলো বছর ধরে। সেই আদর্শের ভেতরে তেজ আছে, প্রাণ আছে। তবে এই আদর্শকে বহু লোকের কাছে পত্রিকার মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে-সামর্থ্যের দরকার, আমাদের নিজেদের মধ্যে সেই সামর্থ্যের অভাব আছে—একথা স্বীকার করব। তবে 'উদ্বোধন' জনপ্রিয় না হবার কারণ হচ্ছে—নানান রস পরিবেশন করে একে লোকরুচি অনুযায়ী গড়া হয় না।

প্রশ্ন : ঠিক আছে। পপুলারিটি বা জনপ্রিয়তা বাদ দিয়েও এত বছর ধরে যে-পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়ে আসছে, সেই পত্রিকা কেন আমাদের নৈমিত্তিক ধর্মজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠল না? রামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শের মুখপত্র হিসেবে এটি একটি বিরাট ভূমিকা নিতে পারত। তাই না!

মহারাজ : দেখ, আমরা 'উদ্বোধন' কথাটি না বলে যদি ঠাকুরের ভাবপ্রচারের যন্ত্র বলি, তাহলে দেখতে পাব, আমাদের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের প্রবাহ ক্রমবর্ধমান। দিন দিন এই সাহিত্য প্রসারিত হচ্ছে, আশাতীতভাবে হচ্ছে। তার দ্বারা বোঝা যাচ্ছে—এর প্রতি মানুষের আকর্ষণ বাড়ছে। সে 'উদ্বোধন' নামেই হোক বা পত্রিকায় প্রকাশিত যে-ভাবসমূহ তার প্রতি আকর্ষণের জন্যই হোক। পত্রিকাটা একটা উপায়। ঐ পত্রিকায় ছাপা হচ্ছে যেসমস্ত রচনা, সেগুলি পত্রিকার চেয়েও অনেক দূর প্রসারিত হচ্ছে। কাজেই ভাবের প্রসারটাই মুখ্য কথা। পত্রিকার প্রসারটা মুখ্য কথা নয়।

এই পত্রিকাকে ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে-প্রচারকাজ দরকার—আমরা 'উদ্বোধন'-এর জন্য সে-প্রচারকাজ করি না। আমরা দরজায় দরজায় গিয়ে এই পত্রিকা বিক্রি করা বা গ্রাহক করার চেষ্টা করি না। স্বেচ্ছায় যারা আসছে, তারা এই পত্রিকা নিচ্ছে। কিন্তু এই দিয়ে আমরা একটি ভাবের মূল্যায়ন করব না। মূল্যায়ন করব এই দিয়ে যে, এই আদর্শকে নেবার জন্য লোকের কতটা আগ্রহ? এবিষয়ে মানুষের আগ্রহ যে কতগুণ বেড়েছে—তা আমরা বুঝতে পারি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ সাহিত্যের প্রসারের মধ্যে দিয়ে। আশ্চর্যের ব্যাপার, বইমেলা যখন হয়, তখন আমাদের বই বিক্রি হয় সবচেয়ে বেশি। এতে মানুষের আগ্রহ যে এইদিকে, তা পরিষ্কার বোঝা যায়। সে 'উদ্বোধন' পত্রিকাখানির ভিতর দিয়েই হোক বা তাদের প্রকাশিত গ্রন্থসম্ভারের মধ্যে দিয়েই হোক। এতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হচ্ছে।

স্বামীজী বলেছিলেন, 'উদ্বোধন'-কে বিনামূল্যে বিতরণ করতে হবে। তা আমরা করতে পারিনি। আবার বিনামূল্যে বিতরণ যে সবসময়

ফলপ্রসূ হবে—তাও নয়। প্রায়শই দেখা যায়, বিনামূল্যে কোন কিছু দিলে তার ওপর মানুষের আস্থা বেশি থাকে না। একটি উদাহরণ মনে পড়ছে। আগেকার দিনে 'শিশির' বলে একটি পত্রিকা মাত্র এক পয়সায় বিক্রি হতো। দেখা যেত, পত্রিকাটি বার হওয়া মাত্র কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলেই তার সব কপি বিক্রি হয়ে যেত। কারা কিনত? কিনত জুতোর দোকানিরা। জুতো মুড়ে দেবার জন্য তারা সমস্ত 'শিশির' কিনে নিত। এক পয়সা মূল্য সত্ত্বেও এই অবস্থা! বিনামূল্যে দিলে কী হবে ভাব! কাজেই কেবল বিনা পয়সায় দিলেই মানুষের কাছে এই পত্রিকার প্রসার হবে না। হয়তো মূল্যবোধ কমে যাবে। 'উদ্বোধন'-এর ওপরে আমরা অত জোর দিইনি। দিতে পারিনি। অন্যদিকে আমাদের কাজের ক্ষেত্র অনেক বেড়ে গেছে। তার ওপর বড় কথা হল—এই পত্রিকা কেবলমাত্র বাংলা ভাষাভাষীর জন্য। আবার বাংলা ভাষাভাষীর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবানুরাগী যারা—তাদের জন্য। ফলে এর প্রচার-প্রসারের দিকটা বেশ সীমিত। 'উদ্বোধন' সম্পর্কে এগুলি আমাদের মনে রাখতে হবে।

প্রশ্ন : অনেকে বলেন, সংঘ ও সংগঠন বিশালকায় হয়ে উঠলে একটা অহমিকার বলয় তৈরি হয়। রামকৃষ্ণ সংঘ কি সেই বলয়ে ক্রমশ আবদ্ধ হয়ে পড়ছে? অহমিকার বলয় কি এর চারপাশে তৈরি হয়েছে?

মহারাজ : আমরা নিজেরা মাঝে মাঝে এবিষয়ে ভাবি। এবং এই অহংবুদ্ধি যাতে না আসে—তার জন্য নিজেদের সতর্ক করি। যেকোন সাধনের জন্য মানুষকে আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়। তবে সিদ্ধিটা সেই পরিমাণে হবে বলে ধরে নেওয়া চলে না। সাধক আমরা, আমরা সিদ্ধ নই।

প্রশ্ন : আধ্যাত্মিক পিপাসা ও সংশয় নিয়ে মঠ-মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে ছুটে যান বহু মানুষ। তাঁদের মধ্যে অনেকেই অভিযোগ করেন যে, ছুটে

এসেও তাঁরা অভিপ্রেত সাধুসঙ্গ লাভ করতে পারেন না; স্বভাব সংশোধনের ও গুরুমুখী সাধনভজনের উপায়গুলি তাঁদের কাছে অলভ্য থেকে যায়। মনের শূন্যস্থান পূর্ণ হয় না। এঁদের অভিযোগের কারণটা কী?

মহারাজ : এর কারণ দুটো। একটা কারণ হচ্ছে, আমাদের শাস্ত্রে আছে—যে আকাঙ্ক্ষী নয়, তাকে দিও না। তার মানে, সে এর মূল্যায়ন করতে পারবে না। এইজন্যই মঠ-মিশনে যারা আসে—সকলেই যে ধর্মপিপাসু হয়ে আসে, তা নয়। মেলা দেখতেও অনেকে আসে। বরং মেলা দেখতেই বেশি লোক আসে। কাজেই লোক ছুটে আসছে দেখলেই হবে না, দেখতে হবে—তাদের মধ্যে ভাবের প্রসার কতটা হয়েছে। দ্বিতীয়, এখানে এলেই যে সকলে ধর্মকথা শুনতে চায়, তা নয়। কতগুলি লোক আসে যারা ঘুরে ফিরে চলে যায়। হয়তো এখানে বসে আমি ধর্মকথা আলোচনা করছি, তারা এসে দেখে একটি লোক কী সব বকবক করছে! এরা আর দাঁড়ায় না, শোনে না, চলে যায়। ঠাকুরের ভাব নিয়ে তারা আসে না। নাম শুনেছে—বেলুড় মঠ। অতএব এখানে এসে নানান দৃশ্য দেখে ঘরে ফিরে যায়। এরা বেলুড় মঠের আদর্শ সম্পর্কে অবহিত নয় এবং সেই পিপাসা নিয়েও আসে না। বাইবেলে এই কথা লেখা আছে যে, অনেকে আসবে; কিন্তু তাদের মধ্যে অল্প লোকই গৃহীত হবে। ধর্মের কথা চিরকালই এইরকম। সকলে একধার থেকে ভেঙে পড়ে, তা নয়। তবু এমন জায়গা থাকা দরকার, যেখানে অল্প লোকেরও পিপাসা মেটে। কঠোপনিষদে আছে :

শ্রবণায়াপি বহুভির্যো ন লভ্যঃ
শৃণ্বন্তোঽপি বহবো যং ন বিদ্যুঃ।

আশ্চর্যো বক্তা কুশলোঽস্য লব্ধা-
শ্চর্যো জ্ঞাতা কুশলানুশিষ্টঃ॥ (১।২।৭)

অর্থাৎ তাঁর বিষয়ে বহু লোক শুনতে পায় না, শুনেও বহু লোক জানতে পারে না। তাঁর বিষয়ে বলবেন—এমন বক্তাও দুর্লভ। অতি সামান্য কজনই তাঁকে লাভ করতে পারে। আবার তাঁকে জেনেছে—এরকম ব্যক্তিও প্রায়শ দেখা যায় না। অতএব, শুধু লোকের ভিড় দেখলে হবে না। সিনেমা দেখতে লোকের ভিড় হবে, একটি ধর্মক্লাসে বা পাঠে কি সেইরকম ভিড় হবে? তা হবে না। সহজেই যাতে রস পাওয়া যায় সেই বস্তুর প্রতি মানুষের আকর্ষণ বেশি হয়। সাত্ত্বিক রস তাকেই বলে যা চেষ্টা করে লাভ করতে হয়। কাজেই এতে অল্প লোক থাকবেই। চিরকালই এইরকম থাকবে। বেশি লোক একসঙ্গে হবে না। অল্প লোক ধর্মতত্ত্ব ধৈর্য ধরে শুনতে আসবে। তার ভেতরে আবার সক্রিয়ভাবে এই তত্ত্ব গ্রহণ করবে—সেরকম লোক আরো কম। কিন্তু এই লোকগুলিই তত্ত্বকে বাঁচিয়ে রাখে। তারা মুষ্টিমেয় লোক। ধর্মকে তারাই দু-চারজন বাঁচিয়ে রাখে—যারা ধর্মকে জীবনের ব্রত বলে গ্রহণ করেছে। তবে আমাদের কর্তব্য হল—যারা প্রকৃতই তাঁকে জানতে চায়, তাঁর কথা শুনতে চায়, তাদের যেন সুযোগ করে দেওয়া হয়। যতটা পারি। সেটাই লক্ষ্য।

প্রশ্ন : যারা সত্যিকারের অধ্যাত্মরস-পিপাসু, তারা ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে কিনা?

মহারাজ : না। কেবল তারাই হারিয়ে যাচ্ছে—যারা দৃশ্য দেখে বাড়ি চলে যাচ্ছে। প্রকৃত পিপাসার্তরা হারাচ্ছে না।

প্রশ্ন : এই পিপাসার্তদের অবস্থাটা তাহলে কী দাঁড়াচ্ছে? সাধুসঙ্গ তাঁরা লাভ করবে কি?

মহারাজ : দেখ, আমাদের মুশকিল হচ্ছে, কাকে যেচে বলতে যাব—ওগো, তুমি ঠাকুরের কথা শোন। যাকে বললাম, সে হয়তো শুনল না। তার হয়তো এখনো সময় হয়নি। ঠাকুর যখন উপদেশ করেছেন, তখন কি তিনি একটি বাজারের মধ্যে উপদেশ করেছেন?

মুষ্টিমেয় কতকগুলি লোক তাঁর জীবন, তাঁর বাণীর দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছিল। তাদের সংখ্যা কত অল্প! কত অল্প! কাজেই খুব বাজার হবে, বহু লোক আসবে—এটা ঠাকুরও চাইতেন না। তাতে আদর্শটা পাতলা হয়ে যায়। তাকে diluted হয়ে যেতে হয়। কতকগুলি লোক কেবল তাদের জীবন দিয়ে আদর্শকে ধরে রাখে। ঐ কয়েকজনের মধ্যেই স্রোতটা প্রবল থাকবে। তা না হলে এটা একটা 'মাস মুভমেন্ট' যেমন হয়, তেমন হয়ে যাবে। এবং তার স্থায়িত্ব থাকবে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, হুজুগ। হুজুগটা মিটে গেলেই বহু লোক চলে যায়। আমরা তো দেখছি, এই দেশে কত ধর্মপ্রবক্তা উঠছেন, যাচ্ছেন। ভারতবর্ষ ধর্মের দেশ। এখানে ধর্মপ্রবক্তার অভাব নেই। তাঁরা আসছেন, চলে যাচ্ছেন। মানুষ সাময়িকভাবে তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছে। কিন্তু নিরবধি কালের নিরিখে তার মূল্যায়ন হয় না। কাল একটা ভয়ানক পরীক্ষার জিনিস। কালে সবকিছু পরীক্ষিত হয়। যাতে মূল্য আছে, তা স্থায়ী হয় বেশি। আর সাধুসঙ্গ মানে কেবল সাধুর কাছে সশরীরে হাজির হওয়া নয়। এর মানে আসলে সাধুর যে-আদর্শ তাকে গ্রহণ করা।

('উদ্বোধন'-এর একটি সংখ্যায় সাধুসঙ্গ বিষয়ে পূজনীয় মহারাজ আরো বিস্তৃতভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'সাধুসঙ্গ মানে সাধুর সঙ্গে একত্রে বাস করা নয়, সাধুর আদর্শ গ্রহণ করা। যাঁর সান্নিধ্যে গেলে ভগবানের সম্বন্ধে মনে চেতনা জাগে, সৎ-চিন্তা মনে

আসে তাঁকেই সাধু বলে। প্রসঙ্গত একটি ঘটনা মনে পড়ছে। নবাগত এক ব্যক্তি উদ্বোধনে স্বামী সারদানন্দ মহারাজের কাছে গিয়েছেন। বলছেন, সাধুসঙ্গ করব। সারদানন্দ মহারাজ বলছেন—বাপু, ঠাকুর যখন দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন তখন কালীবাড়ির ঠাকুর-চাকর চব্বিশ ঘণ্টা তাঁর সঙ্গে থাকত, পাড়াপড়শিরাও প্রতিদিন প্রায় আসা-যাওয়া করত। বছরের পর বছর এইরকম চলেছে। কিন্তু তাদের কারো জীবনে যে কোন পরিবর্তন ঘটেছে তা তো শোনা যায় না। সাধুর জীবনের যা শিক্ষা তা গ্রহণ করবার জন্য একটু আগ্রহ থাকা দরকার। না হলে সে-সঙ্গে কোন কাজ হয় না।')

প্রশ্ন : শ্রীমা একদা বলেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে যে একবার আশ্রয় নেবে, তাঁর শরণ নেবে, তার কখনো মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না। প্রশ্ন হল, এত বড় আশ্বাস পেয়েই কি প্রতি বছর বহু মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ-মন্ত্রে দীক্ষিত হচ্ছেন। নাকি আধ্যাত্মিক শূন্যতাবোধ মানুষকে শ্রীরামকৃষ্ণ-অভিমুখী করে তুলেছে? এর কোন্‌টা? আপনি সংঘাধ্যক্ষ ও দীক্ষামন্ত্রের গুরু। তাই আপনার কাছে আমাদের এই প্রশ্নের উত্থাপন।

মহারাজ : কথাটা একটু উলটো হয়ে গেল। ঠাকুর বলেছেন, যারা এখানে আসবে তাদের শেষ জন্ম। অর্থাৎ যাদের ভেতর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রদর্শিত আধ্যাত্মিক ভাব প্রবুদ্ধ হবে—তারা মুক্ত হয়ে যাবে। আর মা, ঠাকুরের নামে যারা সংসারত্যাগ করে সাধু হয়েছে—তাদের সম্পর্কে ঠাকুরের কাছে এই বলে প্রার্থনা করেছিলেন, 'তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে—তা আমি দেখতে পারব না। আমার প্রার্থনা, তোমার নামে যারা বেরুবে তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব যেন না হয়। ওরা সব তোমাকে, আর তোমার সব ভাব, উপদেশ নিয়ে একত্রে থাকবে। আর এই

সংসারতাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে।' তা মায়ের আশীর্বাদে আমাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব কখনো হয়নি। কখনো হয়নি।

প্রশ্ন : এ তো গেল আপনাদের কথা। কিন্তু যেসব সংসারী, সাধারণ গৃহস্থরা দীক্ষা নিচ্ছেন—তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিটা কী? কেন তাঁরা আসছেন?

মহারাজ : তারা তাদের দৈহিক অভাব দূর করবার জন্য আসে না। আত্মিক অভাব দূর করবার জন্য আসে। দৈহিক অভাব দূর হবে—কেউ কেউ হয়তো এমন কল্পনা করে, কিন্তু তা হয় না। দীক্ষা নিলে নির্ধন ধনী হবে; আর বড়লোক সে আরো বড়লোক হবে—এমনটি চিন্তা করা অবান্তর। নির্ধন ও ধনী—এরা দুজনেই ভগবানকে আসলে চায় মনের দারিদ্র্য মোচনের জন্য। এখানে সবাই আসে শান্তি পাবে—এই আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। ঐ যে মা ঠাকুরকে বললেন, 'তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে'—সেই শান্তির আশায় তাপদগ্ধ মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে ছুটে আসে। আর কোন কিছুর জন্যই নয়। (কথোপকথন এখানেই শেষ হয়ে গেল। মহারাজ খানিকক্ষণ চুপ থেকে স্বগতোক্তির মতো বললেন, ঠাকুরের ভাবকে কাজে রূপায়িত করতে দেড়হাজার বছর লাগবে। আমাদের অত অধৈর্য হলে চলবে না। মঠ-প্রাঙ্গণ সেই মুহূর্তে দর্শনার্থী ও ভক্তসমাগমে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।)